প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শুভাপ্রসন্ন

ব্লক
মডার্ন প্রসেস
১৩ কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
হিন্দুস্থান আর্ট এনগ্রেভিং কোঃ প্রাঃ লিঃ
বৈঠকখানা রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯ ।

প্রথম পর্ব

১

প্রাণেশাচার্য স্নান করিয়ে দিলেন ভগীরথীকে। একটা ফরসা শাড়ি জড়িয়ে দিলেন স্ত্রীর শুকনো মটর দানার মতন শরীরে। ফুল-জল দিলেন গৃহদেবতার পায়ে। তারপর ঠাকুরের মন্ত্রপূত জল আর ঠাকুরের পায়ের ফুল ছুঁইয়ে দিলেন ভগীরথীর মাথায়। নিচু হয়ে ভগীরথী স্বামীর পায়ের ধুলো নিলেন। প্রাণেশাচার্য তাকে আশীবাদ করলেন। রান্নাঘরে গিয়ে এক বাটি গমের পায়েস নিয়ে এলেন ভগীরথীর জন্যে। নিচু স্বরে ভগীরথী বললেন।

—তুমি আগে খেয়ে নাও।

—না। আগে তুমি খাও। তোমারই দরকার।

দৈনন্দিন এই জীবনযাত্রা চলে আসছে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে। বাঁধাধরা নিয়ম। কোনো ব্যত্যয় নেই। সকালে প্রাতকৃত্য সেরে স্নান। প্রার্থনা। স্ত্রীর পথ্য রান্না। তারপর নিজের রান্না। সময়মত স্ত্রীকে ওষুধ দেওয়া। এক ফাঁকে নদীতে গিয়ে স্নান সেরে আসা। তারপর ওপারে গিয়ে মারুতিদেবের মন্দিরে পূজো দেওয়া। নিত্যকার এই জীবনধারণে কোনো ভুল ছিল না প্রাণেশাচার্যের। মাধ্যাহ্নিক আহারের পর বেলা পড়লে আসবে অগ্রহারের ব্রাহ্মণ সমাজ। তারা আসবে ধর্মোপাখ্যান শুনতে। বাড়ির সামনে তাদের বসিয়ে প্রাণেশাচার্য তাদের ধর্মোপদেশ শোনাবেন। তাদের প্রিয় পুরাণের গল্প বলবেন। অবশেষে সন্ধ্যা নামবে। আবার নদীতে গিয়ে স্নান সারবেন প্রাণেশাচার্য। সন্ধ্যাহ্নিক সারবেন। স্ত্রীর পথ্য রাঁধবেন। নিজের জন্যে সামান্য রাঁধবেন। তারপর স্ত্রীকে পথ্য দিয়ে নিজেও খেয়ে নেবেন। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণরা আবার এসে জড়ো হয়েছে বারান্দায়। শুরু হবে শাস্ত্রপাঠ।

ভগীরথী প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন।—

—আমাকে বিয়ে করে কোনো সুখই হলো না তোমার। একটা ছেলেও

নেই সংসারে।

একটু থেমে বলতেন।—তুমি আবার বিয়ে করো।

হা-হা করে হাসতেন প্রাণেশাচার্য। বলতেন।

—বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে?

—আহা! কি বা বয়েস তোমার? এখনও চল্লিশ ছোঁওনি। আমাদের সমাজের কত বাপা তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে বর্তে যাবে। তুমি আচার্য। কাশীতে গিয়ে শাস্তর পড়ে এসেছ। তুমি কি সাধারণ কেউ?

কখনও বা বলতেন—

—ছেলেপুলে না থাকলে সংসার মানায়?

বলতে বলতে চোখের জলে ভারি হয়ে উঠতো ভগীরথীর গলার স্বর।

—আমায় বিয়ে করে কোনো সুখই পেলে না তুমি।

প্রাণেশাচার্য উত্তর দিতেন না। গভীর প্রেমে স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতেন। বলতেন—

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন পড়োনি? কাজ করে যাও, ফলের প্রত্যাশা করো না।

বলতেন আর ভাবতেন—ঠাকুরতো এইভাবেই পরীক্ষা করে চলেছেন। তাই না তাঁর ব্রাহ্মণজন্ম সার্থক! এ কথা মনে হতেই পঞ্চামৃত পান করার যে অভূতপূর্ব আনন্দ, সেই আনন্দের শিহরণ খেলে যেতো শরীরে। নিজের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যেতো। গভীর মমত্ববোধ ঝরে পড়ত রুগ্না স্ত্রীর ওপর। গর্ববোধে স্ফীত হতেন। মনে মনে ভাবতেন—চিররুগ্না ভগীরথীকে বিয়ে করে নিশ্চয়ই আমি অনেক পরিণত হয়েছি। এগিয়ে গেছি অনেক।

খেতে বসবার আগে একটা কলাপাতায় খানিকটা খইল মেখে গাভী গৌরীর মুখের কাছে ধরলেন প্রাণেশাচার্য। পেছনের জমিতে চরছিল গৌরী। ভারি ভক্তির সঙ্গে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। গৌরীর দেহ খুশিতে কাঁটা দিয়ে উঠলো। আচার্য অভিভূত হলেন। যে হাতে ভগবতীর গা ছুঁয়েছিলেন সেই হাত নিজের মাথায় রেখে তাঁর ভক্তি জানালেন। তখনই বাইরে

থেকে কে একজন স্ত্রীলোক ডাকলো তাঁকে।—

—আচার্য! আচার্য!

গলার স্বর চন্দ্রীর মতন। নারাণাপ্পার সেই রক্ষিতা মেয়েটা। এখনও খাওয়া হয় নি। অথচ ভ্রষ্টা মেয়েটার সঙ্গে কথা বললে আবার তাঁকে স্নান করতে হবে। আবার ভাবলেন—অসহায়া মেয়েছেলে! হয়ত কোনো প্রত্যাশা নিয়ে এসেছে। কি করে ফেরাবেন তাকে? গলা দিয়ে তখন যে একদলা ভাতও নামবে না! বাইরে এসে দাঁড়ালেন আচার্য। মাথায় কাপড় টেনে দিলো মেয়েটা। কেমন যেন ভয় পাওয়া শুকনো চেহারা। সসঙ্কোচে—একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

—কি হয়েছে?

—ও···ও

চন্দ্রী কাঁপছে। জড়িয়ে যাচ্ছে তার কথা। তাড়াতাড়ি সে বারান্দার একটা থাম চেপে ধরলো।

—কে নারাণাপ্পা? কি হয়েছে তার?

—চলে গেল। বলতে বলতে দু'হাতে মুখখানা ঢেকে ফেললো মেয়েটা।

—নারায়ণ! নারায়ণ! কি হয়েছিল তার? কখন?

—এখনই।

অশ্রুরুদ্ধ স্বরে চন্দ্রী বলতে লাগলো।

—শিভমগ্‌গ থেকে ফিরেই জ্বরে পড়েছিল। দিনচারেক ভুগলো। তারপরেই সব শেষ। শরীরের একটা দিক ফুলে উঠেছিল। খুব যন্‌ত্রনা হতো।

—নারায়ণ! নারায়ণ!

বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন আচার্য। পরিধানের চেলিখানা খোলারও অবকাশ ছিল না। একরকম দৌড়েই পৌঁছে গেলেন গরুড়াচার্যের বাড়িতে।

—গরুড়! গরুড়!

নারাণাপ্পার সঙ্গে ওদের পাঁচ পুরুষের সম্পর্ক। নারাণাপ্পার প্রপিতামহের ঠাকুমা আর গরুড়ের প্রপিতামহের ঠাকুমা ছিলেন দুই সহোদরা। সবে খেতে বসেছে গরুড়। সরু (saru) মাখা ভাত এক গ্রাস সবে মুখে তুলতে যাবে প্রাণেশাচার্য এসে বাধা দিলেন।

—নারায়ণ! নারায়ণ! ভাতকটা আর খেও না গরুড়! নারাণাপ্পা চলে গেল। এইমাত্র।

কথাকটা বলে আচার্য মুখের ঘাম মুছলেন। গরুড়ও অবাক। তাড়াতাড়ি গণ্ডূষ করে পাতার ওপর এঁটো হাত ধুয়ে উঠে পড়লো সে। না, খেতে সে পারে না। যদিও মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল। তাহলেও নারাণাপ্পা জ্ঞাতি। গরুড়ের ব্রাহ্মণী সীতা স্তব্ধ হয়ে শুনল। হাতে ধরা ছিল হাতাখানা। সেদিকে চেয়ে গরুড় বললো।

—ছেলেপুলেরা খেতে পারে। তাদের দোষ নেই। তবে সংকার না হওয়া অব্দি আমরা খেতে পারবো না।

কথাকটা বলে প্রাণেশাচার্যর সঙ্গে বেরিয়ে এলো গরুড়।

এখন খাওয়া দাওয়ার সময়। দুঃসংবাদটি এখনি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া দরকার। প্রাণেশাচার্য গেলেন উডুপী লক্ষ্মণাচার্যর কাছে। গরুড় ছুটল আধপাগলা বুড়ি লক্ষ্মীদেওম্মাকে খবরটা দিতে। সেখান থেকে দুর্গাভট্টর কাছে।

অগ্রহারের দশঘরে দাবাগ্নির মতন ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। ঠাকুরের অশেষ কৃপা। কোনো ব্রাহ্মণেরই তখনো পর্যন্ত খাওয়া হয় নি। সবাই শুনলো। তবে কেউ দুঃখ পেল না। মেয়েরাও না। অবশ্য একটা ভয় আর উৎকণ্ঠা চেপে বসলো সকলের মনে। বেঁচে থেকে লোকটা ওদের সঙ্গে শত্রুতাই করে গেছে। খাওয়া দাওয়ার বাছ-বিচার করে নি। কাউকে মর্যাদা দেয় নি। সব থেকে বালাই হয়ে দাঁড়ালো এখন তার শবদেহটা। ধীরে ধীরে সবাই এসে জড়ো হচ্ছিল আচার্যের বাড়ির সামনে। ব্রাহ্মণীরা যথাসাধ্য তাদের স্বামীদের সাবধান করে দিয়েছে।

—শোনো। তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে যেও না। আচার্য আগে বিধান দিন। তারপর যা হয় করো। সংকারের অনেক দায়। ভুল হলে আচার্যই তোমায় সমাজচ্যুত করবেন।

ব্রাহ্মণরা জড়ো হয়েছে। অন্যদিনও হতো। শাস্ত্রপাঠ শুনতো। আজ উদ্দেশ্য আলাদা। এক অজ্ঞাত উদ্বেগ আর অস্বস্তি নিয়ে এসেছে সবাই। প্রাণেশা-

চার্য এসে দাঁড়ালেন। গলায় তুলসীর মালা। মালার দানায় হাত রেখে অন্য-মনস্কভাবে, অনেকটা যেন নিজেকে শোনাতেই, বললেন।

—নারাণাপ্পার শেষকৃত্য করতে হবে। এ আমাদের প্রথম সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা হলো কে করবেন? নারাণাপ্পার তো কোনো সন্তানাদি নেই! থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রী। বিধান কি হয় জানতে উদ্গ্রীব হয়ে আছে সে। ব্রাহ্মণীরাও খিড়কি দরজা দিয়ে এক এক করে মাঝের ঘরে এসে জড়ো হলো। দুশ্চিন্তা তাদেরও কম নয়। পুরুষমানুষ তো! কে জানে ঝোঁকের মাথায় কি করে বসে!

গরুড়াচার্যর খোলা হাতখানা দেখা যাচ্ছে। যেমন কালো তেমনি মোটা। খোলা বাহুতে হাত বুলোতে বুলোতে সে বললো—তা তো বটেই। দলের মধ্যে সবচেয়ে শীর্ণ দাসাচার্য। শুধু শীর্ণ নয় বোধহয় দরিদ্রতম। হাড়সর্বস্ব গাভীর মতন দেহখানা তার। শীর্ণ শরীরটা দুলিয়ে সে বললো—মড়া আগলে বসে থাকলে তো চলবে না। যা কৃত্য তা করতেই হবে। তবে পেটে কিছু দিতে পারব আমরা।

ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে লক্ষ্মণাচার্য বললো।

—খুব ঠিক কথা।

কথা বলার সময় মুখখানাকে একবার সামনে একবার পিছনে ঝাঁকানি দিলো। বার কয়েক ঘন ঘন চোখের পাতা ফেললো। এসব তার মুদ্রাদোষ। লক্ষ্মণাচার্যর সারা দেহখানাই উদরপ্রধান। যেন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রুগী। বসা চোখ, চাপা চিবুক আর ঘোলাটে চোখ—এই আশঙ্কাই প্রমাণ করে। যখন হাটে চলে তখন পাছাখানা কুৎসিতভাবেই পিছন দিকে প্রসৃত হয়। পারিজাতপুরের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মণরা তার হাঁটা চলা দেখে ব্যঙ্গ করে।

কিন্তু সমস্যাটার সোজাসুজি সমাধানের আঁচ প্রায় কেউ দিতে পারল না। শুধু প্রাণেশাচার্য বললেন—

—তাহলে নারাণাপ্পার শেষকৃত্য কে করবেন? শাস্ত্রে বলে এ-অধিকার আত্মজনের। অন্যথায় যে কোনো ব্রাহ্মণই এ দায় নিতে পারেন।

আত্মজন বলতে গরুড় আর লক্ষ্মণের কথাই সবার মনে পড়ল। কিন্তু প্রাণেশাচার্য কথাটা পাড়তেই চোখ বুজে ফেললো লক্ষ্মণাচার্য। ব্যাপারটা

এড়িয়ে যেতে চায় সে। আদালতে বিস্তর যাতায়াত আছে গরুড়ের। বার কয়েক ঘরের এ মোড় ও মোড় পায়চারি করে সে বুঝল এবার তার বলার পালা। নাকে একটু নস্যি গুঁজে সে শুরু করলো বলতে।

—এ কথা ঠিক যে শাস্ত্র বাক্য অমোঘ। মানতেই হবে। তাছাড়া আচার্যকে আমরা গুরু বলেই মানি। তাঁর আদেশও শিরোধার্য। তবে কথাটা কি জানো? নারাণাপ্পা নামেই জ্ঞাত্। একপুরুষের নয়। অনেক পুরুষের। কিন্তু জ্ঞাত্‌শত্রু। ওর বাবার সঙ্গে পেছনের বাগানটা নিয়ে আমার বিবাদ হয়েছিল। মোকদ্দমা পর্যন্ত হলো। তারপর তো ওর বাপ মরলো। আমি ধর্মস্থলের মঠের গুরুদেবের কাছে ব্যাপারটা তুললাম। সব দেখে শুনে গুরুদেব আমার পক্ষেই রায় দিলেন। কিন্তু নারাণাপ্পা মানলো না সে রায়। গুরুবাক্য হলো বেদবাক্য। সেই বেদবাক্যই যখন সে মানলো না তখন আমার পক্ষে কি করার আছে বলো? আমি তাই শপথ করেছি এ জন্মে তো বটেই বংশ-পরম্পরায় আমরা ওর সঙ্গে শত্রুতা করে যাব। বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধ কোনো অনুষ্ঠানেই ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো না। কেউ কারো বাড়ি পাত পাড়বো না—আতিথ্যও করবো না।

গরুড়াচার্যর নাকি-সুরের ভাষণ হঠাৎ থেমে গেল। এদিক ওদিক সে তাকাল। তারপর চন্দ্রীর দিকে চোখ পড়তেই নাকে দু'টিপ নস্যি গুঁজে দ্বিগুণ তেজে সে আবার শুরু করলো।

—তোমরা যা বলবে গুরুদেব তাই মানবেন। কৃত্য যা তা করতেই হবে। উপস্থিত ব্যাপারটা তোলা থাক। আসল প্রশ্ন হলো নারাণাপ্পা কি সত্যি-কারের বামুন ছিল? যে মানুষটা দিনের পর দিন শূদ্রাণী নিয়ে ঘর করে গেল···তোমরা কি বলো?

সারা অগ্রহারে মাধ্বীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদেরই আধিপত্য। স্মার্ত ব্রাহ্মণ বলতে একজনই ছিল—দুর্গাভট্ট। মাধ্বী গরুড় যখন কথা বলছিল তখন স্মার্ত দুর্গাভট্ট তীক্ষ্ণ চোখে চেয়েছিল তার দিকে। আর মনে মনে মাধ্বীদের গোঁড়ামির চুলচেরা বিচার করছিল। একসময় গরুড়কে থামিয়ে দিলো সে। আড়চোখে চন্দ্রীব দিকে চেয়ে প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো গরুড়কে।

—আরে আরে, চট করে অতো রেগো না। বেশ্যা নিয়ে ঘর করলে ব্রাহ্মণত্ব

যায় না। ইতিহাস তো পড়েছ! আমাদের যাঁরা পূর্বপুরুষ তাঁরা সবাই এসেছিলেন উত্তর ভারত থেকে। এখানে এসে দ্রাবিড় মেয়েছেলে নিয়ে দিব্যি কাটালেন। ভেবো না আমি মজা করবার জন্যে বলছি। দক্ষিণ কানাড়ার বাশ্রুরের বেশ্যালয়ে তো অনেকেই যায়—

ক্ষেপে উঠল গরুড়। দুর্গাভট্টর স্বভাবটাই ওইরকম। ফিচলেমিতে ভরা। তার দিকে তাকিয়ে বললো।

—ধীরে বন্ধু ধীরে। এখনই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসো না। তার জন্যে আমাদের আচার্যদেব রয়েছেন। মানে জ্ঞানে তিনি আমাদের সকলের চেয়ে বড়। তাছাড়া শুধু তো ইন্দ্রিয়াসক্তি নয়। অন্য ব্যাপারও আছে। গুরুদেব জানেন সব। সবর্ণ অসবর্ণ নিয়ে চুলচেরা বিচারের ক্ষমতাও তাঁর আছে। কাশীতে অনেক শাস্ত্র পড়েছেন। বেদজ্ঞানের পূর্ণ আধার তিনি। সম্মান, শিরোপা পেয়ে আজ তিনি আমাদের দাক্ষিণাত্যের এক নম্বর পণ্ডিত। তোমরা কি বলো!…

প্রাণেশাচার্য বিব্রত বোধ করছিলেন। আলোচনাটা যেভাবে মূল সমস্যা থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তিগত প্রশংসার চোরা পথ নিচ্ছে তাতে বিব্রত হবারই কথা। তাই গরুড়কে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে তিনি লক্ষ্মণের উদ্দেশে বল-লেন।

—লক্ষ্মণ কি বলো? নারাণাপ্পা তোমার স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করেছিল। সুতরাং তোমারও একটা মতামত আছে।

লক্ষ্মণ চোখ বুজে ফেললো। তারপর বললো।

—ধর্মের এ-সব সূক্ষ্ম তত্ত্ব আমি কি বুঝি যে বলব। আপনি যা বিধান দেবেন তাই হবে। তবে গরুড় বলছিল একটা ছোটজাতের মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করতো নারাণাপ্পা। শুধু তাই নয়…কথা থামিয়ে চোখ খুললো লক্ষ্মণ। তারপর পরনের কাপড়ের খুঁটটা নাকে চেপে বলল।

—শুনেছি সেই মেয়েছেলেটার রান্না করা খাবার খেতেও তার অপ্রবৃত্তি হতো না।

নারাণাপ্পার বাড়ির সামনাসামনি বাস করে পদ্মনাভাচার্য। সে বলে উঠলো

—লোকটা মদও খেত।

—শুধু মদ ! মদ, মাংস, মেয়েছেলে—কোনোটাতেই সে কমতি ছিল না। অবিশ্যি দুর্গাভট্টর দিকে অপাঙ্গে চেয়ে শ্লেষ করলো গরুড়।

—স্মার্ত ব্রাহ্মণদের কাছে ব্যাপারটা তেমন দোষের নয়। তোমাদের গুরু শঙ্করাচার্য তো শুনেছি জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ করতে নিজের শরীর এক মৃত রাজার শরীরের সঙ্গে বদল করে তার রাণীকে সম্ভোগ করেছিলেন। তাই না ? আলোচনার ধারা ভ্রষ্ট হচ্ছে দেখে প্রাণেশাচার্য প্রমাদ গণলেন। গরুড়ের দিকে চেয়ে বললেন।

—গরুড় ! একটু চুপ কর তুমি।

চোখ বুজে লক্ষ্মণ ইতিমধ্যে বলতে শুরু করেছে।

—লোকটা ছিল একেবারে কালাপাহাড়। বিয়ে করা বউকে ছেড়ে অন্য মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করতো। দুঃখে শোকে পাগলের মতন হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। নিজের শালী বলে নয়, কিন্তু ভেবে দেখুন দিনের পর দিন কি অমানুষিক মানসিক অত্যাচার সয়েছে সে ! শেষ অব্দি মরে বাঁচল মেয়েটা। কিন্তু মানুষটা এমনই পাষণ্ড যে স্ত্রীর শেষ কাজের সময় এসে দাঁড়ায় নি পর্যন্ত ! নারাণাপ্পা আমার আত্মীয়। বৌয়ের মাসতুতো ভাই। তাই বলে তো এসব কথা চেপে যেতে পারি না !

ইতিমধ্যে চোখ খুলে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মণ আবার শুরু করলো।

—যতটা পেরেছি ওকে আড়াল করেছি। ক্ষমা করেছি ওকে। কিন্তু বদলে ও কী করেছে ? একদিন এলো। তারপর যে শালগ্রামশিলাখানা আমরা বংশ-পরম্পরায় পূজো করে আসছি সেটা ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দিয়ে এলো। তোমরাই বলো, এরপরও ওকে ক্ষমা করা যায়? আর একদিনের কথা তো সকলেই জানো। কয়েকজন বিধর্মী যবন ধরে এনে ঘরের সামনের চত্বরটায় বসে মদ মাংস নিয়ে কি বেলেল্লাপনাই না করে গেল ! এ-সব নিয়ে কথা বলতে গেলে ছ্যাড়ছ্যাড় করে শুনিয়ে দিতো। আসল কথাটা কি জানো ! যদ্দিন বেঁচে ছিল মানুষটাকে আমরা ভয় করে চলতুম।

স্ত্রী অনসূয়া দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে স্বামীর জ্ঞানগর্ভ কথাগুলো শুনছিল। মনে মনে গর্ব হচ্ছিল তার। আহা! স্বামীর কথাগুলো কত যুক্তিপূর্ণ! হঠাৎ

নজর পড়লো চন্দ্রীর ওপর। একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে আছে। দেখা মাত্রই অনসূয়ার সারা শরীরটা জ্বলে উঠলো। ডাইনীটার পায়েই সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছে নারাণাপ্পা। পৈতৃক সম্পত্তি তো কিছু কম পায় নি সে! অনসূয়ার মামার একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু সব গেছে ওই মাগীটার খপ্পরে। মুখে আগুন! বজ্রপাত হোক ওর মাথায়। বাঘে খাক। সাপে কাটুক। মনে মনে অভিসম্পাৎ দিচ্ছিলো অনসূয়া। হঠাৎ নজর পড়ল চন্দ্রীর গলার হারের দিকে। হাতের কাঁকনের দিকে। হু হু করে কেঁদে উঠলো সে। হায় রে! আজ যদি বোনটা বেঁচে থাকত! গলায় গামছা দিয়ে মাগীর গয়নাগুলো কাড়িয়ে নিতাম না! আর এই যে মানুষটা মরে পড়ে আছে—সৎকার হচ্ছে না। এসব কি ওই বেশ্যা মাগীর জন্যে নয়? ভেতরে ভেতরে টগবগ করে ফুটতে লাগল অনসূয়া।

দরিদ্র দাসাচার্য শ্রাদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ ভোজনের ওপরেই জীবন ধারণ করে থাকে। তা ছাড়া টুকটাক ভোজ লেগেই থাকে। সুতরাং ভোজের নেমন্তন্ন পেলে দশ মাইল হেঁটে যেতেও তার আপত্তি নেই। কিন্তু কথা হলো নেমন্তন্ন তো বন্ধই হতে বসেছে। আশঙ্কার কথাটা মনে হতেই সকলের দিকে চেয়ে সে বললো।

—দেখ ভাই! আমাদের এই অগ্রহারে নারাণাপ্পাকে থাকতে দিয়ে বছর দুই ধরে আমরা কোনো শ্রাদ্ধ বা বাৎসরিক কাজের নেমন্তন্ন পাই নি। এখন যদি তড়িঘড়ি ওই লোকটার অন্ত্যেষ্টি কাজ করে বসি তাহলে চিরকালের জন্যেই আমাদের অগ্রহার পতিত হয়ে যাবে। কোনো ভোজেই আমরা নেমন্তন্ন পাব না। ওদিকে মড়া ফেলে রাখাও চলে না। কদ্দিন আর না খেয়ে কাটাব! এ যেন এক উভয় সঙ্কটে আমরা পড়েছি। আচার্য ছাড়া এ সঙ্কট থেকে আমাদের রেহাই নেই। একমাত্র উনিই বলতে পারেন কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ঠিক নয়।

দুর্গাভট্টের কাছে সমস্যাটা একেবারেই অন্যরকম। অবিচলিতভাবে নিজের জায়গায় বসে সে লুকিয়ে চুরিয়ে চন্দ্রীকে দেখছিল। এই প্রথম সে ভালো করে চন্দ্রীকে দেখলো আর মনে মনে তারিফ করলো তার রূপের। নাঃ! নারাণাপ্পা ছোকরার চোখ আছে। কুন্দপুর থেকে শ্রেষ্ঠ মণিখানাই বেছে

এনেছে সে। কথায় বলে স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি। চন্দ্রী ঠিক তাই। অত্যন্ত মূল্যবান অত্যন্ত গোপন। বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে ঠিক যেমনটি বলা আছে ঠিক সেইরকমটি সুলোচনা কামিনী হলো চন্দ্রীমা। ঝকমকে ধারালো রূপ। মনে মনে লক্ষণ মিলিয়ে নিচ্ছিল দুর্গাভট্ট। পায়ের আঙুলের পেলব গড়ন, সুগঠিত স্তন, দৃষ্টির চঞ্চল বিভ্রম—সব মিলিয়ে যুগপৎ হর্ষ আর বিস্ময় প্রকাশ করছিল তার মন। তার শোবার ঘরে রবি বর্মার আঁকা একখানা ছবি আছে। মৎসগন্ধার ছবি। আলগোছে লাজুক হাতে বুকের কাপড় টেনে দিচ্ছে স্তনযুগলের ওপর। দৃষ্টি থেকে যেন চঞ্চলতা সরে গিয়ে নেমে এসেছে শোকে দুঃখে মাখামাখি একটা গাঢ় ভাব। চন্দ্রী ঠিক তাই। মনে মনে পুলকিত হলো দুর্গাভট্ট। বাঁধভাঙা যৌবনের ঢল নেমে এসেছে চন্দ্রীর দেহে। বন্যার মতন। প্রকৃতির এই শ্রেষ্ঠ সম্পদখানি ভোগ করে গেছে নারাণাপ্পা। এর জন্যে সব ছেড়েছে সে। নিষিদ্ধ আহার্য নিষিদ্ধ পানীয় কোনো কিছুই আস্বাদে বাদ দেয় নি। দুর্গাভট্টর হঠাৎ মনে পড়ে গেল ব্রাহ্মণ কবি জগন্নাথের জীবন কথা। যবনী-রমণী বিয়ে করে ব্রাত্য হয়েছিল জগন্নাথ। কিন্তু কী অসাধারণ দু'টি চরণ লিখেছিল বিধর্মী নারীর বুকের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে! আজ এখানে প্রাণেশাচার্য না থাকলে, অথবা ওই নারাণাপ্পার মড়াটা অমনভাবে পড়ে না থাকলে হয়ত সে ওই বিখ্যাত লাইন দু'টি আবৃত্তি করে বসতো। ব্যাখ্যা করে বোঝাত ওই শুকনো বামুন-গুলোকে। যারা লম্পট – নারাণাপ্পার মতন—কিসের ভয় তাদের? কিসের লজ্জা? লজ্জা, শরম, ভয়—তিন থাকতে নয় এইরকম একটা কি প্রবাদ আছে না!

দুর্গাভট্ট হঠাৎ লক্ষ্য করলো সবাই কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললো।

—আমাদের যা বলবার তা বলেছি। তবে মরা মানুষের দোষ ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করে কি লাভ? গরুড় উত্তেজিত হয়ে অনেক কথাই বলেছে। কিন্তু শেষ কথাটি বলে নি। শেষ কথাটি বলবেন আমাদের সকলের গুরু আচার্য।

প্রাণেশাচার্য সকলের কথাই শুনলেন। বুঝতে পারছিলেন কী নিদারুণ

পরীক্ষায় তাঁকে মারুতিদেব ফেলেছেন। বলতে গেলে তাঁর সিদ্ধান্তের ওপরেই নির্ভর করছে ব্রাহ্মণ্য অগ্রহারের খ্যাতি সম্মান। ধীরে ধীরে থেমে থেমে তিনি বলতে লাগলেন।

--গরুড় বললো সে শপথবদ্ধ। অবশ্য শাস্ত্রে শপথ খণ্ডনের বিধান আছে। একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। একটি গো-বৎস দান করতে হবে। তীর্থ ভ্রমণ করতে হবে। এ-সব অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। গরুড়ের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। আর জোর করে তাকে দিয়ে এ কাজ করানোর অধিকারও আমার নেই। লক্ষ্মণ, দাস ও আর সবাই বলেছে যে নারাণাপ্পা সৎ ব্রাহ্মণ ছিল না। আমাদের অগ্রহারে সে ছিল একটা কলঙ্ক। ফলে আমাদের সুনাম নষ্ট হয়েছে। তোমাদের জিজ্ঞাসাটা খুব গভীর। পরিষ্কার কোনো উত্তর আমার জানা নেই। তবে একটা কথা আছে। স্বভাবে পতিত হলেও নারাণাপ্পাকে আমরা শাস্ত্রমতে পতিত করি নি। শেষদিন অবধি সে ব্রাহ্মণই ছিল। মরেছে ব্রাহ্মণত্ব নিয়েই। তার মৃতদেহ ছোঁবার অধিকার, শাস্ত্রমতে, শুধু আর একজন ব্রাহ্মণেরই আছে। পরিবর্তে আমরা যদি শূদ্র দিয়ে তার কাজ করাই তাহলে আমাদের ধর্ম ক্ষুণ্ণ করবো আমরাই। তবে তোমাদের ওপর আমি জোর করতে পারি না। উদ্ধত হয়ে বলতে পারি না, এ কাজ তোমাদেরই কৃত্য। কারণ আমরা দেখেছি কী পাপাচারীর জীবন সে যাপন করতো। এ অবস্থায় আমাদের কী কৃত্য তা আমি নিজেই জানি না। না, আমি জানি না।

মাথা নাড়লেন প্রাণেশাচার্য। বলতে পারি না সমাধান কি। শাস্ত্রমতেই বা কী বিধান। পাপস্খালনের কোনো বিধান কি আছে?

এই সময় চন্দ্রী এমন একটা কাজ করলো যা দেখে সবাই স্তম্ভিত। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো সে। তারপর একে একে গা থেকে সোনার গয়না-গুলো খুলে প্রাণেশাচার্যর পায়ের কাছে রাখল। চুড়ি, হার, কঙ্কণ। ব্রাহ্মণরা বিহ্বল। বিস্ময়াবিষ্ট প্রাণেশাচার্যও। তিনি বুঝতে পারছিলেন, নারাণাপ্পার মৃত্যুর শেষ খরচ বাবদ গয়নাগুলো গা থেকে খুলে দিলো চন্দ্রী। কাজ শেষ করে আবার পায়ে পায়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলো চন্দ্রী।

গয়নাগুলোর দাম কম করেও হাজার দুয়েকের মতন। সুতরাং অনিবার্য-

ভাবেই ব্রাহ্মণীরা মনে মনে হিসেব কষতে শুরু করে দিলো। পর্যায়ক্রমে স্বামীদের মুখের দিকে তারা তাকালো। পুরুষরা সবাই মুখ নিচু করে বসে। তাদের আশঙ্কা সোনার লোভ ব্রাহ্মণত্বের পবিত্রতা না নষ্ট করে। কিন্তু এই লোভের বশেই যদি কোনো ব্রাহ্মণ নারাণাপ্পার সৎকারে রাজী হয়ে যায়; তাহলে কি সে সত্যিই ব্রাহ্মণত্ব ক্ষুণ্ণ করবে? গয়নাগুলো তখন ব্রাহ্মণীর গলায় উঠে তার মর্যাদা বাড়াবে না কি? বিদ্যুৎ চমকের মতন শেষ সম্ভাবনার কথাটা মনে হতেই গরুড় আর লক্ষ্মণ পরস্পরের ওপর নতুন করে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠলো। দু'জনেরই মনে হলো যত হীন কাজই হোক না কেন ওর পক্ষে এটা মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। কোনোরকমে চোখ কান বুজে কাজটা তুলতে পারলেই হলো। তারপর তো গয়নাগুলো আত্মসাৎ করতে বাধা কোথায়? শাস্ত্রমতে একটা গাভী দান করলেই যখন পাপস্খালন হওয়া যায়, তখন কিসের সংশয়? দুর্গাভট্ট, মনে মনে ভাবতে বসলো এই মাধ্বী বামুনগুলো কোনো হীন কাজেই পেছপা নয়। তবে তেমন যদি কিছু সত্যিই ঘটে তাহলে সে-ও চুপ করে থাকবে না। জনে জনে বলে বেড়াবে ওদের এই হীন প্রবৃত্তির কথা। সকলের সামনে ওদের মুখোশ টেনে খুলে দেবে। শুধু দাসাচার্যের মতন যারা দরিদ্র তাদেরই চোখ দুটো ভরে উঠলো জলে। হায় রে! গরুড় বা লক্ষ্মণ কি আর কাউকে নারাণাপ্পার অন্ত্যেষ্টি কাজে হাত দিতে দেবে!

প্রাণেশাচার্যও বিচলিত। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে চন্দ্রীর উদ্দেশ্য হীন নয়। কিন্তু ব্যাপারটা এমনই যে বিশৃঙ্খলা হবেই। ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। সকলেই চেষ্টা করছে কে কতখানি নারাণাপ্পার চরিত্র হনন করতে পারে। যাতে অন্তত লোভ করেও এ কাজে অন্য কেউ না এগোয়। প্রাণেশাচার্য স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলেন এদের কথা। একজন বললো।

—গরুড়ের ছেলেটাকে নষ্ট করল কে? ওই নারাণাপ্পাই তো? আচার্য নিজে কত যত্ন করে ছেলেটাকে বেদ পড়াচ্ছিলেন। কিন্তু তাতে কি? বেদ মাথায় ঢুকলে তো! মাথায় তখন ঘুরঘুর করছে নারাণাপ্পার ফুস মন্তর। জোয়ান ছেলেদের মাথা খাবার যম ছিল নারাণাপ্পা।

—কেন? লক্ষ্মণের জামাইবাবাজির কি অবস্থা করেছে? মা-বাপ মরা অনাথ ছেলেটাকে ঘরে এনে ছেলের মতন মানুষ করছিল লক্ষ্মণ। নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলো। তারপর ওই শয়তান এসে ওর মাথাটি খেলো। আজকাল তো এদিকপানে দেখাই যায় না ছোঁড়াটাকে।

—তারপর মন্দিরের ওই পুকুরটা? বংশ-পরম্পরায় শুনে আসছি ওই পুকুরের মাছ মারুতিদেবকে উচ্ছুগ্গু করা আছে। পুকুরের মাছ যে ধরবে তার আর রক্ষে নেই। রক্তবমি করতে করতে মরবে সে। ওমা! কোথায় কি? দিব্যি মুসলমান ইয়ারের দল নিয়ে ছোঁড়া এলো। পুকুরের সব মাছ ধরলো। হল্লা করলো। কিছুই তো হলো না। সেই থেকে এমন হয়েছে, চামার ধাঙড় সবাই এসে পুকুর পাড়ে বসে মাছ ধরে। কাউকে তো বাপু রক্তবমি করে মরতে শুনি নি। দিনে দিনে আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সব খাটো করে দিয়েছে ওই পাষণ্ডটা। অগ্রহারটাকে উচ্ছন্নে দিয়ে গেছে। এই সময় কে যেন বললো।

—শুধু কি আমাদের অগ্রহার? পারিজাতপুরের ছোঁড়াগুলোকে দিয়ে যাত্রা পালা করানোর মতলব তো ওরই। ওদেরও নষ্ট করেছে ওই নরাধমটা।

—পাষণ্ডটাকে পতিত করাই উচিত ছিল।

—তা কি করে হয় গরুড়! তাহলে তো ছোঁড়াটা ঠিক মুসলমান হয়ে যেতো। ওই সব বলেই তো ভয় দেখাত আমাদের। মনে পড়ে, শুক্লা একাদশীর দিন যখন সবাই নির্জলা উপোস করতাম, তখন ছোঁড়াটা মুসলমান ইয়ার-বক্সি নিয়ে অগ্রহারে আসতো খানাপিনা করতে। নির্লজ্জের মতন চেঁচামেচি করতো আর বলতো—আমায় পতিত করলে আমি আগে মুসলমান হব। তারপর সবকটা বামন শালাকে থামের গায়ে বেঁধে মুখে গরুর মাংস পুরে দেবো। ঘুচিয়ে দেবো বামনাই তেজ। তাহলেই বোঝো—

—নারাণাপ্পা মুসলমান হলে এ জায়গায় আর টিকতে হতো না আমাদের। আচার্য পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন! হাত পা যে আমাদের বাঁধা!

দাসাচার্যর শরীরটা যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠলো। সে বুঝতে পারলো মহা-প্রাণীটি অস্থির হয়ে উঠেছেন। কাঁচা আমের অম্বল মেখে সবে এক দলা ভাত মুখে পুরেছে তখনই উঠে পড়তে হলো। গেলা হলো না। কান্না-কান্না

গলায় বলে উঠলো সে।

—অমানুষটা বাপের কাজটা পর্যন্ত করে নি যে গিয়ে খাব। ওর বাগানের কাঁঠালটার স্বাদ তো ভুলেই গেছি। আহা! মধুর মতন মিষ্টি।

ব্রাহ্মণীরা বিস্ফারিত চোখে সেই স্তূপীকৃত গয়না দেখছিল। মিনসেগুলোর কথাবার্তার ধরনধারণ মোটেই মনঃপূত হচ্ছিল না তাদের। গরুড়ের ব্রাহ্মণী সীতা ভাবলো তার ছেলে বদ সঙ্গে মিশে মিলিটারিতে ঢুকলো তো লক্ষ্মণের কি? আবার লক্ষ্মণের ব্রাহ্মণী অনসূয়া ভাবলো, তার জামাই বেপাত্তা হলো কি হলো না তার জন্যে গরুড়ের এতো মাথাব্যথা কেন?

সকলের সব কথা শুনতে শুনতে প্রাণেশাচার্য ভাবছিলেন কি কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা তাঁর সামনে। পড়ে থাকা শবদেহটার কথা ভেবে মনে মনে বললেন —সংকারের ব্যবস্থা এখুনি করা দরকার। হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার সময় এখন নয়। অথচ শাস্ত্র মতে কিছু না করা অবধি শুদ্ধ হতে পারবে না কেউ। সংকারের কাজ করাতে হবে ব্রাহ্মণকে দিয়েই। কিন্তু কে ছোঁবে ওই অনাচারীর মড়া!

এই সময় গরুড় বলে উঠল।—আচার্য! তখনই আপনাকে বলেছিলুম নারাণাপ্পাকে শাস্ত্রমতে পতিত করুন। তখন আমার কথা শুনলে আজ এই সমস্যায় আমাদের পড়তে হতো না।

বাকি সকলেও গরুড়ের কথায় সায় দিলো। সমস্বরে বললো।

—তা বটে। যদি সত্যিই সে মুসলমান হতো তাহলেও কোনো সমস্যা থাকত না। খুব জোর এ জায়গা ছেড়ে আমরা চলে যেতুম।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো দাসাচার্য। এতক্ষণ কল্পনায় নিজের দুরবস্থার কথা সে ভাবছিল। তার মধ্যেই বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা আশার রোশনাই সে দেখতে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললো।

— আমি শুনেছি আর তোমরাও জান, পারিজাতপুরের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নারাণাপ্পার বেশ দহরম-মহরম ছিল। তাদের সঙ্গে একটু পরামর্শ করলে হয় না! একথা তো ঠিক যে আমাদের মতন অত গোঁড়া তারা নয়!

পারিজাতপুরের ব্রাহ্মণরা স্মার্ত। দুর্গাভট্টও স্মার্ত। সেইজন্যেই বোধহয় ওদের ওপর একটু স্বজাতি প্রীতি তার আছে। তাছাড়া বড় বড় সুপুরি

বাগানের মালিক তারা। ধনী, বিলাসপ্রিয়। আচার-বিচার নিয়ে শুচিবাই তাদের নেই। হয়ত মানে কুলীন নয়, তাই। শোনা যায় কোনো এক সময়ে এক দুশ্চরিত্র যুবকের ঔরসে ওদের সমাজের এক বিধবা নাকি গর্ভিণী হয়েছিল। কলঙ্কের ভয়ে অগ্রহারী বামুনরা ব্যাপারটা নাকি চাপা দেবার চেষ্টা করে। শৃঙ্গেরীর আচার্য ব্যাপারটা জানতে পারেন। রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে পারিজাতপুরের সমস্ত ব্রাহ্মণদের পতিত করে দেন। সেই থেকেই ওরা পতিত। হয়ত সেইজন্যেই লোকের চোখে অনাচারী, ভ্রষ্ট। অবশ্য দুর্গাভট্ট তা মনে করে না। হয়ত একাসনে বসে তরকারি মেখে ভাত খায় নি। আহার করার প্রবৃত্তি হয় নি। তবে তাদের তৈরি খাবার বা কফি সে গোপনে খেয়েছে। আর সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছে ওদের মেয়েদের দেখে। বিধবারা মাথার চুল নিষ্ঠুরের মতন ছেঁটে ফেলে নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখায় না। তারাও বেণী ঝোলায়। পানের রসে রক্তিম আর রসালো করে ঠোঁট। তাই দাসাচার্যর ইঙ্গিতটা শুনে সে বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। মনে মনে বললো—দাম্ভিকটা বলে কি! এক বেলা যার পেটপুরে খাওয়া জোটে না! মুখে বললো।

—ওদের সম্বন্ধে তোমারই ইঙ্গতটা খুব অশোভন হয়েছে। তুমি হয়ত ওদের অন্ত্যজ ভাবতে পারো। কিন্তু ওরা নিজেদের বামুন বলেই মনে করে। তাছাড়া তোমার প্রস্তাবটাও অদ্ভুত। তোমরা মাধ্বী বলে মড়া ছোঁবে না—নাকি জাত যাবে ছুঁলে। অথচ যেহেতু স্মার্ত, ওরা ছুঁলে জাত যাবে না! এমন একটা ভণ্ডামির প্রস্তাব ওদের কাছে তোলবার প্রবৃত্তি হবে? আমার ধারণা সে দুঃসাহস তোমার হবে না। মঞ্জাইয়াকে চেনো তো? পারিজাতপুরের সবচেয়ে ধনী। আমাদের সক্কলকে সে কিনে রাখতে পারে।

দুর্গাভট্টর রাগ সামলাতে চেষ্টা করলেন প্রাণেশাচার্য। তার দিকে চেয়ে বললেন।

—তুমি ঠিকই বলেছ। যে কাজ করতে তুমি বা আমি দ্বিধা করবো তা অপরকে দিয়ে করাবো কেন? তাতে নিশ্চয়ই ধর্মনাশ হবে। তবে—একটা কথা নিশ্চয়ই মানবে। রক্তের যেমন সম্পর্ক আছে তেমনি বন্ধুত্বের সম্পর্কও নিটোল। পারিজাতপুরের ওরা আর আমাদের নারাণাপ্পা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু

ছিল। সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে তাদের কাছে নারাণাপ্পার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

দুর্গাভট্ট প্রতিবাদ করলো না। শুধু বললো।

—আপনি আচার্য, যা বিধান দেবেন আমরা তা-ই মানবো। আপনার দায়িত্ব কত! ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করা তাকে স্বাধিকারে রাখা। সবই দেখতে হয় আপনাকে। আপনার বিধানের বিরুদ্ধে যাবার কথা আমরা ভাবতেই পারি না।

কথাকটা বলে চুপ করলো দুর্গাভট্ট।

তখন অনিবার্যভাবেই অলঙ্কারের সমস্যাটা সামনে এসে দাঁড়ালো। পারিজাতপুরের ব্রাহ্মণরা যদি সত্যিই সৎকার করতে রাজী হয়ে যায় তাহলে তো চন্দ্রীর ইচ্ছানুসারে গয়নাগুলো তাদেরই প্রাপ্য হয়। লক্ষ্মণাচার্যের ব্রাহ্মণী অনসূয়া যেন এই ব্যাপারটাই বরদাস্ত করতে পারলো না। বাষ্পাকুল চোখে ডাঁই করা গয়নার দিকে তাকাতে তাকাতে হু হু করে জ্বলে উঠলো তার বুকখানা। কোথাকার কোন্ দো-আঁশলা জাতের মেয়েছেলে ওরা! শেষপর্যন্ত কি ওদেরই গায়ে গয়নাগুলো উঠবে! কান্না চাপা গলায় বলে উঠল সে।

—এ কিরকম বিধান হলো আপনাদের? সব যদি নিয়ম মতো ঘটতো তাহলে তো গয়নাগুলো আমার বোনেরই পাওয়া উচিত ছিল। কথা শেষে কেঁদে ফেললো অনসূয়া। মনে মনে স্ত্রীর উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারলো না লক্ষ্মণ। কিন্তু হঠাৎ গায়ে পড়ে কোনো আগ্রহ দেখালো না। পাছে তার অভিসন্ধির আঁচ পায় কেউ। বরং মুখে কৃত্রিম ধমক দিয়ে উঠলো স্ত্রীকে।

—তুমি চুপ করো। পুরুষদের আলোচনার মধ্যে তোমার কথা বলার কি দরকার—য়্যাঁ?

গরুড়াচার্য কিন্তু নিঃশব্দে হজম করতে পারল না ব্যাপারটা। উগ্র কণ্ঠে বলে উঠলো।

—তা কি করে হয়? ধর্মস্থলের আচার্য যে বিধান দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী গয়নাগুলোর অধিকার শুধু আমার।

প্রাণেশাচার্য দুঃখিত হলেন। সকলের মুখের দিকে চেয়ে ক্ষুণ্ন স্বরে বললেন।

—তোমরা একটু শান্ত হও। আমাদের সামনে এখন এক মহাকর্তব্য উপস্থিত। মৃতদেহ এখনই সৎকার হওয়া দরকার। আগে সেটা হোক। তারপর গয়না ভাগাভাগির দায়িত্বটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি কথা দিচ্ছি—উচিত ব্যবস্থাই করবো। উপস্থিত তোমাদের মধ্যে কেউ একজন পারিজাতপুরে চলে যাও। খবরটা জানাও। দেখ, সৎকার করতে তাঁরা রাজী কি না। যদি হন, তাহলে তাঁরাই করুন।

উঠে দাঁড়ালেন প্রাণেশাচার্য। আবার বললেন।

—ইতিমধ্যে আমি মনু, পরাশর পড়ি—দেখি শাস্ত্র খুঁজে। এই সঙ্কটের কোনো বিধান পাই কি না।

চন্দ্রী মাথার ওপর ঘোমটা তুলে সসম্ভ্রমে তাকালো আচার্যদেবের দিকে। শুধু সম্ভ্রম নয়। মিনতিও ঝরে পড়ছিল তার দু'চোখ দিয়ে।

২

ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর আর দুধের তাকে আরশোলার উৎপাত আছে সব গেরস্ত ঘরেই। মাঝের ঘরে দড়ি টাঙানো। তাতে ঝুলছে শুদ্ধ করে কাচা শাড়ি ধুতি। ঘরের কোলে বারান্দা। বারান্দায় একটা মাদুর পাতা। তাতে শুকোচ্ছে পাঁপর, নুনে জরানো লাল লঙ্কা। পেছনের জমিতে শোভা পাচ্ছে সুরভিত ফুলের গাছ। এই সামান্য বিলাসিতাটুকু সব গেরস্ত ঘরেরই সম্পদ। তফাৎ যা তা হলো জাতের। ভীমাচার্যর বাগানে পারিজাত ফুল। পদ্মনাভাচার্য পছন্দ করে জুঁই। লক্ষ্মণের ঘরে শোভা পাচ্ছে সোনালি চাঁপা গরুড়ের পছন্দ লাল রঞ্জ ফুলের ঝাড়। দাসাচার্য ভালবাসে সাদা ফুল। দুর্গাভট্ট শৈব। নিত্য শিবপুজোর জন্যে তার দরকার বেলপাতা আর আকন্দ ফুল। সুতরাং তার বাগানে ওই গাছেরই সমাহার। অগ্রহারের ব্রাহ্মণরা ভোর না হতেই ছোটে পড়শির বাগানে। ফুল তোলা, কুশল বিনিময় এক সঙ্গেই হয়। এইভাবেই শুরু হয়ে যায় নিত্যকার দিনযাত্রা।

নারাণাপ্পার বাগানে যে ফুল ফুটতো তা শোভা পেতো চন্দ্রীর খোঁপায়। যে

ফুলের কদর চন্দ্রীর খোঁপায় হতো না তার স্থান হতো শোবার ঘরের সুদৃশ্য বাহারি ফুলদানিতে। কখনও কখনও নারাণাপ্পার মনে হতো পরিবেশ আরও মদির হওয়া দরকার। নইলে চন্দ্রীর প্রতি আকর্ষণ তীব্র হচ্ছে না। তাই যত্ন করেই নারাণাপ্পা তার বাগানে কেয়ার ঝাড় বসালো। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেয়ার উগ্র মদির গন্ধে বাতাস ম ম করতো। মনে হতো সমস্ত অগ্রহার যেন এই গন্ধের আবেগে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পিণীর মতন দুলছে। দুষ্ট লোকেরা অবশ্য অন্য কথা বলতো। কেয়ার উগ্র গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সাপ আসে। নারাণাপ্পা সাপের প্রহরায় তার শ্রেষ্ঠ রত্নটি যত্ন করে রক্ষা করছে।

অন্য ব্রাহ্মণীদের কুন্তলহীন মাথায় শোভা পেত জুঁই বা পারিজাত। স্বর্ণচাঁপা বা মন্দিরা। মলয় বাতাসে ঝুরঝুর ঝরতো তাদের মৃদু সুবাস। চন্দ্রী তার বেণী সাজাতো রজনীগন্ধা দিয়ে। বাতাস ভরে থাকতো তার গন্ধে। ব্রাহ্মণরা গায়ে মাখতো চন্দনবাটা। দিনের বেলার বাতাসে লেগে থাকতো আলগা সুবাস কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস ভারি হয়ে উঠতো কেয়ার তীব্র মিষ্টি গন্ধে।

ফুলের মতন ছিল আম কাঁঠালের ফলের বাগান। স্বাদে জাতে তারা ভিন্ন। কথায় বলে—ফল ভাগাভাগি করে খাও, আর ফুল ভাগাভাগি করে খোঁপা সাজাও। অগ্রহারে খুব চালু ছিল এই লেনদের প্রথা। বাজারে কেউ ফল বিকোতে যেতো না।

অবশ্য ব্যতিক্রম হলো লক্ষ্মণ। প্রবৃত্তিটা তার চিরকালই হীন। লুকিয়ে লুকিয়ে সে বাগানের ফল কোন্‌কানি ফলওলাদের বাজারে বেচে আসত। স্ত্রীকেও সে বিশ্বাস করতো না। শ্বশুরবাড়ির লোকজন এলে শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতো ব্রাহ্মণীর হাত দিয়ে কতগুলো ফল পাচার হচ্ছে। সারা গ্রীষ্মটাই চলতো এই দেওয়া নেওয়া। শশা কুচি আর মিষ্টি ফলের শরবত দিয়ে পরস্পর আপ্যায়ন করতো। তারপর কার্তিক পড়লে দেওয়ালী উৎসবের নেমন্তন্নতে মেতে উঠতো সবাই।

শুধু নারাণাপ্পাই নিজেকে এই সম্প্রীতির বাঁধন থেকে আলাদা করে রেখেছিল। অগ্রহারের যে বড় রাস্তা তার দু'ধারেই দশখানা বাড়ি। শেষ প্রান্তের বড় বাড়িটা নারাণাপ্পার। রাস্তার যে ধার দিয়ে তুঙ্গভদ্রা বয়ে গেছে সে-

ধারের বাড়িগুলোর খিড়কি দিয়ে নদীতে নামবার সিঁড়ি আছে। বর্ষায় নদীর জল ফুলে ফেঁপে ওঠে। গর্জন করে ছোটে। কোথাও ঘূর্ণি সৃষ্টি করে। কোথাও বা তার বেগ বন্ধনহীন, দুর্বার। মনে হয় এই বুঝি নদীর গ্রাসে কবলিত হবে অগ্রহার। মাঝ গ্রীষ্মে এই ভরা নদীই হয়ে ওঠে ঝিরঝিরে স্রোতোস্বিনী। বিন্দু বিন্দু জল ক্ষরণের মৃদু মর্মরধ্বনি ওঠে তার বুক থেকে। তখন অগ্রহারের ব্রাহ্মণরা নদীর বালুচরে শশা আর তরমুজের চাষ করে। বর্ষার ভারি মুখরোচক খাবার হলো শুকনো শশার কুচি। বারো মাস সব ঘরেই ঝোলানো রয়েছে কলাপাতায় মোড়া হলুদ রংয়ের বড় বড় শশা। সেগুলো ফালাফালা করে কুটে শুকনো করে রাখা হয়। বর্ষাকালে এই শুকনো শশার কুচি ডাল, ঝোল, ডালনা—সবেতেই দেওয়া হয়। গর্ভিণী মেয়েদের মতন সব ব্রাহ্মণরাই বর্ষাকালে শুকনো শশার কুচি আর আমচুরের অম্বল খেতে ভালবাসে। এ ছাড়া বারো মাসই ভোজের বায়না লেগে থাকে। বিয়ে, শ্রাদ্ধ, পৈতে উপলক্ষে। আবার বড় বড় উৎসবও হয়। যেমন মন্দিরের বাৎসরিক উৎসব বা টিকাচার্যর মতন কোনো স্বনামধন্য মানুষের মৃত্যু তিথি উপলক্ষে ভোজ। তখন তিরিশ মাইল হেঁটেও ব্রাহ্মণরা ভোজ খেতে যায়। বছরের বারোটি মাস এই আবর্তেই কেটে যায় অগ্রহারের মানুষদের।

অগ্রহারের নাম ছিল দুর্বাসাপুর। নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অদ্ভুত এক উপাখ্যান। তুঙ্গ নদীর মাঝামাঝি জেগে উঠেছিল দ্বীপের মতন একটা টিলা। টিলার মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে ঘন গাছের জঙ্গল। লৌকিক কিংবদন্তী হলো দুর্বাসা মুনি এখানে বসে তপস্যা করতেন। সে সময় কিছুদিনের জন্যে পঞ্চ পাণ্ডব আর দ্রৌপদী অজ্ঞাতবাস করতে এলেন দুর্বাসাপুর থেকে দশ মাইল দূরে কৈমারে। একবার হলো কি—তুঙ্গ নদীতে জলকেলির বাসনা হলো দ্রৌপদীর। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম দ্রৌপদীর কোনো বাসনাই অপূর্ণ রাখতেন না। এটাও অপূর্ণ রইলো না। কৈমারের কাছে তুঙ্গভদ্রা নদীকে বেঁধে ফেল্লেন ভীম। পরদিন মুনি দুর্বাসা স্নান সমাপন করতে গিয়ে দেখেন কলকলনিনাদিনী স্রোতোস্বিনী জলশূন্য। এক বিন্দু জলও অবশিষ্ট নেই। স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হলেন ঋষি। ঠিক সেই সময় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও মানস

দৃষ্টিতে সব দেখতে পেলেন। মুনির ক্রোধ আর অভিশাপ থেকে নিস্তার পেতে তিনি পবননন্দন ভীমকে বাঁধ ভেঙে দিতে উপদেশ দিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপদেশ কোনোদিনই উপেক্ষা করেন নি ভীম। সুতরাং তাঁর ইচ্ছামতই বাঁধের তিনটি মুখ ভেঙে দেওয়া হলো। কুলুকুলু-নিনাদে স্রোতোস্বিনী বইতে লাগলো দুর্বাসাপুরের দিকে। আজও দেখা যায় কৈমার থেকে দক্ষিণা-মুখী তুঙ্গভদ্রা ত্রিমুখী ধারায় নেমে এসেছে দুর্বাসাপুরের কাছে। দুর্বাসা-পুরের ব্রাহ্মণীরা প্রতিবেশী অগ্রহারীদের কাছে দাবি করেন যে কোনো অপাপবিদ্ধ ব্রাহ্মণ ইচ্ছে করলে শুক্লা দ্বাদশীর উষালগ্নে টিলার মাথা থেকে দুর্বাসা মুনির শঙ্খধ্বনি শুনতে পারেন। অবশ্য কোনো ব্রাহ্মণই আজ পর্যন্ত শঙ্খধ্বনি শুনেছেন বলে দাবি করেন নি।

মোটামুটিভাবে বলা যায় দুর্বাসাপুরের অগ্রহারীরা সবদিকেই শ্রেষ্ঠ। কিংবদন্তীর ব্যাপারটা তো আছেই। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বেদজ্ঞ প্রাণেশাচার্যর অবস্থান। একদিকে তিনি, অন্যদিকে নারাণাপ্পা—শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট দুটি রত্নের সমাবেশে অগ্রহার সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিন বা ওইরকম কোনো বিশেষ দিনে পাশাপাশি অগ্রহার থেকে ব্রাহ্মণীরা ছুটে আসে প্রাণেশাচার্যর কাছে। প্রাণেশাচার্য তাদের উপদেশ দেন। পুরাণ গাথা শোনান। তবে গৃহী জীবনেও তিনি উদাসীন নন। রুগ্না স্ত্রীর সেবাযত্নের কাজ নিত্য পালন করেন। এই নিত্যকৃত্যের মধ্যেও ঈশ্বরানুগ্রহ যে অনুপস্থিত নয় তা ব্যাখ্যা করেন। যাতে সবাই বুঝতে পারে যে মন্ত্রোচ্চারণ নিছক অভ্যাস নয়। তাঁর দেহযষ্টি যেন অর্পিত চন্দন-কাষ্ঠ। নিত্য ঘর্ষণে সুরভিত হতো সেই দেহযষ্টি। তবুও দুষ্ট ব্রণর মতো নারাণাপ্পার অনাচার মাঝে মাঝে তাঁকে বিমনা করতো। অগ্রহারী সমাজে নারাণাপ্পা সত্যিই একটা সমস্যা হয়ে উঠেছিল।

নিদাঘের সেই দুপুরটা যেন তপ্ত খোলা। ভুট্টার দানা ফেলে দিলে যেন খই হয়ে যায়, এমনি তাপ অগ্রহারের রাস্তায়। ব্রাহ্মণরা চলেছে রাস্তা দিয়ে। খিন্ন, ক্লিষ্ট, তৃষ্ণার্ত। ধুতির খুঁট দিয়ে মাথাটা ঢাকা। ত্রিমুখী তুঙ্গ পেরিয়ে ঘণ্টাখানেক হাঁটবার পর তারা পারিজাতপুরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছালো। পৃথিবীর কোথাও সেদিন বাতাস ছিল না। গাছের পাতা একটুও নড়ছিল

না। তবুও বনবীথিতল দিয়ে যেতে যেতে ব্রাহ্মণদের সারা শরার যেন জুড়িয়ে গেল। ঘন সবুজ সুপারি গাছের সারি যেন পৃথিবীর সব তাপ শুষে নিয়ে উর্ধ্বাকাশে ছুঁড়ে দিয়েছে। পায়ের তলায় গরম তাপ আর যেন সইছে না। এমন সময় তারা মঞ্জাইয়ার বাড়িতে এসে পৌঁছালো। মনে মনে নারায়ণকে স্মরণ করে তারা বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। পারিজাতপুরের বিশিষ্ট ধনী মঞ্জাইয়া। রীতিমত করিৎকর্মা এবং বিষয়ী। হিসেবের খাতা দেখছিল সে। হঠাৎ মুখ তুলে এতগুলো মানুষ দেখে একটু অবাক হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘোর কাটিয়ে বলে উঠলো।

— আরে কি সৌভাগ্য! অগ্রহারের সব ব্রাহ্মণ আজ আমার কুটিরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। একে ব্রাহ্মণ তায় অতিথি। অনুগ্রহ করে আপনাদের সেবার সুযোগ দিন। হাত পা ধুয়ে আরাম করে বসুন। ওগো! শুনছো! দেখ, কারা এসেছেন। শীগ্‌গির অতিথি নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করো। কিছু পাকা কলা নিয়ে এসো। বস্তুত মঞ্জাইয়ার অকৃত্রিম আপ্যায়নে সবাই মুগ্ধ। মঞ্জাইয়ার স্ত্রী একটা বড় পাত্রের ওপর কিছু পাকা কলা নিয়ে এলো। তারপর সকলের উদ্দেশে বললো।

—আসুন। আসুন।

মঞ্জাইয়ার ব্রাহ্মণীকে ধন্যবাদ দিয়ে সকলে ভেতরে এসে বসলো। গরুড় চুক-চুক শব্দ করে দুঃখু দুঃখু মুখ করে নারাণাপ্পার মরার খবর দিলো।

মঞ্জাইয়া জানতো না ব্যাপারটা। রীতিমত চমকে উঠলো সে।

—সে কি? হয়েছিল কি তার? এই তো দিন আষ্টেক আগেও সে এখানে এসেছিল। বললো শিমোগা যাবে। জিজ্ঞেস করলো কিছু করতে হবে কি না। আমি বলেছিলাম বাজারটা একটু ঘুরে আসতে। কিরকম দামে সুপুরি বিকোলো দেখে আসতে। আর এরই মধ্যে চলে গেল সে? আহা রে? শিব! শিব! বলেছিল বেস্পতিবারের মধ্যে ফিরবে। আর ফেরা হলো না। তা হয়েছিল কি তার? মরলো কিসে?

দাসাচার্য বললো।

— ঠিক চারদিনের জ্বর। ব্যস! সব শেষ। শেষটায় শরীর ফুলে গিয়েছিল। শরীর ফুলে যাবার কথা শুনে মনে মনে শিউরে উঠলো মঞ্জাইয়া। চকিতে

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—শিব ! শিব !

সেই ভয়াবহ মহামারীর কথা সে শুনেছে। শিমোগা শহরে যা ছড়িয়েছে। চোখ বুজে হাত পাখা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে সে আতঙ্কে শিউরে উঠলো। মনে মনে ভাবতেও ভয় হচ্ছিল তার। উচ্চারণ করা তো দূরের কথা। চোখের পলকে পারিজাতপুরের পতিত ব্রাহ্মণরা ইতিমধ্যে এসে জড়ো হয়েছে মঞ্জাইয়ার ঘরের সামনে।

দলের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত গরুড়। সকলের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে সেই শুরু করলো কথা।

—তোমরা তো ভাই জান, আমাদের অগ্রহারীদের সঙ্গে নারাণাপ্পার আদৌ জল চল ছিল না। কিন্তু তোমরা তার বন্ধু ছিলে। এখন নারাণাপ্পা মরেছে। তার সংকারের প্রশ্ন এসেছে। এখন তোমরাই বলো কি করা উচিত।

পারিজাতপুরের ওরা নারাণাপ্পার মরার খবর শুনে খুবই দুঃখ পেল। তবে সংকারের সুযোগ পেল বলে খানিকটা খুশিও হলো। আর যাই হোক নারাণাপ্পা আপনজনের মতই ব্যবহার করতো। জাতপাঁত মানতো না। এক সঙ্গে বসে আহারও করেছে। পতিত বলে তাদের কখনও উপেক্ষা করে নি। পারিজাতপুরের পুরোহিত শঙ্কর ওদের কথার মধ্যেই বলে উঠলো।

—দ্যাখো বাপু! শাস্ত্রে বলে সাপেরও দুবার জন্ম হয়। মরা সাপেরও সংকার করতে হয়। এবং যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ ব্রাহ্মণের অন্নগ্রহণ অশাস্ত্রীয়। আর আমাদের নারাণাপ্পা তো ব্রাহ্মণ। তার মড়ার গতি না হলে যে অপরাধ হবে তা অমার্জনীয়। তোমরা কি মনে করো?

লোকটি এমন দম্ভের সঙ্গে কথাগুলো বললোযেন মনে হচ্ছিল মাধ্বী ব্রাহ্মণদের কাছে নিজের শাস্ত্রজ্ঞানের বহর দেখানোই তার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বোঝাতে চাইলো—দ্যাখো, তোমাদের থেকে আমরা কিছু কম নই। কিন্তু দুর্গাভট্ট লোকটার স্বল্প বুদ্ধির অহমিকা দেখে ভয়ানক চটে উঠলো। মনে মনে বললো লোকটার জন্যে সমস্ত স্মার্ত কুলের না বদনাম হয়! তখন তার স্বভাবসিদ্ধ বাঁকা ভঙ্গিতে সে শুরু করলো বলতে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরাও তা জানি। আমাদের আচার্য প্রাণেশাচার্য তা বলেছেন। কিন্তু আপৎটা সেখানে নয়। ব্রাহ্মণ হলেও কর্মদোষে নারাণাপ্পা ছিল

অব্রাহ্মণ। মদ মাংস খেত। লাথি মেরে শিবের নুড়ি জলে ফেলে দিয়েছিল। সুতরাং জন্ম সূত্রে ব্রাহ্মণ হলেও ব্রাহ্মণত্ব তার বজায় ছিল কতখানি, প্রশ্ন সেটাই। এখন বলো তোমাদের মধ্যে কেউ ব্রাহ্মণত্ব ঘুচিয়ে তার অন্ত্যেষ্টি করতে রাজি কি না! অবশ্য এ কথা যথার্থ কোনো ব্রাহ্মণের মড়া বেশি-দিন ফেলে রাখা অশাস্ত্রীয়। যত তাড়াতাড়ি তার সৎকার হয় ততই মঙ্গল।

মনে মনে শঙ্কিত হলো শঙ্কর। পারিজাতপুরের ব্রাহ্মণরা এমনিতেই পতিত। এর ওপর যদি ব্রাহ্মণত্ব খোয়া যায় তাহলে তা হবে রীতিমত অবমাননাকর। তাই দুর্গাভট্টর কথা শেষ না হতেই সে বলে উঠল।

—ছি ছি! সে কি কথা! এসব সূক্ষ্ম ব্যাপারে আমাদের মোটেই হটকারি হওয়া সাজে না। তোমরা বরং প্রাণেশাচার্যর কাছ থেকেই বিধান নাও। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং জ্ঞানী। ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিতের সূক্ষ্ম বিচার সারা দাক্ষিণাত্যে শুধু তিনিই করতে পারেন।

মঞ্জাইয়া একটুও ইতস্তত করলো না। চট করে বলে উঠলো।

—তোমরা মোটেই খরচের কথা ভেবো না। খরচ যা লাগবে সব আমি দেবো। এ কথা তো ঠিক যে নারাণাপ্পা আমার বিশিষ্ট বন্ধু মানুষ ছিল! বস্তুত মঞ্জাইয়া কথাগুলো বললো মাধ্বী শ্রেণীর বামুনদের কৃপণতার দিকে কটাক্ষ করেই।

৩

ব্রাহ্মণরা দলবেঁধে যখন পরিজাতপুরের উদ্দেশে রওনা হলো তখন বাধ্য হয়েই চন্দ্রীকে সেখানে অপেক্ষা করতে বললেন প্রাণেশাচার্য। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে রুগ্না স্ত্রীর পাশে বসলেন। শয্যাশায়ী স্ত্রীর কাছে ধীরে ধীরে সব কথা বললেন তিনি। চন্দ্রীর হৃদয়টা যে প্রকাণ্ড সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ। নইলে শুধু আবেগের বশে গায়ের অতগুলো গয়না সে খুলে দিতো না। অবশ্য একথা ঠিক অমন নাটকীয় ভাবে গয়নাগুলো খুলে না দিলে এই জটিলতা দেখা দিত না। তবে যে জটিলতাটুকু দেখা দিয়েছে

তার জন্যে চন্দ্রীকে দায়ী করা চলে না। শাস্ত্রসম্মত একটা বিধান নিশ্চয়ই আছে কোথাও। যা তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে। স্তূপাকার পুঁথির মধ্যে বসে এইসবই ভাবছিলেন আচার্য।

ভাবছিলেন আরও একজনের কথা। নারাণাপ্পা। লোকটা সত্যিই যেন মূর্তি-মান সমস্যার মতন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানুষটার চিন্তাধারাও ছিল তামসিক। সমাজ ধর্মের কোনো অনুশাসনই মানতে চাইত না সে। বেঁচে থেকে সে শুধু প্রাণেশাচার্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করে গেছে। একদিকে তার কালাপাহাড়ি চিন্তাধারা—প্রাচীন যা সবকিছুরই ওপর আঘাত করেছে তার অনুদার মন। অন্যদিকে তাঁর নিজের সনাতনী বিশ্বাস। কাজে ভাবনায় কঠোর নিয়ম নিগড়ে বাঁধা তাঁর সংস্কারাশ্রয়ী মন পদে পদে কুণ্ঠিত হয়েছে। হার-জিতের এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কে জিততো কে জানে! মাঝে মাঝে তাঁর মনে হতো অনাচারের এই প্রবৃত্তি কোথা থেকে পেল নারাণাপ্পা? সপ্তাহে দু'দিন ঈশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতেন। যেন নারাণাপ্পার মনে শুভবুদ্ধির উদয় হোক। উত্তরণ হোক অন্ধকার থেকে আলোর জগতে। মনে পড়লো সেই বৃদ্ধা মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ আকুল নিবেদন। বৃদ্ধার শীর্ণ হাতদুটি ধরে কথা দিয়েছিলেন প্রাণেশাচার্য।

—ভাববেন না মা! নারাণাপ্পার সব দায়দায়িত্ব আমি নিলাম। বিপথগামী ছেলের কল্যাণ কামনায় সব মা-ই এমন করে থাকেন। কিন্তু ভরসা পান কজন? প্রাণেশাচার্য সেই সান্ত্বনা—সেই ভরসাটুকুই দিতে পেরেছিলেন বৃদ্ধাকে। নারাণাপ্পার ওপর সহানুভূতির এটাই কারণ। কিন্তু প্রাণেশাচার্য তাঁর কথা রাখতে পারেন নি। তার চিত্তশুদ্ধির অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কোনো উপদেশই নারাণাপ্পা শোনে নি। শুধু তাই নয়। বিদ্বেষ-বশত তাঁর দুটি ছাত্রকেও পথভ্রষ্ট করেছে সে। গরুড়ের একটিমাত্র ছেলে শ্যাম। তারই প্ররোচনায় ছেলেটা পালিয়ে গিয়ে মিলিটারিতে ঢুকেছে। নষ্ট করেছে শ্রীপতিকেও। লক্ষ্মণের জামাই। বেলেল্লা হয়ে কোথায় কোথায় যেন ঘুরে বেড়ায় এখন। নানা অভিযোগ শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে-ছিলেন প্রাণেশাচার্য। তারপর নিরুপায় হয়েই তিনি একদিন গিয়ে দাঁড়ালেন নারাণাপ্পার সামনে।

নরম গদির ওপর আধশোয়া অবস্থায় আরাম করে চোখ বুজে বসেছিল নারাণাপ্পা। তাঁকে দেখে ভদ্রতা করে ওঠবার একটা ভঙ্গি করলো মাত্র। উঠলো না। তারপর অবজ্ঞা করে বলে উঠলো — কি! পুঁথি আর আচার-বিচার দিয়ে আর বুঝি সমাজ শাসন চলছে না আপনার? পতিতরা সব দাঁড়িয়ে উঠেছে। কংগ্রেস থেকে শীগ্‌গিরই মন্দির খুলে দেবে ওদের জন্যে।

কেমন যেন আবোল-তাবোল বকতে লাগলো নারাণাপ্পা।

আচার্য থমকালেন না। বেশ ব্যক্তিত্ব নিয়েই বললেন।

—শ্রীপতিটাকে কেন নষ্ট করছো, নারাণাপ্পা! এতে তোমার ভালো হবে না। ঘরে ওর বউ আছে।

—বউ! হা হা করে হেসে উঠলো নারাণাপ্পা। বললো।

—আচার্য! বিয়ে করে শরীরের সুখ পেল না অথচ দিব্যি ঘর-সংসার করছে এমন পুরুষের সংখ্যা পৃথিবীতে খুবই কম। অবশ্য আপনাদের মতন কয়েকটি আত্মনিগ্রহী ব্রাহ্মণের কথা বাদ দিয়েই বলছি।

শেষ কথাটা বললো যেন মনে হলো চাপা গর্জন করে উঠলো সে।

— জোর করে আমার ওপর আপনাদের বিধান চাপানোর কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না, আচার্য। ওই ফিটের ব্যামোওলা মেয়েমানুষটাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে আপনারা ধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। অমন ধর্ম আপনাদেরই থাক। আমি একটাই জীবন মানি। যেটা চলছে। সুতরাং চরম ভোগ সুখ করে কাটিয়ে যেতে চাই জীবনটা। আমার ধর্ম হলো ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

আচার্য বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

— তোমার জীবন নিয়ে যা খুশি করো না কেন! কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু ছেলেগুলোকে নষ্ট করছো কেন?

—নষ্ট ওরা নয়। নষ্ট আপনারা। এখানকার এই ব্রাহ্মণসমাজ। গরুড়ের কথাই ধরুন। বলুন, বিধবার সম্পত্তি ও হাতিয়েছে কিনা। তবুও নাকি ওটা বামুন। যেহেতু ওর বৃত্তি হলো বামুনের। লাথি মারি অমন বামনাই-গিরির মাথায়। তার চেয়ে বরং মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করবো—সেও ভালো। তবু ওসব বামনাই গোঁড়ামি আমি মানতে পারবো না। যাক, আমায় আর

উত্তেজিত করবেন না। হয়ত আপনার সম্মান রেখে কথা বলতে পারবে না। আপনি বরং এখন যান। মোটকথা আপনাদের সঙ্গে আমার বনবে না। যদ্দিন বাঁচবো ওই ভণ্ডামির সঙ্গে লড়ে যাব। দেখা যাক কে জেতে—আমি না আপনারা।

আচার্যের মনে হলো কেন লোকটাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন? কেন সকলের কথা মতন ওকে জাতিচ্যুত করেন নি? ভয় না করুণা? নাকি ভেবেছিলেন শেষ পর্যন্ত তাঁরই জিত হবে? যাই হোক, বেঁচে থেকে লোকটা যে শত্রুতা করেছে মরে গিয়েও সেই শত্রুতাই করে চলেছে। তাঁর ব্রাহ্মণত্বের সামনে যেন এক প্রকাণ্ড পরীক্ষা এখন।

প্রায় মাসতিনেক আগের কথা। নারাণাপ্পার সঙ্গে সেটাই তাঁর শেষ দেখা। দিনটা ছিল শুক্লা চতুর্দশী। গরুড় এসে অভিযোগ করলো যে নারাণাপ্পা তার মুসলমান ইয়ারবন্ধু নিয়ে গণপতি ঠাকুরের পুকুর থেকে মাছ ধরে নিয়ে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ। গণপতি পুকুরে মাছ ধরা নিষিদ্ধ। অলিখিত হলেও সবাই মানে সে নিষেধ। শুধু মানা নয়, সাধরণ মানুষ ভয় ভক্তিতে প্রচলিত সংস্কার মতে বিশ্বাস করে যে বা যারা এ কাজ করে তারা রক্ত-বমি করতে করতে মরে। এতদিন বিশ্বাস বা সংস্কার অটুট ছিল। মাছগুলো তাই নির্ভাবনায় চালকলা খেয়ে খেয়ে মানুষ-প্রমাণ বড় হয়েছে। কেউ তাদের ভোগের উপকরণ করে নি। কিন্তু এতদিনের এই বিশ্বাস ভেঙে দিলো নারাণাপ্পা। নিজে ব্রাহ্মণ হলেও শাসন আর নিয়মের দরজা ভেঙে তাকে সকলের জন্যে অবারিত করে দিলো। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলো। ভয় হোক ভক্তিতে হোক সাধারণ মানুষকে সৎপথে রাখার চেষ্টার জন্যে সমাজে এই বর্ণাশ্রম প্রথা চালু। উচ্চনীচের ব্যবধানটুকু না রাখতে পারলে সমাজকে কলুষমুক্ত রাখা যায় না। নারাণাপ্পার আচরণে সেই ভয় ভক্তির খোলসটা ছিঁড়ে গেছে। আর এই ভাঙার কাজে তার প্রেরণাটা যেহেতু প্রত্যক্ষ সেইহেতু সমাজের হাতে শাস্তি তাকে পেতেই হবে! এই কথাটাই তাকে জানাতে গিয়েছিলেন প্রাণেশাচার্য।

বারান্দাতেই দেখা হলো নারাণাপ্পার সঙ্গে। রক্তাক্ত চোখ। এলোমেলো চুল। সম্ভবত নারাণাপ্পা সেদিন মদ খেয়ে অপ্রকৃতিস্থ ছিল। তবুও প্রাণেশা-

চার্যকে দেখে নারাণাপ্পা মুখে কাপড় চাপা দিলো। মনে মনে খুশি হলেন প্রাণেশাচার্য। এই যে সামান্য সম্ভ্রমটুকু সে দেখালো তাতেই অনেকটা তিনি আশান্বিত। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হতো নারাণাপ্পার প্রকৃতি কিছুটা বা জটিল। সহজে তাকে বোঝা যায় না। কিন্তু সেদিন তার ব্যবহার দেখে মনে হয়েছিল তার সেই উত্তুঙ্গ দম্ভের খুঁটিতে বুঝি বা ফাটল ধরেছে। আর এই চিড় খাওয়ানোর কাজটুকু করেছে তাঁর ধর্মাচারী সাধু স্বভাব।

তিনি জানতেন বাক্য অসার। উপদেশের কথাগুলো যেন শূন্যকুম্ভ। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর চরিত্রের সাধুতা পুণ্যবাহী গঙ্গার মতো কুলুকুলু ধারায় নারাণাপ্পার অন্তরলোক উচ্ছ্বসিত না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করতে পারবে না। তবুও প্রাণেশাচার্যর মনে একটা প্রবল অভীপ্সা জাগলো। অভীপ্সা কেন—লোভও বলা যায়। মনে ভাবলেন একটা পুণ্যপ্রাণ ঈগল পাখির মতন ঝাঁপিয়ে পড়েন নারাণাপ্পার ওপর। প্রবলভাবে নাড়া দেন। তারপর নিষ্ঠুরের মতন নখরাঘাতে তার আবরণটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেন। তখন গলগল করে নিঃসৃত হোক হৃদয়ের অমৃতধারা। নারাণাপ্পার চোখের দিকে নিষ্ঠুরের মতন তাকিয়ে থাকলেন প্রাণেশাচার্য। সে দৃষ্টি এত মর্মভেদী যে কোনো সাধারণ পাপাচারী মাত্রেই মনে মনে কেঁপে উঠবে। তারপর লুটিয়ে পড়বে তাঁর পায়ে। তখন অনুতপ্ত দু'ফোঁটা চোখেব জল। ব্যস! আর কিছু তাঁর কাম্য নয়। ভ্রাতৃপ্রেমে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবেন তাকে।

মাথা নিচু করেই বসেছিল নারাণাপ্পা। তাকে দেখে মনে হলো সেই ঈগলটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। তারপর নিষ্ঠুরের মতন নখাগ্রে চেপে ধরেছে তার শিকার। ঠিক তখনই একটা বন্ধ দরজা খুলে যাবার শব্দ হলো। খুট! সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হলো নারাণাপ্পা। একটানে মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিলো। তারপর পিশাচসিদ্ধ শয়তানের মতন হা-হা করে হেসে উঠলো।

—চন্দ্রী! বোতলটা নিয়ে এস তো! আচার্যকে একটু পবিত্র জল খাওয়াই!

—চুপ কর্ নরাধম! চিৎকার করে উঠলেন আচার্য।

সারা শরীর কাঁপানো একটা প্রচণ্ড রাগ ফুটে উঠলো তাঁর চিৎকারে। এত-

খানি রাগের যে অভিব্যক্তি তার মানে একটাই। প্রাণেশাচার্য দুঃখিত হলেন। তাঁর পবিত্র প্রভাব থেকে লোকটা যেন পিছলে সরে গেল। আরোহণের পথে সিঁড়ির একটা ধাপ যেন হারিয়ে গেছে তার।

—আহ্! আচার্যের শরীরেও তাহলে রাগ আছে! আমি তো জানতুম রাগ, লোভ ইত্যাদি রিপুগুলো আমাদের মতন নিকৃষ্ট মানুষেরই জন্মসম্পদ। তবে কি জানেন, লালসাকে দমিয়ে রাখতে হলে রাগকে খানিকটা প্রশ্রয় দিতে হয়। আমাদের প্রাচীন মুনিঋষিরা যেমন দুর্বাসা, পরাশর, ভৃগু, বৃহস্পতি, কাশ্যপ এঁরা সবাই রাগী মানুষ ছিলেন।···কি হলো চন্দ্রী? বোতলটা দিয়ে গেলে না? শুনুন আচার্য! যাদের কথা বললুম এরা কিন্তু কামুকও ছিলেন। আর আপনারা তো সেই ধারাই অনুসরণ করে চলেছেন, তাই না? আচ্ছা! সেই লোকটার কি নাম যেন? নৌকোর ওপরেই যে মৎসগন্ধা নারীকে ধর্ষণ করেছিল? আপনারাই বংশধর ওই সব মুনিঋষিদের। আর যুগযুগ ধরে সেই ধারাই অনুসরণ করে চলেছেন। আর আজ আপনাদের কি দুরবস্থা!

—তোমার বাচালতা থামাও নারাণাপ্পা।

ধীরে ধীরে বলবার চেষ্টা করলেন আচার্য।

নারাণাপ্পা ততক্ষণে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। বোতল না আনায় চন্দ্রীর ওপর সে ক্ষিপ্ত। একরকম দৌড়েই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল সে। চন্দ্রী বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। তাকে সরিয়ে বোতলটা নাবিয়ে এনে খানিকটা মদ নিজের কাপে ঢাললো। ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রাণেশাচার্য। নারাণাপ্পা বাধা দিলো।

—একটু দাঁড়ান আচার্য। চোখ বুজে নিষ্প্রাণ হয়ে দাঁড়ালেন আচার্য। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। মদের গন্ধে গা গুলোচ্ছিল। তবুও দাঁড়ালেন। কেন না, নারাণাপ্পা ভাবতে পারে ভয় পেয়েছেন তিনি।

মদের গেলাসে এক চুমুক দিয়ে হা হা করে দুষ্টুহাসি হেসে উঠলো নারাণাপ্পা।

—শুনুন আচার্য! বামুনদের গর্ব ভাঙবো বলে আমি লড়াইয়ে নেবেছি। শেষ পর্যন্ত লড়বো। দেখবো কে জেতে। আমি না আপনি। অবশ্য দুঃখু আমার একটাই। আপনি ছাড়া এখানে আর কেউ ব্রাহ্মণ নেই। বামুন আমিও

নই। যদি হতুম তাহলে আপনাদের গরুড় হয়ত মন্ত্রপড়া গণ্ডুষের জল ছিটিয়ে আমার ভাসিয়ে দিত। আর লক্ষ্মণ! সেটা তো একটা পয়সার চামার। নর্দমার পাঁক লাগা পয়সাও জিভ দিয়ে চেটে থলিতে পুরতে তার ঘেন্না পিত্তি নেই। আমি বামুন থাকলে সে ঠিক আমার গলায় আর একটা শালী ঝুলিয়ে দিত। কেন জানেন? সম্পত্তির লোভে। তখন হয়ত মাথা মুড়িয়ে মুখে কালিঝুলি মেখে আপনার সামনে হাত জোড় করে বসে থাকতুম। আর ভক্তিভক্তি মুখে আপনার উপদেশ গিলতে হতো বসে বসে।

গেলাসে আর একটা চুমুক দিলো নারাণাপ্পা। একটা ঢেকুর তুললো। এক-পাশে নিষ্প্রাণ পাষাণ প্রতিমার মতন এসে দাঁড়িয়েছে চন্দ্রী। প্রাণেশাচার্যের সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে তাঁকে হাত জোড় করে চলে যেতে ইঙ্গিত করল। প্রাণেশাচার্যও সেই কথাই ভাবছিলেন। এই অপ্রকৃতিস্থ মাতালটার প্রলাপ শুনে কি লাভ? ফেরবার উপক্রম করতেই নারাণাপ্পা বাধা দিলো তাঁকে।

—আর একটু দাঁড়ান আচার্য। আপনার এত অহঙ্কার কিসের বলতে পারেন। আপনি কি চান অগ্রহারের সবাই আপনার কথা শুনবে, কিন্তু আপনি কারো কথা শুনবেন না? আমার কথা শুনতে হবে আপনাকে। একটা গল্প বলছি, শুনুন।

—অনেকদিন আগের কথা। এই অগ্রহারে একজন আচার্য বাস করতেন। যেমন ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য তেমনি প্রতিভা। তাঁর পাণ্ডিত্য আর প্রতিভার যশ ছড়িয়ে পড়েছিল দিক্‌বিদিকে। তিনি শাস্ত্র পড়তেন, ব্যাখ্যা করতেন, উপদেশ দিতেন---কিন্তু সহজ স্বাভাবিক জৈবিক জীবন ধারণের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। নারীদেহ সম্ভোগের স্বাদ তিনি কখনও পান নি। কারণ তাঁর স্ত্রী ছিলেন চিররুগ্না। অগ্রহারে আর যে সব ব্রাহ্মণ থাকতো তাদের কিন্তু পাপের অন্ত ছিল না। যেমন লোভী, তেমনি পেটুক আর সোনাদানা টাকা-পয়সার ওপর আসক্তি। কিন্তু তাদের পাপ আচার্যর যশের আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছিল। তাই পাপাচারীদের কোনো কুণ্ঠা ছিল না। যশ আর পাপের পাল্লা দু'দিকেই সমান সমান হয়ে গিয়েছিল। একদিন একটা বড় মজার ঘটনা ঘটলো।

—আচার্য কি শুনছেন না? শুনুন, মন দিয়ে শুনুন। ভারি সুন্দর একটা

নীতিশিক্ষা আছে গল্পের শেষে। কি জানেন! সব কাজেরই ফল যে প্রত্যাশা মতো হবে তা নয়। বরং এর উল্টোটাই ঘটে। গল্পের নীতি সেইটুকুই।

—শুনে যান। অন্য ব্রাহ্মণদের বলতে পারবেন।

নারাণাপ্পা আবার তার গল্পে মন দিলো।

—মজার ব্যাপার ঘটলো একজন অনাচারী যুবককে নিয়ে। সে পাপ-পুণ্য কিছুই মানতো না। বিয়ে করা বউ নিয়ে সে একরাত্তিরও শুতে পায় নি। কারণ বউ তার মায়ের এত বাধ্য ছিল যে আজ্ঞা ছাড়া স্বামীর সঙ্গে শোবার অধিকার তার ছিল না। কিন্তু যুবকটি আচার্যকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। প্রতি সন্ধ্যায় আসরে বসে তাঁর কথকতা শুনতে ভালবাসতো। ভালবাসতো সেই সব আদিরসাত্মক কাব্য শুনতে, যাতে দেহজ প্রেমের স্বাদ আছে। আর জীবনরসে অনভিজ্ঞ হলেও আচার্য এইসব কাব্যকাহিনী পড়াতেন খুব মন দিয়ে।

…একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। সেদিন আচার্য কালিদাসের শকুন্তলা থেকে আবৃত্তি করছেন। শকুন্তলার বর্ণনা মন দিয়ে শুনতে শুনতে যুবকটির মনে যেন দোলা লাগলো। ঠিক দোলা নয়। বরঞ্চ বলা যেতে পারে এক পূর্ণাবয়ব রমণী মূর্তি সে অনুভব করলো নিজের অস্তিত্বের মধ্যে। আগুন ধরে গেল তার রক্তে। দেহসুখ কাকে বলে সে জানতো না। সম্ভোগের সম্ভাবনাও ছিল না। নির্বোধ বউ তার মা-র কাছে অভিযোগ করেছিল স্বামী নামক লোকটা নাকি রোজ রাতে তাকে জ্বালাতন করতে আসে। কিন্তু আচার্যর বর্ণনা শুনতে শুনতে তার রক্তে আগুন জ্বলে উঠলো। ক্রমে সে জ্বালা এত তীব্র হলো যে সে বসে থাকতে পারল না। বারান্দা থেকে লাফিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে গেল। শরীরের জ্বালা জুড়োতে সে নদীর ঠাণ্ডা জলে ডুব দিতে গেল। ভাগ্যক্রমে এক অচ্ছুৎ যুবতী সেই চাঁদনি রাতে নদীতে স্নান করছিল। যুবতীটি প্রায় নিরাবরণ। নারীদেহের সব আকর্ষণ ছিল মেয়েটির। তাই অচ্ছুৎ রমণীটির মধ্যে সে যেন শকুন্তলার রূপানুষঙ্গ অনুভব করলো। মনে পড়ে গেল পুরাণে শোনা সেই ঋষির কথা! যিনি কোনো মৎসগন্ধার রূপে মজে তার কাছে প্রেম নিবেদন করতে দ্বিধা করেন নি। ব্রাহ্মণ যুবকটিও দ্বিধা করলো না। আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ। সেই চাঁদনি রাতে যুবকটির

মনে কোনো ধন্দ রইলো না। সে নিঃসঙ্কোচে আকাশের চাঁদকে সাক্ষী রেখে সেই অচ্ছুৎ যুবতীটির কাছে প্রেম নিবেদন করলো।

নারাণাপ্পা চুপ করলো। তারপর ধীরে ধীরে আবার শুরু করলো বলতে।

—আচার্য! বলতে পারেন কী এর ব্যাখ্যা? সেখানকার ধর্ম কলুষিত করতে সেই আচার্যই কি দায়ী নয়? আমাদের সমাজের অগ্রগণ্য যাঁরা তাঁরা বিধান দিয়েছেন বেদ পড়, পুরাণ পড়। কিন্তু খবরদার শাস্ত্রের যথার্থ নির্দেশ খুঁজতে যেও না। তাই না আচার্য? আপনি অনেক শাস্ত্র পড়েছেন, কাশী গিয়ে বেদজ্ঞ হয়েছেন—আপনিই বলতে পারবেন, কাদের হাতে পড়ে আমাদের ধর্ম এত দূষিত!

চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন প্রাণেশাচার্য। শুনতে শুনতে মনে হলো এতো মাতালের প্রলাপ নয়! তাহলে কি তিনিই দায়ী?

স্থির চোখে চেয়েছিল নারাণাপ্পা। সে দিকে তাকিয়ে প্রাণেশাচার্য দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। পাপ কথা বলতে জিভ তোমার লকলক করছে। কোনো ভালো সৎ কথা বেরোবে না মুখ দিয়ে।

—কারণ মনে মুখে আমি এক। আপনি পুরাণ থেকে রসালো কাহিনী শোনান কিন্তু শিক্ষা দেন কৃচ্ছ্রসাধনের। আমি কিন্তু যা বলি তা করি। যদি মেয়েছেলে ভোগের বাসনা থাকে তাহলে সে বাসনা চেপে রাখি না। মাছ খেতে ইচ্ছে হলে মাছ খাই। একটা ছোট্ট উপদেশ দিচ্ছি। শুনুন। পুরাণের মুনি ঋষিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন আপনারা। রুগ্ন বউদের ছাড়ুন। ফেলে দিন নদীর জলে। কোনো মৎসগন্ধার সঙ্গে সহবাস করুন। তার হাতের রান্না মাছ খান। দেখবেন পরদিন যদি আপনার ঈশ্বরানুভূতি না হয় আমার নাম নারাণাপ্পা নয়।

কথা শেষে চোখ টিপলো নারাণাপ্পা। তারপর ঢকঢক করে গেলাসের বাকি মদটুকু গিলে একটা লম্বা ঢেকুর তুললো।

প্রাণেশাচার্যর শরীরটা ঝাঁকিয়ে উঠলো রাগে। রাগ হবারই কথা। স্ত্রী সম্পর্কে অমন অর্থবহ একটা ইঙ্গিত শুনলে কার না রাগ হয়! চিৎকার করে উঠলেন তিনি।—শুধু দুর্বৃত্ত ন'স- তুই একটা ইতর!

কিন্তু বাড়ি এসেও সুস্থির হতে পারছিলেন না তিনি। রাতে পুজোয় বসেও মনের ঝড় কমলো না। অনেক দুঃখে মুখ দিয়ে বেরোল—ওঃ! ভগবান! পরদিন থেকে সান্ধ্য আসরে আদিরসাশ্রিত পুরাণ কাহিনী শোনানো বন্ধ করে দিলেন। শোনাতে লাগলেন নিছক শুকনো উপদেশ। ক্রমে ক্রমে তাঁর নিজেরও উৎসাহ কমে আসতে লাগলো। আসরে যুবকদের ভিড় পাতলা হয়ে এলো। থাকতো কেবল মেয়েরা আর বুড়োর দল। যারা ভাবতো স্রেফ নাম গান শুনেই ভবতরী পেরিয়ে যেতে পারবে। উপদেশ শুনতে শুনতে তাদের হাই উঠতো।

এতক্ষণ পুঁথির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নিমগ্নচিত্ত হয়ে এই সবই ভাবছিলেন প্রাণেশাচার্য। হঠাৎ একটা গোঙানির আওয়াজ কানে যেতেই চকিত হলেন। মনে মনে লজ্জিত হলেন। ইস! বিকেলের ওষুধ এখনও দেওয়া হয় নি স্ত্রীকে! তাড়াতাড়ি উঠে একটা ছোট কাপে ওষুধটা ঢেলে স্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। রুগ্না স্ত্রীর মাথাটা বুকের কাছে চেপে খুব যত্ন করে তার মুখে ওষুধ ঢেলে দিলেন। তারপর ধীর স্বরে বললেন—লক্ষ্মীটি ঘুমিয়ে পড় এবার!

স্ত্রীকে শুইয়ে ঘরের মধ্যিখানে এসে দাঁড়ালেন প্রাণেশাচার্য। হঠাৎ যেন নিজের ওপর ধিক্কার জাগল তাঁর। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠলেন—কে বলেছে এ-সংকটের উত্তর শাস্ত্রে নেই? নিশ্চয়ই আছে। পুঁথির পাতার মধ্যে আবার ডুবে গেলেন প্রাণেশাচার্য।

৪

ব্রাহ্মণরা হরিধ্বনি দিতে দিতে ফিরে এলো পারিজাতপুর থেকে। সারাটা দিন অভুক্ত কেটেছে। তার ওপর পথশ্রম আর গরমের ক্লান্তি। শরীর একটু বিশ্রাম চাইছিল। কিন্তু গরুড় আর লক্ষ্মণের স্ত্রীরা স্বামীদের সেই সুখটুকু পেতে দিলো না।

গরুড়ের ছেলে শ্যাম বংশের একমাত্র সন্তান। উত্তরাধিকারী। সে আর লক্ষ্মণের জামাই শ্রীপতি যখন দেশ ছেড়ে পালালো তখন অগ্রহারীর আপাত নিস্তরঙ্গ জাবন ধারায় একটা ঢেউ ওঠে। অনেক জল্পনা অনেক আলোচনা হয় পলাতকদের নিয়ে। গরুড়ের যারা পরম শত্রু তারা বলেছিল ছেলেটা নাকি বাপের শাসন আর সইতে পারছিল না। তাই সরে পড়েছে। আবার নারাণাপ্পাকে যারা দেখতে পারতো না তারা বলতো নারাণাপ্পাই ওর কাঁচা মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে। ফুসলে বাপের আওতা থেকে বার করে মিলিটারিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। লক্ষ্মণের ধারণা অবশ্য অন্যরকম। তান্ত্রিকদের সঙ্গে ষড় ছিল গরুড়ের। নারাণাপ্পার বাপের ওপর অনেক তুকতাক করিয়েছে সে। যাতে তার সর্বনাশ হয়। এখন সেই সব তুকতাক ঘুরে এসে লেগেছে নিজের গায়ে। পরের অনিষ্ট করতে গিয়ে নিজেরই অনিষ্ট করে ফেলেছে। নইলে প্রাণেশাচার্যর হাতে গড়া ছেলেটা হঠাৎ বিগড়েই বা যাবে কেন? আরও তো দশটা ছেলে আছে—তারা তো ঠিক আছে! লক্ষ্মণের বউ অনসূয়াও সেই রকম ভাবতো। গরুড় লোকটা মোটেই ভালো নয়। তার বাপের বাড়ির ক্ষতি করেছে সে। না হলে অমন একটা সৎ-বংশের ছেলে হয়ে নারাণাপ্পা কুলে কালি দিয়ে নষ্ট চরিত্র হবে কেন? নারাণাপ্পার পতিত হবার মূলে আছে গরুড়ের তন্ত্রক্রিয়া।

ছেলের শোকে গরুড়ের স্ত্রী সীতা দেবীর নাওয়া-খাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে জানতো যে দুরাচারী নারাণাপ্পার জন্যেই ছেলেটা অমন বয়ে গেছে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটত নিষ্ঠুর অপেক্ষায়। এই বুঝি আসে—এই বুঝি আসে। অবশেষে একটা ছোট্ট চিঠি এলো একদিন। শ্যামেরই চিঠি। লিখেছে, সে মিলিটারিতে ঢুকেছে। উপস্থিত পুণায় আছে। চুক্তিনামায় সই করে ঢুকতে হয়েছে তাকে। সুতরাং ইচ্ছে করলেই ফিরে আসতে সে পারবে না। তার জন্যে গুণে গুণে দু'শোটি টাকা খেসারত দিতে হবে। চিঠি পেয়ে সীতাদেবী নারাণাপ্পাকে পাকড়াও করলো একদিন। তারপর কোমরের দু'দিকে হাত দিয়ে খুব খানিক ঝগড়া করলো। কাঁদলো। কিন্তু মন স্থির হলো না তাতেও। তখন কাকে দিয়ে ছেলেকে চিঠি লেখালো —বাবা শ্যাম, মাছ মাংস খেও না। সকাল সন্ধে গায়ত্রী জপ করো। তাতেও

মনের অস্থিরতা যায় নি। প্রতি শুক্রবার রাতে ছেলের কল্যাণে নির্জলা উপোস করতো। যেন ছেলেটার চিত্তশুদ্ধি হয়। ফিরে আসে মায়ের কোলে। এত সব বাড়াবাড়ি কিন্তু গরুড় পছন্দ করতো না। রাগে চিৎকার করতো সে, বলতো—আমি জানি ও মরে গ্যাছে। আমার কাছে তোমার ছেলের কোনো দাবি আর নেই। তবুও যদি কখনও সে ফিরে আসে ওর মাথা ভেঙে দূর করে দেবো। সীতাদেবীর যেন উভয় সঙ্কট। একদিকে চণ্ডাল স্বামী। অন্যদিকে ব'য়ে যাওয়া ছেলে। ঠাকুরের কাছে আকুল হয়ে বলতো—ঠাকুর! স্বামীর মনে যেন শান্তি ফিরে আসে—ছেলেটার ওপর থেকে রাগ প্রতিহিংসা যেন চলে যায়। এর জন্যে আবাব শনিবার রাতেও ওকে উপোস করতে হতো। এর ওপর ছিল দুর্গাভট্ট। ফেউয়ের মতন লেগেছিল সে। যারা অগ্রহারে প্রচার করে বেড়িয়েছিল যে ছেলেটা যখন মিলিটারিতে ঢুকেছে তখন জাত ধর্ম আর কিছু নেই তার। মাছ মাংস তো খাচ্ছেই। সকাল সন্ধে আহ্নিক করা গায়ত্রী জপ করা—এসবও ছেড়েছে। দুর্গাভট্টর এই প্রচারে গরুড়ের মাথা অনেকখানি হেঁট হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন সীতা বাড়ি ফিরলো হৃষ্ট মনে। ক্ষণিক আশার আলো—নারাণাপ্পার শেষ কাজটুকু যদি গরুড় করতে পারে তবে চন্দ্রীর গয়নাগুলো তারই প্রাপ্য হবে। তখন দু'শো টাকা জরিমানা দিয়ে ছেলেটাকে ছাড়িয়ে আনতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু দুশ্চিন্তাও ছিল মনে। লক্ষ্মণের স্ত্রী অনসূয়া কি স্বামীর স্বত্ব ছেড়ে গরুড়াচার্যকে এ-কাজটা করতে দেবে? অথবা পারিজাতপুরের ওই বামুনগুলো! ওদের তো জাতপাঁতের বালাই নেই। ছোঁয়াছুঁয়ি আচার বিচার কিছুই মানে না। হয়ত বা শেষ পর্যন্ত ওরাই ঘাড়ে নেবে কাজটা! নানারকম দুশ্চিন্তায় সীতাদেবী কাতর হয়ে পড়লো। হঠাৎ মনে হলো মারুতিদেবের কাছে ফল, নারকোল দিয়ে মানত চড়ালে কেমন হয়! মনে মনে বললো—ঠাকুর! দেখ, নারাণাপ্পার অন্ত্যেষ্টির কাজটা যেন আমার স্বামী-ই পায়।

ঠিক সেই সময় নারাণাপ্পার ওপর থেকে মনের সব বিরাগ চলে গেল। এমন কি মাংস খাওয়াও কোনো পাপ বলে মনে হলো না। একদিন না একদিন তার ছেলেটা ফিরবেই। তখন অগ্রহারের খল জিভগুলো কি চুপ

করে থাকবে ? তখন যদি ষড় করে ছেলেটাকে ওরা পতিত করে—এক-ঘরে করে ? নারাণাপ্পাকে যখন একঘরে করতে দ্বিধা করছিলেন প্রাণেশাচার্য, তখন তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিল সীতা। এখন তার মনে হলো প্রাণেশাচার্য যথার্থই হৃদয়বান। মানুষটার ওপর শ্রদ্ধা ভক্তি দুই-ই বেড়ে গেল। আচার্য শুধু মহান নন। ধরিত্রীর মতন সর্বংসহা। তার ছেলের সব পাপ আকণ্ঠ গ্রহণ করে নিশ্চয়ই তাকে বাঁচাবেন।

সবে বাড়ি ফিরেছে গরুড়। মাটিতে শুয়ে বিশ্রাম নেবার কথা ভাবছিল। হঠাৎ এসে হাজির সীতা। জলভরা চোখে স্বামীকে বিব্রত করতে লাগল সীতা। গরুড় অটল। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে সে বললো।— ওটা একটা কুলাঙ্গার। ওর নাম আমার কাছে ক'রো না। আমার কাছে ও মরে গেছে।

কিন্তু ব্রাহ্মণীর প্রস্তাবটা তার মনে এঁটুলির মতন সেঁটে থেকে তার মনের ভারসাম্য নষ্ট করে দিলো। জাহান্নমে যাক ছেলে; কিন্তু তাই বলে সে ধর্মভ্রষ্ট হতে পারবে না। অবশ্য প্রাণেশাচার্য যদি মত দেন তাহলে আলাদা কথা। সে ক্ষেত্রে দু'শ টাকা জরিমানা দিয়ে ছেলেটাকে মিলিটারির খপ্পর থেকে রক্ষা করা হয়ত খুব অসম্ভব হবে না। আর যাই হোক—ছেলে তো! তারই উত্তরাধিকার। মরার সময় পিণ্ডদানের অধিকারী। এটুকুই যা সান্ত্বনা। মনে মনে এত কথা ভাবলেও স্ত্রীকে কড়া ধমক দিলো গরুড়। —চুপ কর। যা ভাবছো আমার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়।

কিন্তু মুখে শক্ত হলেও মনের গভীরে ক্ষীণ একটা আশার আলো যেন দেখতে পেল গরুড়। চোরের মতন লুকিয়ে সে প্রাণেশাচার্যর বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো। উঁচু বারান্দার ওপর বসেছিল চন্দ্রী। সে দিকে একবারও তাকালো না গরুড়। সোজা গিয়ে দাঁড়ালো মাঝের বড় ঘরে। তাকে দেখে প্রাণেশাচার্য ধীর স্বরে বললেন।

—এস গরুড়। আমি শুনেছি সব। পারিজাতপুরের ওরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কিছু করতে রাজি নয়। উপযুক্ত কথা।

কথাটা বলে প্রাণেশাচার্য আবার পুঁথি নিয়ে বসলেন।

—আচার্যদেব ! মনুসংহিতায় এ-ব্যাপারে কি আছে ?

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন আচার্য।

—শাস্ত্রে এমন কী থাকতে পারে যা আপনি জানেন না? আমার প্রশ্ন তা নয়। আপনি যে কত বড় পণ্ডিত তা আমি জানি। বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে আপনার তর্ক যুদ্ধ তো দেখেছি! না কি বলুন! আচ্ছা সেদিনের সেই তর্কের কথা মনে আছে আপনার? ব্যাসার্য আশ্রম থেকে তাঁরা এসেছিলেন। সেদিন আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমরা সবাই অভিভূত। মাধ্বী সম্প্রদায়ের মতে—'তুমি-ই মূল, আমরা তোমার প্রতিফলন মাত্র'—এই শাস্ত্র বাক্যের যে ব্যাখ্যা আপনি করেছিলেন, তাকে খণ্ডন করতে ওঁরা পারেন নি সেদিন। সেইজন্যে বলছি আমায় ভুল বুঝবেন না। আপনাকে উপদেশ দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনার উপস্থিতির সামনে আমি একটা জড়ভরত আনাড়ি ছাড়া আর কি!

গরুড়ের চাটুবাদ আর তোষামোদের ধরন দেখে মনে মনে বিরক্ত বোধ করছিলেন আচার্য। শাস্ত্রকারের বিধান জানা ওর উদ্দেশ্য নয়। শুধু গরুড় একা কেন—কারো উদ্দেশ্যই তা নয়। ওরা সবাই চায় তিনি ওদের বলেন —ওহে! তোমরা তাহলে নারাণাপ্পার অন্ত্যেষ্টিটা করে ফেলো! এরা জানে এখানে তাঁর মতামতটাই মুখ্য। তার জন্যে সবাই মিলে তাঁকে আকাশে তুলতেও রাজি। স্বর্ণ লোভ এমনই ভয়ঙ্কর। তিনি উদার হয়ে মত দিলে ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। নারাণাপ্পাও সেই কথা বলতো। সুতরাং তাঁকে শক্ত হতেই হবে। শক্ত এবং দৃঢ়। কোনো প্ররোচনাতেই গলে যাওয়া চলবে না। তন্নতন্ন করে শাস্ত্র বাক্য খুঁজে বার করতে হবে। বিধান জেনে নিয়ে তবে ব্যবস্থা দেবেন।

—দেখুন আচার্য!

প্রাণেশাচার্য তাকালেন।

—আমাদের প্রাচীন মুনিঋষিরা তো ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—সবই বলে দিতে পারতেন। অথচ এই সামান্য একটা সমস্যা—এর কোনো বিধান কি আর দিয়ে যান নি?

প্রাণেশাচার্য উত্তর দিলেন না। যথাসম্ভব পুঁথির পাতার মধ্যেই নিমগ্ন থাকবার চেষ্টা করলেন। গরুড় আবার শুরু করলো।

—আচার্য ! আপনিই একবার বলেছিলেন যে আমাদের দর্শনের নাম বেদান্ত। অর্থাৎ অন্ত বা শেষ ধাপ, চিন্তার। তারপর আর কিছু নেই। যদি তাই হয় তাহলে এই ব্যাপারটার কোনো সমাধান কি তাঁরা লিখে যান নি ? মনে করুন, সমস্যাটা তো নেহাত তুচ্ছও নয়! একজন ব্রাহ্মণের বাসি-মড়ার সৎকার হচ্ছে না। অথচ সবাই আমরা ব্রাহ্মণ—এবং কাজকম্ম, খাওয়া-দাওয়া সবই বন্ধ, যতক্ষণ না মড়ার গতি হচ্ছে।

প্রাণেশাচার্য উত্তর দিলেন না। আর তাঁর মুখ থেকে শুনে শুনে ন্যায়, পুরাণ, বেদান্তর যে সামান্য জ্ঞান হয়েছে তাই থেকে নজির তুলছিল গরুড়। নির্গলিতার্থ হলো স্বর্ণলোভ। হায় রে মানুষ !

—তাছাড়া তখন আপনি যা বললেন, তা-ও ঠিক। সে ধর্ম ত্যাগ করলেও ধর্ম তাকে তো ছাড়ে নি ? আমরা তাকে শাস্ত্রমতে পতিত করি নি। পতিত করলে সে বোধহয় মুসলমান হতো। সেক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে অগ্রহারের বাস তুলে অন্যত্র যেতে হতো।

এইসময় প্রাণেশাচার্য পুঁথির পাতা থেকে চোখ তুলে বললেন।—গরুড় ! আমি ঠিক করেছি শাস্ত্রে যতটুকু এবং যেভাবে বিধান দিয়েছে ঠিক সেই-ভাবেই চলবো।

কথা শেষ করে আবার পুঁথির পাতায় নিমগ্ন হলেন প্রাণেশাচার্য। সমস্ত ব্যাপারটার এখানেই নিষ্পত্তি করে দিতে চাইলেন তিনি।—মনে করুন, শাস্ত্রে কোনো বিধান যদি না থাকে ! ধরুন, কিছু পেলাম না আমরা। তাহলেও কি শাস্ত্রমতে চলবো ? আচার্য, আপনি একবার বলেছিলেন সব মন্ত্রতন্ত্রের ওপরে হলো মানুষের ধর্ম। জীবনধারণ নির্ভর করে সেই ধর্মের ওপর। দরকার পড়লে গো-মাংস খেয়েও যদি কেউ জীবনধারণ করে তাতে ধর্মচ্যুত হয় না। আপনিই বলেছিলেন একবার মহামড়কের সময় মুনি বিশ্বামিত্র অসহ্য ক্ষুধা মেটাতে কুকুরের মাংস খেয়েছিলেন। তাতে কোনো পাপ হয় না। কারণ জীবনধারণ হলো মানুষের প্রধান ধর্ম।

—আমি সব জানি গরুড়। এখন তুমি কি চাও বলো।

বলতে বলতে পুঁথি মুড়ে বসলেন প্রাণেশাচার্য। গলার স্বর ক্লান্ত, বিরক্ত। একটু যেন লাঞ্ছিত হলো গরুড়। চোখ নামিয়ে বললো।

—কিছুই না আচার্যদেব। তেমন কিছু না।

হঠাৎ প্রাণেশাচার্যর পায়ের ওপর সাষ্টাঙ্গে পড়ে গেল গরুড়। তারপর ভক্তি-ভরে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো।

—ঠাকুর! আমি না দেখলে কে দেখবে আমার শ্যামকে? কে-ই বা তাকে ছাড়িয়ে আনবে মিলিটারি থেকে? ইতিমধ্যে আমার যদি ভালো মন্দ একটা কিছু হয়ে যায়—কে করবে শেষ কাজ? তাই বলছিলুম, যদি নারাণাপ্পার সৎকারের কাজটা আমায় করতে দেন—

কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারলো না গরুড়। লক্ষ্মণকে আসতে দেখে মাঝ-পথে থেমে গেল। ঘরে ঢুকে লক্ষ্মণ তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

সেদিন অনসূয়াও কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরেছিল। কান্না তো পাবেই। বোনটা মরেছে ওই বেশ্যা চন্দ্রীর জন্যেই। তারপর বোনের সব গয়না এখন ওই মাগীটার খপ্পরে। তবে শুধু গয়না নয়। নারাণাপ্পার জন্যেও কান্না পাচ্ছিল তার। পর তো নয় মানুষটা! একদিকে ভগ্নিপতি। আর এক-দিকে মামাতো ভাই। আজ মামাও যদি বেঁচে থাকতেন—কিংবা বেঁচে থাকতো বোনটা—অথবা গরুড় যদি তুকতাক করে নারাণাপ্পার মন থেকে বোনটাকে সরিয়ে না দিত—তাহলে গয়নাগুলো এমন হাত ছাড়া হয়ে যেত না। মানুষটাও অমন বেঘোরে মরতো না। বাসিমড়া পচে ফুলে উঠতো না। ভাবতে ভাবতে সে প্রায় চিৎকার করে কেঁদে উঠলো দেওয়ালে হেলান দিয়ে। —ঠাকুর! এ কি হলো? নারাণাপ্পা যা-ই করুক—তার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক! প্রায় তখনই লীলাবতীর ওপর নজর পড়লো। তার মেয়ে। বেঁটে, গোল, থপথপে। নাকে নাকছাবি। সিঁথিতে লম্বা সিঁদুর। খাটো চুল, পেছন দিকে টান টান করে বাঁধা। মেয়েকে দেখেই মুখখানা শক্ত হয়ে উঠল অনসূয়ার। তারপর প্রায় বার দশেক যে প্রশ্ন করেছে সেই প্রশ্নই আবার করলো।

—শ্রীপতি কবে ফিরবে? বলে গ্যাছে কিছু?

—আমি জানি না।

নিজের কাছে রাখতে পারবে বলে লীলাবতীকে বাপ মা মরা বাউণ্ডুলে

শ্রীপতির সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কে জানতো ছোঁড়াটা শেষ অব্দি তারই আত্মীয় নারাণাপ্পার খপ্পরে পড়ে বয়ে যাবে! দুনিয়ার যত অপকর্ম তার পুরোপুরি জ্ঞান ছোঁড়াটার মাথায় চালান করেছে নারাণাপ্পা। ফলে ছোঁড়াটা মাসান্তে দু'দিনও বাড়িতে থাকে না। এ শহর ও শহর ঘুরে বেড়ায় যাত্রাদলের সঙ্গে। আড্ডা মারে পারিজাতপুরের ছোঁড়াদের সঙ্গে। শোনা যায় নাকি মেয়েমানুষও রেখেছে। দুর্গাভট্টর ব্রাহ্মণীই চালান করেছে এ খবর। তবে ছোঁড়াটার পরিণতি যে এইরকম কিছু একটা হবে তা আগেই অনুমান করা গিয়েছিল। চোরের মতন নারাণাপ্পার বাড়িতে ঢুকতে বা বেরোতে তাকে যেদিন দেখেছিল সেদিনই। নারাণাপ্পার বাড়িতে নিষিদ্ধ খাবার আর পানীয়র লোভ তো ছিলই। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ চন্দ্রী। ও বেশ্যা মাগীর খপ্পরে যে পড়েছে তার আর নিস্তার নেই। তাই অনসূয়া মেয়েকে বুদ্ধি দিয়েছিল।

—শোন্! চাইলেই নিজেকে ছোঁড়াটার কাছে খুলে দিস না।

—উরু মুড়ে আলাদা শুবি। এমনি করে।

অনসূয়া মেয়েকে দেখিয়ে দিয়েছিল উরু মুড়ে শোবার ভঙ্গিমা।

—ছোঁড়াটাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

যেমন বলেছে মা তেমনিভাবেই চলেছে লীলাবতী। রাত্তিরে শুতে এসে শ্রীপতি যখন তাকে জড়িয়ে ধরতে গেছে তখন ঠোনা মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে লীলাবতী মার কাছে নালিশ করতে গেছে। তারপর রাতটুকু মা-র পাশে শুয়েই কাটিয়েছে।

শ্রীপতির কিন্তু কোনো শিক্ষাই হয় নি। তাদের মধ্যে, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের দূরত্ব বেড়েছে। আগের চেয়ে আরও বেপরোয়া হয়েছে শ্রীপতি। নারাণাপ্পার মতন সে আজকাল চুল ছাঁটছে। পয়সা জমিয়ে একটা বড় টর্চ কিনেছে। সারা সন্ধে শিস দিতে দিতে সে সারা অগ্রহার ঘুরে বেড়ায়। কাউকে বড় একটা পরোয়া করে না।

লক্ষ্মণাচার্য বাড়ি ফিরলো প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে। সারা দিনের উপোস—তায় পথ চলার ক্লান্তি। শরীরটা এমনিতেই বেশ খারাপ। প্রায়ই জ্বর হচ্ছে

ইদানিং। কোটরে বসে গেছে চোখ দুটো। বাড়ি ফিরে গড়িয়ে পড়লো সে। বেশ রোগা দেখাচ্ছে তাকে। কিন্তু বিছানায় শুয়ে আরাম করার কপাল তার নয়। তাকে দেখেই অনসূয়া এগিয়ে এলো। তারপর ঘ্যানঘ্যান শুরু করলো।—নারাণাপ্পা যত নচ্ছারই হোক সে আমারই মামাতো ভাই,. না কি ? যে কেউ তার মড়া নিয়ে যা-তা করবে এ আমি সইবো না বলে দিচ্ছি। প্রাণেশাচার্য ভালো মানুষ। কিন্তু গরুড় যেমন ফিচেল তেমনি শয়তান। অগ্রহারের সব কিছু সে হজম করে নিতে পারে। সে ক্ষ্যামতা ওর আছে। তোমার মতন মেনিমুখো নয় ও। ভালো মানুষ প্রাণেশাচার্যকে ভুলিয়ে ভালিয়ে যদি নারাণাপ্পার সৎকারের কাজটা হাতাতে পারে তাহলে সব গয়নাগুলোই পড়বে গিয়ে ওই দেমাকে মাগীর খপ্পরে। সীতার দেমাক দু'চোখের বিষ। অবিশ্যি ভগবান ওকে খানিকটা শিক্ষা দিয়েছেন। নারাণাপ্পার যত বদনামই দিক, শ্যাম ছোঁড়া কি ? মিলিটারিতে ঢুকে জাত-পাঁত ধম্মকম্ম কোনটা মানছে ? সব জলাঞ্জলি দিয়েছে। মরুক গে -- তার ছেলে, যা ভালো বুঝছে করছে। এখন তুমি ওঠো তো ? দেখলুম গরুড় যাচ্ছে আচার্যদেবের বাড়ি। ওঠো। তুমিও যাও। একলা যেন ও বেশিক্ষণ আচার্যির কাছে বসে না থাকে। থাকলে ঠিক ভুজুংভাজং দিয়ে কাজ হাঁসিল করে নেবে।

অনসূয়া নিঃসন্দেহ হবার জন্যে বেরোল। নিঃশব্দে গরুড়ের বাড়ির আশ-পাশ দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিলো। তারপর একরকম ধাক্কা দিয়েই লক্ষ্মণাচার্যকে বার করে দিলো।

রোগা রোগা মতন ঢ্যাঙা শরীরটা নিয়ে লক্ষ্মণ যখন পাশে এসে দাঁড়ালো তখন তাকে দেখেই প্রচণ্ড রাগে যেন ফেটে পড়লো গরুড়। শিব ঠাকু-রের যজ্ঞ পণ্ড করতে যেন শুয়োরের মতন তার আবির্ভাব। এতটা পথ রোদে এসে হাঁপাচ্ছিল লক্ষ্মণ। এক হাতে ভুঁড়ি চেপে অন্য হাত দিয়ে মেঝে ধরে কোনো রকমে বসলো লক্ষ্মণ। নজর দিয়ে তখন তাকে গিলে খাচ্ছে গরুড়। ভাঁড়ারে যতরকম গালাগালি আছে সবগুলোই সে তখন মনে মনে প্রয়োগ করেছে। নেহাত প্রাণেশাচার্য বসে আছেন, নচেৎ গরুড়ের

বাকাস্রোতে এতক্ষণে হয়ত ভেসে যেত লক্ষ্মণ। কী নয় সে! কালো-কুচ্ছিৎ, কৃপণ—যেমন দেখতে তেমনি স্বভাবে ইতর। নীচস্য নীচ। হাত দিয়ে জল গলে না। বাড়িতে এক পলা তেল থাকে না যে তা মাথায় ঘষে ব্রাহ্মণী চান সারতে পারে। এ-কথা না জানে কে! রুক্ষ চান করতে করতে বিরক্ত হলে মাইল চারেক দূরে কোন্‌কানির মুদিখানায় যায় লক্ষ্মণ।

—হ্যাঁহে! তোমার দোকানে ভালো তিলের তেল আছে? আছে? কই দেখি! তারপর হাতের চেটো বাটির মতন আড়াল করে নমুনা চাইবে। নাকে শুঁকবে। মাথায় ঘষবে। তারপর মুখ কুঁচকে হয়ত বলবে।—মন্দ নয়। তবে একেবারে খাঁটি নয়। তা কবে নাগাদ খাঁটি জিনিস আনছো বলো তো? বাড়ির জন্যে একটা টিন নিতাম।

কথা বলতে বলতেই শুকনো লঙ্কার থলের মধ্যে হাত পুরে দেবে। তারপর এক খাবলা লঙ্কা তুলে নিজের কাঁধের ঝোলার মধ্যে পুরে নেবে। সেখান থেকে মাইল খানেক হেঁটে পৌঁছবে আর এক দোকানে। আর এক ক্ষেপ তেল, নুন, লঙ্কা ঝোলায় পুরবে। আগের দোকানির নিন্দে করবে। বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়াবে। কলাপাতা কেটে বাড়ি নিয়ে আসবে। সেগুলো শুকনো করবে। পাতার ঠোঙা বানাবে। তারপর বিক্রি করে দু'পয়সা রোজগার করবে। শকুনের মতন অপেক্ষায় থাকে কখন কে মরবে। শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন তাকে করতে হয় না। অযাচিত হয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। লোভীর হাত সে বাড়িয়েই আছে। জীবনধারণ তো নয়! যেন কোনো অর্থগৃধ্নু ইতরের বেঁচে থাকার কারিকুরি। উপস্থিত ইতরটা শকুনের শ্যেন দৃষ্টি দিয়েছে গয়নাগুলোর ওপর। কখন কুক্ষিগত করবে। কিন্তু গরুড় তা হতে দেবে না।

হাঁপাতে হাঁপাতে লক্ষ্মণ বললো। নারায়ণ! নারায়ণ! তারপর গায়ের ঘাম মুছে চোখ বুজে বললো।

—আচার্য! শাস্ত্রে যদি আপত্তি না থাকে তবে নারাণাপ্পার শেষকৃত্য করতে আমারও আপত্তি নেই। সে আমার ভায়রা-ভাই। তাই না? সেক্ষেত্রে তার অন্ত্যেষ্টির অধিকার শুধু আমারই। না কি বলুন? কথা শেষে চোখ

খুললো লক্ষ্মণ।

বিস্ময়ে বাক্যস্ফূর্তি হলো না গরুড়ের। তাহলে ? এখন কোন্ যুক্তিতে সে লক্ষ্মণকে ঘায়েল করবে ? হঠাৎ তার চিন্তায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। ধীর স্বরে সে বললো।

—কথাটা যদি তা-ই হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শবদেহের সংকারটাই যদি সমস্যা হয় তাহলে অবশ্য লক্ষ্মণের অগ্রাধিকার মানতেই হবে কারণ, জন্ম-সূত্রে আমরা ব্রাহ্মণ। অপরের পাপের দায় নিতে হবে আমাদেরই। এটা আমাদেরই কৃত্য। কিন্তু অন্ত্যেষ্টির অধিকার আর গয়নার অধিকার এক বস্তু নয়। গয়নার অধিকার একমাত্র আদালতের। অথবা যদি ধর্মস্থলের রায় মানেন, তাহলে গয়নার অধিকার শুধু আমার।

প্রাণেশাচার্য বিরক্ত বোধ করছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে বাসি-মড়ার সংকার-সমস্যার চেয়েও বড় সমস্যা হলো গয়না-সমস্যা। চট করে এ সমস্যা মিটবে না। তাঁর মনে পড়লে ভগবান ত্রিবিক্রমের কথা। বামন-রূপী অবতার বড় হতে হতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর দু'পায়ের মাপে ধরে রেখেছিলেন। গয়না সমস্যাটাও অনেকখানি এইরকম। ছোট্ট একটা বিন্দু থেকে বড় হতে হতে তা এত বৃহৎ আকার নেবে যে তার কোনো হদিশই মিলবে না।

ঠিক তখনই দাসাচার্যর সঙ্গে অন্য ব্রাহ্মণরাও পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো। উদর সর্বস্ব দাসাচার্য ভুঁড়িতে হাত বুলোচ্ছিল। যেন শিশুকে আদর করছে মা। একসময় সে বলে উঠলো।

—ভাই, আমি তো আর পারছি না। খেতে না পেলে আর বাঁচবে না। যা হয় একটা উপায় খুঁজে বার করো তোমরা। নিশ্চয়ই কোনো বিধান-টিধান আছে যা আমরা জানি না। যতক্ষণ মড়া থাকবে ততক্ষণ খেতে পাব না—এমন হতেই পারে না। তাছাড়া বাসি মড়া এবার পচতে শুরু করবে। তখন ঘরে টেঁকাই দায় হবে আমাদের। সকলের মঙ্গলের জন্যেই বলছি—ভাই গরুড়, ভাই লক্ষ্মণ—একটা যা হয় কিছু তোমরা করো।

কথা ক'টা বলে দাসাচার্য সকলের মুখের দিকে তাকালো। স্বর্ণলোভ নয়, নেহাতই জৈবক্ষুধার তাড়না তার। এই একটা কারণেই তার হৃদয় এদের

ওপরে উঠলো। নিজের পায়ের খটখট শব্দ শুনলো। তারপর দরজা ঠেলে নারাণাপ্পার ঘরের মধ্যে ঢুকলো। ও কি! কম্বল মুড়ি দিয়ে নারাণাপ্পা ঘুমুচ্ছে নাকি! নিশ্চয়ই নাক পর্যন্ত মদ গিলেছে। তাই ওঠবার ক্ষমতা নেই। মনে মনে হাসলো শ্রীপতি। তারপর কম্বল সরিয়ে নারাণাপ্পার গায়ে ঠেলা দিলে। নারাণাপ্পা! নারাণাপ্পা! কোনো সাড়া নেই। শরীরটা মরা ইঁদুরের মতন ঠাণ্ডা। তবে কি! কথাটা মনে হতেই দ্রুত হাত সরিয়ে নিল শ্রীপতি। আবার টর্চ জ্বাললো। সঙ্গে সঙ্গে সে সভয়ে দেখল নারাণাপ্পার সারা গায়ে কিলবিল করছে পোকা। পচ ধরেছে শরীরে। চোখ দুটো খোলা। ওপর পানে তাকানো। তবে তাতে দৃষ্টি নেই। স্থির। পচা দুর্গন্ধে বাতাস ভারী।

৬

লক্ষ্মীদেওম্মা যাট ছুঁয়েছে দশবছর আগে। অগ্রহারের সবচেয়ে বর্ষিয়সী নারী। সদর দরজা খুলে বেরোল লক্ষ্মীদেওম্মা। কর্কশ শব্দ হলো দরজার। ঢেঁকুর তুললো বুড়ি। হেউ!

ঘুম হচ্ছে না বুড়ির। আর ঘুম না হলেই, যখন মন মেজাজ ভালো থাকে না, বুড়ি বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। সেদিনও তাই করলো। নিশুতি থমথমে রাত। লাঠি ধরে রাস্তায় বেরোল লক্ষ্মী। তারপর লাঠির ভারে শরীরটাকে টানটান রেখে পায়চারি করতে লাগলো। এইরকমই তার অভ্যাস। এক-সময় গিয়ে দাঁড়াবে গরুড়ের বাড়ির সামনে। তার ঊর্ধ্বতন চোদ্দপুরুষদের নাম ধরে গালাগালি করবে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তেত্রিশকোটি ঠাকুরের নাম জপ করবে। তারপর সকলের উদ্দেশে একমুঠি শাপমন্যি ছুঁড়ে ঘরে ফিরবে। কর্কশ শব্দ করে কাঠের দরজা খুলবে। তারপর শুতে যাবে।

লক্ষ্মীদেওম্মার কাঠের দরজার কর্কশ শব্দ আর তার উদ্গার অগ্রহারের এক আলোচিতব্য বিষয়। দুটোর শব্দই অনেক দূর থেকে শোনা যায়। আর এই দুটোর জন্যেই অনেক দূরের মানুষও তাকে এক ডাকে চেনে। অবশ্য, লক্ষ্মীদেওম্মার নিজের খ্যাতিও যথেষ্ট। অগ্রহারের সব ব্রাহ্মণই ভালো

করে তাকে চেনে। একে বালবিধবা, তায় দুর্লক্ষণা। অগ্রহারের মানুষজন দূর থেকে তাকে দেখলে পায়ে পায়ে পিছু হাঁটে। বলে—ডাইনি! এই ডাইনিবুড়ি! একটা খাটো লাঠি নিয়ে তাদের তাড়া করে লক্ষ্মীবুড়ি। লক্ষ্মী-দেওম্মার জীবনকথা যেন পুরাণ কাহিনী। ঠিক কত যে বয়স প্রাচীনার কেউ জানে না। আট বছরে বিয়ে হয়েছিল। দশে পা দিয়েই বিধবা হলো। শ্বশুর-শাশুড়ী খেল যখন তার বয়স পনেরো। তারপর কুড়ি না পেরোতেই চলে গেল নিজের বাপ-মা। তখন থেকেই অগ্রহারের মানুষ তাকে এড়িয়ে চলেছে। তখন গরুড়াচার্যের বাবা বেঁচে। ভরা যুবতী মেয়েটাকে নিজের কাছে এনে রাখলো। সামান্য যেটুকু সম্পত্তি আর গয়নাগাঁটি ছিল—মেয়ে-টার সঙ্গে সঙ্গে তারও দেখাশোনার ভার নিল। সেই থেকে দীর্ঘ পঁচিশ বছর গরুড়ের সংসারেই থেকে গেছে লক্ষ্মীবুড়ি। তারপর যেদিন গরুড়ের বাবা মরলো সেদিন থেকে যেন আবার নতুন করে মেয়েটার কপাল পুড়লো। গরুড়ের সংসারে বেশিদিন টিঁকতে পারল না লক্ষ্মী। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে কোঁদল তো লেগেই ছিল। বুড়িটাকে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পর্যন্ত দিত না। একদিন তো হাতাহাতি চুলোচুলি লেগে গেলো এই নিয়ে। গরুড় আর তার ব্রাহ্মণী ঘরের বাইরে বার করে দিলো বুড়িকে। সেই থেকে ভাঙা শ্বশুর-বাড়িতেই পড়ে আছে বুড়ি। সকাল সন্ধ্যে শাপমন্যি করে। আর নামমাত্র খেয়ে বেঁচে থাকে। প্রাণেশাচার্যর কাছে নালিশ জানিয়েছিল। তাঁর নির্দেশে গরুড় তাকে মাসে একটা করে টাকা দেয়। প্রাণেশাচার্যও মাঝে মধ্যে একটু আধটু চাল পাঠান তাকে। এমনি করে দিন কাটছে লক্ষ্মীদেওম্মার। আর যত প্রাচীনা হচ্ছে ততই যেন মানুষের ওপর বিদ্বেষ বেড়ে যাচ্ছে তার। বিদ্বেষ তো নয় বিষ। আর অগ্রহারের সমাজদেহ এই বিষের ক্রিয়ার জরে গেছে।

গরুড়ের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীদেওম্মা চিরাচরিতভাবে শাপমন্যি করে যাচ্ছিল তার চোদ্দপুরুষকে—

মর মর! ঘাটের মড়ারা—। তোর ভিটেয় ঘুঘু চরুক। ভূতের বাড়ি হোক। তোর চোখ কানা হোক। ভেবেচিস, শয়তানি করে মন্তর পড়ে লোকের সম্পত্তি হাতাবি! সেটি হচ্চে না। তোকে সবাই এখন চিনেচে। আয় না,

বাপের বেটা হোস তো আয় না ঘরের বাইরে ! দেখি কতবড় মিন্‌সে তুই। এক অসহায় বেধবার সম্পত্তি গভ্‌ভেপুরে ভেবেচিস বড়লোক হবি ! ও সম্পত্তি হজম হবে না তোর। বুঝলি ? তোর গতি হবে অনন্ত নরকে। সেখানেই তোর মৃত্যু। মরে তোর ঘাড়ে চড়বো আমি। তোর গুষ্টির ঘাড়ে চড়বো। আমায় চিনিস না। তোর সব্বনাশ করে তবে আমি শান্তি পাব। দম নেবার জন্যে বুড়ি একবার চুপ করলো। গলার মধ্যে সাঁই সাঁই আও-য়াজ। একটা লম্বা ঢেকুর তুলে সে ফের শুরু করলো।

—আবার বড়াই করা হয় বায়ুন বলে। বায়ুন না চাঁড়াল ! অমন সোনার চাঁদ ছেলে নারাণাপ্পা। তা আপন শালীর সঙ্গে এমন বে দিলে যে ছোঁড়াটা বয়ে গেল গা ! বেউশ্যে নিয়ে ঘর করত শেষবেশ। আবার বলা হচ্চে নারাণকে একঘরে করা উচিত ছেল। ছেল তো করলি না কেন ? একটা বায়ুনের মড়া—চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে আছে, অথচ এদের রা নেই গা ! এরা কেমন বায়ুন ? বায়ুন না চাঁড়াল ! রাম, রাম ! এত বয়েস হলো—এমন অনাচার তো বাপের জন্মে শুনি নি কখনো। অ্যাতো পচে গেচে দিনকাল। রামচন্দ ! রামচন্দ ! এরা আবার বায়ুন ! তার চে মাতা কামিয়ে মোছল-মান হয়ে যা সব। সেও ভালো। তবু লোক দেখানো বায়ুন হয়ে থাকিস না।

লক্ষ্মীদেওম্মা যখন গরুড় আর অগ্রহারের সমাজের উদ্দেশে গালিগালাজ পাড়ছিল তখন আচমকা একটা ঘটনায় তার বাকরোধ হয়ে গেল। একটা অদ্ভুত ভয়ার্ত চিৎকার করে শ্রীপতি ঠিক তখনই নারাণাপ্পার বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাস্তায়। আর পড়েই ছুট দিলো উর্ধ্বশ্বাসে। অন্ধকার ঝাঁ ঝাঁ রাতে তাকে অমনভাবে ছুটতে দেখে লক্ষ্মীবুড়ি ভাবলো বুঝি নারাণাপ্পার প্রেতাত্মা। খনখনে গলায় চেঁচাতে লাগলো বুড়ি।—ভূত ! ওরে নারাণের ভূত রে ! বলতে বলতে ঘরে ঘরে সে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে বেড়াতে লাগলো।

শ্রীপতি তখনও দৌড়োচ্ছিল। পিছনে তাড়া করেছে একটা অজানা ভয়। চক্ষের নিমেষে নদী পেরিয়ে সে ওপারে গিয়ে পৌঁছালো। তাকে এখনই পারিজাতপুরে—নটরাজের বাড়ি পৌঁছাতে হবে।

প্রাণেশাচার্যর উঁচু বারান্দায় একা বসেছিল চন্দ্রী। চোখে ঘুম নেই ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে। জীবনে কখনো সারাবেলা এমনভাবে অভুক্ত কাটা নি সে। উপবাস তার কাছে আত্মপীড়ন ছাড়া কিছু নয়। জীবনে এম কঠিন কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনের দরকার তার হয় নি। সে ভালো খেয়েছে ভালে পরেছে। ভালো জায়গায় বাস করেছে। এমন অভুক্ত অবস্থায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা তার নেই। কুন্দপুর ছেড়ে অব্দি নারাণাপ্পা সঙ্গে যে ক'বছর সে ঘর করেছে সেই ক'বছর তার সুখের অভাব হয় নি নরম বিছানায় শুয়েছে। রজনীগন্ধার সুবাসে ম ম করেছে ঘর।

কিন্তু ক্ষিদের জ্বালা বেশিক্ষণ সইতে পারলো না চন্দ্রী। ঘরের পেছনেই বাগান বাগানে গেল। এক কাঁদি কলা পেড়ে নিল। বসে বসে অনেকগুলো খেলো তারপর নদী থেকে পেটপুরে জল খেয়ে আবার এসে বসলো বারান্দায় আর তখনই সে শ্রীপতিকে দেখতে পেল। ভয় পেয়ে ছুটছে। বোধহ একমাত্র সে-ই চিনতে পেরেছিল যে ভয় পাওয়া মানুষটা অন্য কেউ ন —শ্রীপতি।

ঘরে ফিরতে ভয় পাচ্ছে চন্দ্রী। মরে যাওয়া মানুষের মুখ দেখতে ভয় হয় তার। নারাণাপ্পার মৃতদেহটা এখন একটা বীভৎস অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয় তার কাছে। যদি ঠিকমত সৎকার হতো – তাহলে মানুষটার ওপ তার প্রেম ভালবাসা অবিরল অশ্রুধারার মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকতো। এখন যা আছে তা প্রেম নয়—ভয়, আতঙ্ক। হ্যাঁ, সে স্বীকার করে যে দশটা বছর নারাণাপ্পার সঙ্গে বড় সুখে কাটিয়েছে। তাই তো মানুষটার ওপর আকর্ষণটা এখনো জিয়ানো আছে। কিন্তু মন তার সবিশেষ ক্ষুব্ধ। এ কি অনাচার! মড়ার গতি হবে না? হয়ত অনাচারী ছিল সে। ধর্ম মানতো না। ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে ঠাট্টা করতো। এমন কি ম্লেচ্ছের ছোঁয়া অন্ন খেতেও তার রুচিতে বাধতো না। তাই কি পাপ স্পর্শ করেছে নারাণাপ্পাকে! চন্দ্রী জানে পাপ তাকে স্পর্শ করবে না কখনো। হয়ত জন্মসূত্রে বেশ্যা, তাই। ঠিক যেন প্রবাহিত নদী। মানুষের স্তূপীকৃত ক্লেদ আর মালিন্য ধুয়ে যায় এই প্রবাহে। পুরুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় তার কাছে আসে। চন্দ্রী তাদের ক্লেদ-মুক্ত করে আপন প্রবাহে। সে নিত্যপুণ্যা—দেবী ভাগীরথী। যেন তুঙ্গা

নদী! কামতৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে তার কাছে আসে যে পুরুষ,সে তার কামনার শান্তি করে—তাকে স্নিগ্ধ করে। তুঙ্গার ধারায় অবগাহন করে মানুষের মনে মালিন্যমুক্তির যে প্রশান্তি, সেই প্রশান্তি চন্দ্রী পুরুষকে দেয় নির্বিশেষে। সে নিজে ক্ষয় হয় না। তার জীবনধারা শুকিয়েও যায় না। সে চিরপ্রবাহমানা যৌবনা—তার ক্ষান্তি নেই।

না, শুকিয়ে সে কখনো যাবে না। দেখেছে তো ব্রাহ্মণীদের। দু'টো ছেলে বিয়োতে না বিয়োতেই চোখের কোল বসে যায়, গাল তুবড়ে যায়। বুক ঝুলে যায়। চন্দ্রী জানে, সে তেমন হবে না। তুঙ্গার বুকে যেমন সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি তার বুকের ওপরেও ঝাঁপিয়ে পড়বে পুরুষ। বুক উঁচু করে সে গ্রহণ করবে সবাইকে। উঃ! কি দস্যিপনাই না করতো নারাণাপ্পা! যেন একটা দামাল ছেলে। অথবা শিকারী চিতা। কিংবা মৌচাকের গন্ধে আকৃষ্ট মাতাল ভাল্লুক। হঠাৎ বিষণ্ণ হলো চন্দ্রী। কিন্তু সবার আগে মৃতদেহের সংকার হওয়া দরকার। অন্ত্যেষ্টি হয়ে গেলে সে ফিরে যেতে পারে কুন্দপুরায়। আড়ালে বসে দু'দণ্ড চোখের জল ফেলতে পারে মানুষটার জন্যে। মানুষটা রাগী ছিল ; বদমেজাজি ছিল। বলতো বটে ধর্মত্যাগী হবে। মুসলমান হবে। কিন্তু ধর্ম তো সে ত্যাগ করে নি—ধর্মও তাকে ছাড়ে নি! মনে বোধহয় একটা গোপন ব্যথা ছিল তার—যা সে জানতো না।

প্রাণেশাচার্যর সঙ্গে নারাণের মতের অমিল ছিল—মতান্তর হতো। কিন্তু কখনও অশালীন ব্যবহার করতো না নারাণ। মনের গভীরে একটা ভয় ছিল তার। ঝগড়া বিবাদ যা করতো তাড়াতাড়ি ভুলে যাবার চেষ্টা করতো। নারী মনের সহজাত দ্বেষ আর সন্দিগ্ধতা নিয়েও সে নারাণের অন্তরলোকের ঘৃণার পরিমাপ করতে পারতো না। চন্দ্রীর মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই কথাগুলো। সবে তখন এখানে এসেছে। মিনতি করে চন্দ্রী বলেছিল—ওগো! তুমি বামুন। আমার হাতের রান্না মাংস খেও না। না হয় আমি নিজেও মাংস খাওয়া ছেড়ে দেবো। যেদিন খুব ইচ্ছে হবে সেদিন না হয় শেঠিদের ওখানে চলে যাব। চন্দ্রীর মিনতি শোনে নি নারাণাপ্পা। একটা প্রবল পুরুষ-ইচ্ছা—একটা অদম্য শক্তি তাকে চালিত করতো। একেই বোধহয় ব্যক্তিত্ব বলে। আর এই ব্যক্তিত্বটাই সইতে পারতো না তার স্ত্রী। একটু

ক্ষ্যাপাটে ছিল মেয়েটা। স্বামীর ব্যক্তিত্ব সহ্য করতে না পেরে মায়ের কাছে ফিরে গিয়েছিল। স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে নি। তারপর তো মরেই গেলো। বোধহয় একটা দিনের জন্যেও স্বামীকে ক্ষমা করতে পারে নি মেয়েটা। ভাবতে ভাবতে চন্দ্রীর মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। মানুষটা যে কত শাপমন্যি কুড়িয়েছে কে জানে! অথচ তার কি দায়! মানুষটাকে ভালবাসত বলে! হ্যাঁ; যদ্দিন সে বেঁচে ছিল সে দায় কুড়িয়েছে। এখন যখন মরেছে—তার শেষ কাজটুকু হলেই সে চলে যায়। আর ফিরে সে আসবে না এখানে।

একটা সন্দেহ কুরে কুরে খাচ্ছিল তার মন। সে নারাণাপ্পাকে ভালো মতোই চিনতো, জানতো। মানুষটাকে কখনও ঠাকুর দেবতার সামনে হাত-জোড় করতে দেখে নি। অথচ সেই মানুষই রোগের ঘোরে কেমন ঠাকুর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। সর্বক্ষণ ঠাকুর ঠাকুর করতো। যেমন তেমন করে ডাকা নয়। আকুল হয়ে ডাকতো—রাম, নারায়ণ। পাপ কাজ করে ভয় তাড়িত ডাকা নয়। হৃদয়ের সর্বস্ব দিয়ে কাতর স্বরে ডাকা। কিছু একটা বদলের কাজ নিঃশব্দে হয়ে যাচ্ছিল নারাণাপ্পার মধ্যে। যা সে বুঝত না। কিন্তু এঁরা যদি শেষকৃত্যের বিধান না দেন! ওর আত্মার সদ্গতি হবে না তাহলে। পিশাচে রূপান্তরিত হবে ওর আত্মা। না না। তা সে কখনও হতে দেবে না। সে যে নারাণাপ্পার নুন খেয়েছে। কিন্তু—

সবটাই নির্ভর করছিল প্রাণেশাচার্যর ওপর। কত দয়া ওঁর। কেমন সুন্দর ব্যবহার। পালার সেই দৃশ্যটার কথা মনে পড়লো চন্দ্রীর। ভক্তের কাছে ভগবান এসেছেন। সৌম্য, শান্ত, ক্ষমাশীল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন ভক্ত দ্রৌপদীর কাছে। ক্ষমাসুন্দর মধুর হাসিতে ভরা ভগবানের মুখ। প্রাণেশাচার্যর দিকে চাইলেও তেমনি ভক্তিরসাপ্লুত হয়ে ওঠে মন। মা বলতো—বেশ্যা যদি কেনো পুণ্যাত্মার ঔরসে গর্ভিণী হয় তা হলো মহাপুণ্যফল। ঠিক তেমন পুণ্যাত্মা মানুষ প্রাণেশাচার্য। জীবনে নারীসঙ্গ সুখ পেলেন না। দেহ-সুখ দিতে পারে নি ব্রাহ্মণী। দেবেই বা কি করে! একখণ্ড কাঠের মতন শরীরটা তাঁর। তবু যেন কোনো আক্ষেপ নেই প্রাণেশাচার্যর। কি ক্ষমা-সুন্দর চোখের চাহনি। কেমন অনাবিল অপাপবিদ্ধ মুখের হাসি। মানুষ-

টাকে ঘিরে যেন একটা জ্যোতির্বলয় ফুটে আছে। এমন মানুষের আশীর্বাদ পাওয়া মহাপুণ্যের। সে কি পাবে তা এ জন্মে?

কলা কটা খাবার পর চোখে ঢুলুনি এলো। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। আধো জাগা আধো ঘুম অবস্থায় সে ঢুলতে লাগলো। মনের সেই অবচেতন অবস্থায় কানে বাজছিল প্রাণেশাচার্যর মন্ত্রোচ্চারণ। পায়চারি করতে করতে অনুচ্চস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন প্রাণেশাচার্য। হঠাৎ কি হলো, ধড়মড় করে উঠে বসলো চন্দ্রী। মনে মনে লজ্জা পেলো। জোর করে ঘুম তাড়াতে চেষ্টা করলো। তার পর কখন যেন হাতখানা উপাধান করে শুয়ে পড়ল। হাঁটুদুটো মুড়ে শরীরটা গুটিয়ে নিলো। মুখের ওপর চাপা রইলো আঁচলখানা। ঘুমিয়ে পড়লো চন্দ্রী।

পুঁথির প্রতিটি পাতা ওল্টালেন প্রাণেশাচার্য। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শেষ পৃষ্ঠা অব্দি পড়লেন--কিন্তু না; এমন কোনো সমাধান নেই যা বিবেক বুদ্ধি দিয়ে তিনি গ্রহণ করতে পারেন। তাহলে? মনে মনে দুর্বল হয়ে উঠছিলেন প্রাণেশাচার্য। ধর্মসংহিতায় কি এ সমস্যা সমাধানের কোনো উল্লেখই নেই? আর একটা আশঙ্কার কথা মনে হতেই মন বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। সমাধানের কোনো ইঙ্গিত যদি না দিতে পারেন তাহলে কি অন্য ব্রাহ্মণদের চোখে তিনি হেয় হয়ে যাবেন? সকলের সব জিজ্ঞাসা তাঁর মধ্যেই পরিণতি পেয়েছে। তিনি যদি অপারক হন তাহলে কি জীবনে ব্যর্থতা আসবে না? মানুষ সব হারিয়েও রিক্ত হয় না। যথার্থ রিক্ত হয় তখনই যখন মানুষ খ্যাতি হারায়। সুনাম হারায়। খ্যাতি সুনাম সব যৌবনের মতো। একবার গেলে আর ফিরে আসে না। হঠাৎ তিনি লজ্জিত হলেন। মনে ভাবলেন, ছিঃ! এমন বিপদের সময়েও তিনি নিজের খ্যাতি সুনামের কথা ভাবছেন! আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা!—আর যার হোক; তাঁর নিজের ক্ষেত্রে এই প্রীতি ইচ্ছা মানায় না। তিনি যে আচার্য! আবার খুললেন পুঁথির পাতা। সমর্পিত মন দিয়ে পড়বার চেষ্টা করলেন। মনোযোগ দিতে পারলেন না। আবার খুললেন পুঁথি। আবার পড়তে চেষ্টা করলেন। এবারও তিনি পারলেন না।

স্ত্রীর গোঙানির শব্দ আসছে। কানে যেতেই উঠে দাঁড়ালেন প্রাণেশাচার্য।

ভগীরথীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। সযত্নে মুখে ঢেলে দিলেন লেবুর রস। অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করছিল ভগীবথী।

—নারাণাপ্পাকে না নিয়ে আমাকে কেন নিলে না ঠাকুর; সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে মরতে পারা যে বড় ভাগ্যির। আমি যে তাই চাই ঠাকুর।

এও একরকমের আত্মপীড়ন। এমনি করেই যেন ক্রমাগত নিজেকে হেয় করতে চাইছে ভগীরথী। তাকে থামাবার জন্যেই যেন আচার্যকে সান্ত্বনার কথা বলতে হলো।

—কেন উতলা হচ্ছ। আজ হোক কাল হোক মরতে হবে সবাইকেই। তোমাকেও হবে। ঠাকুর সবার কথাই ভাবেন।

ভগীরথীকে চুপ করিয়ে প্রাণেশাচার্য আবার ফিরে এলেন নিজের জায়গায়। লণ্ঠনের আলোর সামনে আবার পুঁথি খুলে বসলেন। তাঁর মনে হলো শাস্ত্রে এই সমস্যার সমাধানের কোনো বিধান যদি না থাকে তাহলে তাঁরই হার হবে। শুধু তাঁর বাধাদানেই নারাণাপ্পাকে পতিত করা হয় নি। নারাণাপ্পা হুমকি দিয়েছিল যে তাকে সমাজচ্যুত করলে সে ধর্মান্তর নিয়ে মুসলমান হবে। নারাণাপ্পার এই হুমকি হিন্দুধর্মের সব অনুশাসনকে ধিকৃত করেছে। তাঁরা সেই যুগটা বহুদূরে ফেলে এসেছেন যখন হিন্দুব্রাহ্মণের কৃচ্ছ্রসাধনের সদম্ভ তেজ দিয়ে জগৎসংসার পরিচালিত হতো। আজ ব্রাহ্মণের সেই তেজ গেছে। তাই হুমকির কাছে আজকের ব্রাহ্মণকে মাথা নুইয়ে থাকতে হয়। আর সঙ্কটগুলো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

নারাণাপ্পার হুমকির কাছে ভয় পেয়েছিলেন তিনি। আশঙ্কা হয়েছিল সত্যি যদি বিধর্মী হয়ে যায় ছোঁড়াটা! তাহলে অগ্রহারের ব্রাহ্মণ পরিবেশে সে হয়ে উঠবে মূর্তিমান কালাপাহাড় বিশেষ! কিন্তু শুধু কি ভয়? প্রাণেশাচার্য তো ব্রাহ্মণ। আর নারাণাপ্পা তাঁর স্নেহভাজন। তাকে তিনি কি ক্ষমা করতে পারেন না! তাহলে? হঠাৎ যেন অন্তঃস্তল থেকে কে বলে উঠলো—আত্মপ্রবঞ্চনা আর উদারতা এক নয় প্রাণেশাচার্য! নারাণাপ্পার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে যে তুমি তোমার আরব্ধ কর্তব্য থেকে বিরত হয়েছিলে তা নয়। তুমি ভেবেছিলে তোমার প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর কৃচ্ছ্রসাধনের অহঙ্কার দিয়ে নারাণাপ্পাকে ঠিক পথে চালাতে পারবে। তাই না?

মনে মনে চমকে উঠলেন প্রাণেশাচার্য। ইচ্ছাশক্তি ? তিনি জানেন ইচ্ছা-শক্তি যার প্রবল তার মনে ধীরে ধীরে একটা দৃঢ়তা জন্মায়। কিন্তু নারা-ণাপ্পার জন্যে তাঁর ভাঁড়ারে কতটুকু দয়া বা মমতা ছিল ? ছিল বৈকি ! তাঁর চরিত্রের বিশেষত্বই যে উদার মানবপ্রেমিকতা। লোভ আছে। আবার দয়াও আছে। এই দেহ যত প্রাচীন হবে ততই লোভ চলে যাবে দেহ থেকে। কিন্তু মানুষের প্রতি দয়া থেকে যাবে আমরণ। মানবপ্রেম না থাকলে কি তিনি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে রুগ্না স্ত্রীর সেবা করে যেতে পারেন ! যে শরীরে করুণা নেই সে দেহধারী ব্রাহ্মণ হলেও মন তার নীচ কুলোদ্ভব।

ব্রাহ্মণত্ব, মনুষ্যত্ব যা বলো, সবেরই মূলে আছে উদার মানবপ্রেম। আর এরই নাম ধর্ম। যে মনে করুণাধারা সিঞ্চিত হয় না সে মন পাপী। করুণাঘন মনে নারাণাপ্পার কথা ভাবতে বসে নতুন করে ক্লিষ্ট হলেন আচার্য। আহা রে ! মানুষটা নষ্ট হয়ে গেল। সাপের বিষের মতন হননশীল হয়ে উঠলো। কিন্তু কেন ? শাস্ত্রে বলে জন্মসূত্রে যে ব্রাহ্মণ তাকে অনেক জন্ম খুইয়ে, অনেক পুণ্যকর্মের সুফল কুড়িয়ে ব্রাহ্মণত্বের অধিকার পেতে হয়। তাই যদি হয় তাহলে পুণ্যকর্মের সুফল নারাণাপ্পা পেলো না কেন ? তাহলে কেন অব্রাহ্মণোচিত আচরণ করতো ? তাঁর সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে যে মানুষ কেমন করে প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ করে ! ঋগ্বেদ থেকে একটা উপা-খ্যান মনে পড়লো তাঁর।

এক ব্রাহ্মণের দ্যূতক্রীড়ার প্রতি অত্যন্ত আসক্তি ছিল। যত সৎ কাজই সে করুক না কেন জুয়া খেলার ঝোঁক সে কিছুতেই কাটাতে পারতো না। ক্রমে এমন হলো সেই ব্রাহ্মণকে সবাই ব্রাত্য করে তুললো। কোথাও কোনো যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে আহুতি দেবার অধিকার সে হারালো। সুযোগ পেলেই অন্য ব্রাহ্মণরা তাকে অপদস্থ করতো। ধিক্কার দিতো। এমনি ভাবে ক্রমাগত ভর্ৎসিত এবং অবজ্ঞাত হতে হতে তার নিজের ওপর চরম ঘৃণা জন্মালো। ইন্দ্র, বরুণ, যম এবং অষ্ট দিকপতিদের উদ্দেশে সে কাতর প্রার্থনা জানালো। হে দেব ! জন্মসূত্রে যখন ব্রাহ্মণ করেই পৃথিবীতে পাঠালে তবে পাপ কাজের প্রতি এই প্রবণতা কেন ?

যজ্ঞস্থলে অন্য ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরের উদ্দেশে তাদের সর্বস্ব আহুতি দিয়ে লোভ,

হিংসা, অভিমানমুক্ত হবার স্বপ্ন দেখতো, তারা জানতো ঈশ্বর তাদের দান গ্রহণ করছেন। এবং পরিণামে তাদের আত্মা মুক্ত হচ্ছে। কিন্তু ধর্মের কি বিচিত্র সূক্ষ্ম গতি! মরণকালে নারায়ণ নামেই তরে গেল ব্রাহ্মণ। নাম মাহাত্ম্য এমনিই যে শেষ নিশ্বাসের সঙ্গ সঙ্গে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করলেই সব পাপ খণ্ডন হয়ে যায়। ঘোর পাপীরও মুক্তি হয়। জয় এবং বিজয় নামে দুই দ্বারীকে দুটি পথের সন্ধান দিয়েছিলেন ভগবান। যে কোনো একটি দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। হয় ভক্তরূপে নয়তো শত্রুরূপে। তবে প্রথম পথে লাগে সাতজন্মের তপস্যা। আর দ্বিতীয় পথে মাত্র তিনজন্মের পরেই মুক্তি। ভগবান আছেন কি নেই—প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তাঁকে কল্পনা করা—কিংবা তাঁর চিরপ্রবহমান অপার করুণার প্রতি সংশয় প্রকাশ করা —এমনি করে যারা ঈশ্বর স্মরণ করেন তাঁদের মুক্তি নাকি ত্বরান্বিত হয়। আবার এমন ভক্তও আছেন যাঁদের দেহযষ্টি চন্দন কাঠের মতো প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে। আচার বিচার পূজা নিত্যকর্মাদির মধ্যে কর্মসাধনা করে স্মরণ করছেন ভগবানকে। যেমন তিনি। এ পথে মুক্তি আসে দেরিতে। যেমন আজও তিনি মুক্তির ডাক শুনলেন না। আরও কত বছর লাগবে কে জানে! ধর্মের এই সূক্ষ্ম অনুশাসন তিনি বুঝলেন না কখনও। আজও তা দুর্বোধ্য তাঁর কাছে। কে জানে হয়ত নারাণাপ্পা শুনেছিল সে ডাক। মনের গভীরে এক উত্তাল বিক্ষোভের ঝড় বইতো তার। যার প্রকাশ বাইরে ছিল না মোটেও। বাইরে থেকে মনে হতো একটা উদ্দাম জীবন যাপন করছে। তাই করেছিল সে। খানিকটা লাফালো-ঝাঁপালো। তারপর যেন ডুড়ি দিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল চোখের পলকে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই শিহরণ বোধ করলেন আচার্য। কোন্ অলক্ষ্য দেশ থেকে যেন একটা নির্দেশ এলো। আর অব্যক্ত আনন্দে শরীর মন পুলকিত হয়ে উঠলো। মনে মনে বললেন—কাল ভোরেই স্নান সেরে চলে যাবেন মারুতীদেবের মন্দিরে। তাঁর কাছেই নিবেদন করবেন তাঁর পরম সমস্যার কথাটা।—হে পবন দেব! বলে দাও এ সমস্যার সমাধান কোথায় —কোন্ পথে? তুমিই তো আমার পথপ্রদর্শক! অনেকখানি হালকা বোধ করলেন আচার্য। মনের ওপর চেপে থাকা অসহ ভার অনেকখানি লঘু

হয়ে গেলো। আচম্বিতে বারান্দার দিকে তাঁর নজর পড়লো। ছি! ছি! বারান্দায় মেয়েটা খালি মাটিতে শুয়ে! তাড়াতাড়ি ঘর থেকে একটা মাদুর, কম্বল আর বালিশ এনে মেয়েটার শিয়রের কাছে দাঁড়ালেন। মৃদু স্বরে ডাকলেন—চন্দ্রী!

চন্দ্রী ঘুমোয় নি। তবে একটা ঘোরের মধ্যে মায়ের কথাগুলো ভাবছিল। প্রাণেশাচার্যর ডাকে সেই ঘোর ভেঙে গেল। এক ঝটকায় উঠে বসলো। মাথায় কাপড় টেনে দিলো। প্রাণেশাচার্য একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। অন্ধকারে যুবতী নারীর সামনে এমনভাবে এসে দাঁড়ানো তাঁর উচিত হয় নি। তাড়াতাড়ি বালিশ আর কম্বল চন্দ্রীর দিকে এগিয়ে দিলেন। এগুলো রাখো। তারপর বেরিয়ে গেলেন।

চন্দ্রীর যেন বাক্‌রোধ হয়ে গেল। দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে প্রাণেশাচার্য থামলেন। ফিরে তাকালেন চন্দ্রীর দিকে। লণ্ঠনের অপ্রচুর আলোয় যুবতী চন্দ্রীকে স্ফুটনোন্মুখ কুঁড়ির মতন দেখাচ্ছিল। মেয়েটার দিকে আসতে গিয়ে চকিতে ঝলক দিয়ে উঠলো একটা নতুন চিন্তা। তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে গেলেন। তারপর চন্দ্রীর খুলে দেওয়া গয়নার পুঁটুলিটা হাতে নিয়ে চন্দ্রীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। ডাকলেন।—চন্দ্রী!

ধড়মড় করে উঠে বসলো মেয়েটা। একটু যেন উদ্‌গ্রীব। সেদিকে চেয়ে আচার্য বললেন।

—শোনো চন্দ্রী! তোমার উদারতা একটা নতুন সমস্যা তৈরি করেছে। গয়নাগুলো তুমিই রাখো। এতে তোমারই অধিকার। নারাণাপ্পা নেই। কিন্তু তোমার তো সারাজীবনটাই পড়ে আছে! তাছাড়া ব্রাহ্মণকে লোভ করতে নেই। বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়।

চন্দ্রীর অনেক কাছেই দাঁড়িয়ে কথাগুলো বললেন প্রাণেশাচার্য। হাতে লণ্ঠন। চোখের দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে মমতা দয়া। বড় বড় দুই কালো চোখ নম্রভাবে তুলে তাঁকে দেখছে চন্দ্রী। একটু ঝুঁকলেন আচার্য। তারপর গয়নার পুঁটুলিটা চন্দ্রীর হাতে তুলে দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

৭

ক্ষিদের জ্বালায় প্রায় অস্থির হয়ে উঠেছে দাসাচার্য। আর যেন সইতে পারছে না সে। প্রায় চিৎকার করেই ভগবানকে ডেকে উঠলো। নারায়ণ! নারায়ণ! দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ছটফট করতে লাগলো বিছানার ওপর। হঠাৎ তার ছেলেটা উঠে বসলো। মা-কে ঠেলে তুললো।

—ইস্! কি পচা গন্ধ মা! পাচ্ছ না?

দাসাচার্য অবিশ্যি কোনো পচা গন্ধ পায় নি। ক্ষিদের অসহ্য তাড়নায় সে শুধু ছটফট করেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণী পেয়েছে। সে তাড়াতাড়ি স্বামীর গায়ে ঠেলা দিলো।

—এই! পচা পচা একটা গন্ধ পাচ্ছ না? গরমকাল। তার ওপর বাসি মড়া পচছে। অগ্রহারের বাতাস বিষিয়ে উঠেছে।

হঠাৎ নিশুতি রাতে অর্ধোন্মাদ লক্ষ্মীদেওম্মার চিৎকার শোনা গেল।

—সাবধান! অগ্রহারে নারাণাপ্পার প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মনে মনে কেঁপে উঠলো ব্রাহ্মণী। হয়তো তাই। নারাণাপ্পার প্রেতাত্মা হয়তো সত্যিই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর পচা গন্ধটা ছড়াচ্ছে।

নিজেদের কুঁড়েতে বেল্লী আর শুয়ে থাকতে পারলো না। উঠে পড়লো। ঘুটঘুটে অন্ধকার। আশপাশেব কিছুই প্রায় দেখা যায় না। পাশের কুঁড়েখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ছাই হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে সেই লোকটা আর তার বউ। বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে ধিক্‌ধিক্ জ্বলছে ছাইয়ের স্তূপ। মধ্যে মধ্যে আগুনের ফুলকি উঠছে। দূরে ঝোপের কাছে অনেক জোনাকির ঝিকিমিকি আলো চোখে পড়লো। বেল্লীর। ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে সে ঝোপটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। নিঝুম কালো রাত। একটানে পরনের কানিখানা খুলে ফেললো সে। এখন সে সম্পূর্ণ নগ্ন। ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে তার সর্বাঙ্গ যেন জুড়িয়ে গেল। আরাম পেলো

শরীর। এবার পরনের কানিখানা সন্তর্পণে মেলে ধরলো সে। অনেকগুলো জোনাকি ধরলো। কাপড়ের মধ্যে ঝিকিমিকি আলোর ক্ষীণ আভাসে তার মুখখানা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। জোনাকি ধরা কাপড়খানা নিয়ে সে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালো কুঁড়ের ভেতরে। কাপড়টা ঝেড়ে পোকাগুলো মাটিতে ফেললো। পোকাগুলো কিছুক্ষণ মাটির ওপর দপদপ করে জ্বলল। তারপর ঘরময় ঘুরতে লাগলো উড়ে উড়ে। সেই ক্ষীণ আলোয় হাতড়ে হাতড়ে বেল্লী গিয়ে দাঁড়াল তার বাবা মার সামনে। তারা তখনও জেগেছিল। গায়ে হাত পড়তেই তারা আর্তনাদ করে উঠলো।

— ধেড়ে ইঁদুরটা কি করছে এখানে ?

মরা ইঁদুরের পচা গন্ধ আসছে। ইস্! বেল্লী তখনও হাঁটু গেড়ে বসে হাতড়াচ্ছে। হঠাৎ তার হাত পড়লো একটা ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে যাওয়া ইঁদুরের গায়ে। সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো শঙ্কিত স্বরে।

—আঁ—আঁ—

তারপর ল্যাজটা ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাইরে। বিড়বিড় করে নিজের মনেই বকতে লাগলো।

—কোত্থেকে মরতে আসছে শয়তানগুলো কে জানে!

তারপর গায়ের ওপর চাদরটা টেনে সে মাটিতে শুয়ে পড়লো।

সারারাত ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করেছে সবাই। তাই ভোর না হতেই উঠে পড়লো। নিদ্রাহীন রাত কেটেছে। চোখ লাল। কোনোরকমে চোখে মুখে একটু জল ছিটিয়ে সবাই বাইরে এসে দাঁড়ালো। সবাই এখন নারা-ণাপ্পাকই দায়ী করছে। তার জন্যেই অগ্রহারের আজ এই দুরবস্থা। ঘরের মধ্যে শব পচা গন্ধ। টেঁকা দায়। বাচ্চারা লাফিয়ে বারান্দায় নেবেছে কেউ বা রাস্তায়। ব্রাহ্মণীরা মনে মনে শঙ্কিত। নারাণাপ্পার অতৃপ্ত আত্মা যে অগ্রহারের বাতাসে ছড়িয়ে আছে এ ব্যাপারে সবাই নিশ্চিত। বাচ্চা-দের টেনে টেনে ঘরের মধ্যে পোরা হচ্ছে। পাছে তাদের কোনো ক্ষতি হয়। দিনের বেলা এমনভাবে ঘরদোর বন্ধ করে কখনও থাকতে হয় নি তাছাড়া সকালবেলার মাঙ্গলিক কোনো কাজ করা হয় নি। চৌকাঠে

আলপনা দেওয়া হয় নি। দরজায় গোবর জল ছিটানো হয় নি। অথচ দিনের আলো ঠিকই ফুটেছে। এমন অস্বাভাবিক প্রত্যূষ এর আগে আসে নি কখনও। কেমন শূন্য নিস্প্রাণ অসহায় অবস্থা অগ্রহারের। যেন সব ঘরেই মৃতদেহ। অন্তরাত্মা চমকে উঠলো এই অসহায়তার মধ্যে থেকে। একটা অস্বাভাবিক চাপ মানসিকতার। সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলো চণ্ডী-মণ্ডপে। ভবিষ্যতের গর্ভে আরও কি অনিশ্চিত আতঙ্ক আছে কে জানে!

শুধু ভেঙ্কটরমনাচার্যর দুষ্টু ছেলেরা তাদের মায়ের শাসন না মেনে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাঁড়ার ঘর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠোনে এসে পড়ছে ইঁদুরগুলো। ছেলেগুলো হাততালি দিয়ে নাচছে আর ধানের আঁটি গোনার মতন করে গুনছে—এক, দুই, তিন।

ঝাঁটা হাতে তাদের মা বেরিয়ে এলো উঠোনে। মা-কে দেখে ছেলেগুলো চিৎকার করে উঠলো।

—দ্যাখ, মা দ্যাখ! আটটা—ওই দ্যাখ ন'টা—ওই আর একটা! ওফ্! দশ দশটা।

ওদের মা রেগে উঠলো। তাড়াতাড়ি সব কটার নড়া ধরে ঘরের মধ্যে পুরতে পুরতে বললো।

—ওই নোংরা ইঁদুর কে গুনতে বলেছে তোদের—এ্যাঁ? শীগ্‌গির ঢোক ঘরে। খবর্দার ভাঁড়ার ঘরে যাবি না। গেলে এমন মার মারব যে চামড়া সেলাই হয়ে যাবে। চাল ডালের বস্তার মধ্যে থিকথিক করছে ইঁদুরের নাদি। মাগো!

ওদের ঘরে মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের চাল থেকে একটা ইঁদুর লাফিয়ে পড়লো ওদের সামনে। ছাগলছানা যেমন নিজের চারপাশে ঘোরে ইঁদুরটা তেমনি ঘুরতে লাগলো। তারপর হঠাৎ উল্টে চিৎ হয়ে পড়েই মরে গেল। ছেলেগুলো খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠলো।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ব্রাহ্মণরা। পায়ে পায়ে এগুলো প্রাণেশাচার্যের বাড়ির দিকে। নাকে কাপড়-চাপা। দুর্গাভট্ট হঠাৎ সকলকে থামিয়ে বললো।

—যাই বলো বাপু! ওই পাগলি বুড়ির কথাগুলো নেহাৎ ফেলনা নয়! তাই না?

—হতে পারে। তবু চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে নেওয়াই ভালো। ওরা শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালো নারাণাপ্পার বাড়ির দরজায়। সদর দরজা হাট করে খোলা। মনে মনে ভয় পেয়েছে সবাই। আশঙ্কাটা একেবারে অমূলক নয়। নারাণাপ্পার প্রেতাত্মা মৃতদেহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। যদি শুদ্ধাচারে শেষকৃত্য না করা হয় তাহলে প্রেতাত্মা যে কোনো অকল্যাণই করতে পারে। ভয়ে কেঁদে ফেললো দাসাচার্য। অন্য সবার দিকে চেয়ে বললো।

—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ওই সোনার লোভই আমাদের কাল হলো। বলেছিলুম না সেকথা? ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা সহজ নয়। শাস্ত্রমতে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া না হলে প্রেত পিশাচ হয়ে উঠবে। কিন্তু গরিবের কথা কে আর শুনছে! এখন মরো পচা গন্ধ শুঁকে আর উপোস করে!

—না খেয়ে না খেয়ে আমি তো প্রায় মরার সামিল হয়ে উঠেছি।

অনশনে দুর্গাভট্টও কাতর হয়ে পড়েছে। কিন্তু দাসাচার্যর কথায় কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো সে।

—থাম থাম! ঢের হয়েছে। তুমি না নিষ্ঠাবান মাধ্বী? এই কি তোমার নিষ্ঠা? একটা পথ পর্যন্ত বাতলাতে পারলে না এখনো অব্দি? ছ্যা ছ্যা! ওমন গোঁড়ামির কাঁথায় আগুন!

গরুড়াচার্য অপেক্ষাকৃত বিচক্ষণ। শান্ত স্বরে বললো।

—এক কাজ করা যাক। গয়নার ব্যাপারটা সরিয়ে দিয়ে নারাণাপ্পার প্রেতকাজটা যাতে হয় সেই রকম অনুমতি নিয়ে আসি প্রাণেশাচার্যর কাছ থেকে। তিনি হ্যাঁ বললেই আমরা কাজে হাত দিতে পারি। আমাদের ব্রাহ্মণত্বও বজায় থাকে।

সকলেই সায় দিলো। বিনীতভাবে গিয়ে দাঁড়ালো প্রাণেশাচার্যর সামনে। আচার্য তখন স্ত্রীকে কোলে নিয়ে পিছনের উঠোনে গিয়েছিলেন। তাকে প্রস্রাব করিয়ে ঘরে আনলেন। ওষুধ পথ্য দিলেন। তারপর এসে দাঁড়ালেন ওদের সামনে। খানিক চুপ করে থেকে তিনি তাদের পূর্বরাতের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। গরুড়াচার্য সকলের হয়ে নিবেদন করলো।

—আচার্য! আমাদের এ এক বিষম দায়। আপনিই ব্রাহ্মণ সমাজের শিরোমণি। আপনি ছাড়া এই বিষম দায় থেকে আমাদের রেহাই নেই। মৃতদেহ সৎকার করলে নিন্দে হবে না করলেও নিন্দে হবে। তার চেয়ে আপনার সিদ্ধান্তই ভালো। আপনি যান—মারুতিদেবের দৈববাণী শুনে আসুন। আমরা ততক্ষণ অপেক্ষা করি।

চলতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন প্রাণেশাচার্য। সকলের মুখের দিকে চেয়ে বললেন।—তোমাদের ছেলেমেয়েদের কষ্ট দিও না। ওদের খেতে দাও। তাতে কোনো বাধা নেই।

বেতের সাজি ভরে জুঁই, চাঁপা আর তুলসী পাতা তুললেন। তারপর নদীতে গিয়ে স্নান সেরে ভিজে কাপড় শরীরে জড়ালেন। পুরোনো উপবীত বদলে নতুন উপবীত ধারণ করলেন। মারুতিদেবের কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন। মনটাকে তৈরি করে নেবেন বৈকি! সব কাজ শেষ করে যাত্রা করলেন মন্দিরের উদ্দেশে। নদী পেরিয়ে বনপথ অতিক্রম করে প্রায় মাইল দুই হাঁটতে হয়। পথের প্রান্তে বনের নিস্তব্ধ পরিবেশে মারুতিদেবের মন্দির। মন্দির অঙ্গনে পৌঁছে কুয়া থেকে জল তুললেন। তারপর কলসপূর্ণ জল ঢেলে স্নান সারলেন। পথে আসতে কত আবিলতা গায়ে মেখেছেন। স্নান করে দেহ-মন শুদ্ধ হলো! উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন আচার্য। আর এক কলস জল এনে মানুষ-প্রমাণ বিগ্রহের সামনে এসে দাঁড়ালেন। শুকনো তুলসী পাতা আর ফুলের পাপড়িতে ঢেকে আছে বিগ্রহ। সযত্নে সেগুলো সরিয়ে দিলেন। তারপর কলসের জলে ভালো করে স্নান করালেন বিগ্রহ। স্নানের পর বিগ্রহের সামনে বসে ঘণ্টাখানেক ধরে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। ভিজে পাথরের উপর সুগন্ধী চন্দন বেটে লেপে দিলেন পাথরের মূর্তির গায়ে। দিলেন ফুল-তুলসী। ফুলের সুবাস আর চন্দনের সুগন্ধে ভরপুর হলো প্রকোষ্ঠ। রচিত হলো একটা শীতল, স্নিগ্ধ, পবিত্র পরিবেশ। তারপর সেই মনোরম সুরভিত পরিবেশে তিনি মুদ্রিত চোখে প্রগাঢ় অনুধ্যানে স্থিতধী হলেন।

এক দুঃসহ অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে তিনি করুণাময়ের কৃপাপ্রার্থী।—ঠাকুর! বলে দাও কী আমার কর্তব্য! ব্রাহ্মণের শব অমর্যাদায় পড়ে আছে।

সৎকারের আজ্ঞা দাও—তোমার ডান দিকের ফুল ফেলে দাও। যদি আজ্ঞা না দাও—ফেলো তোমার বাঁ দিকের ফুল।

প্রগাঢ় অনুধ্যানের আড়ালে তাঁর মন একটা স্থির প্রত্যয়ে স্তব্ধ। একটা কোনো আজ্ঞা হবেই। প্রদীপের ম্লান কম্পমান আলোয় পবনদেবের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলেন আচার্য।

বেলা দশটা। কিন্তু তখনই রোদের রুদ্র তেজ যেন অসহনীয়। মন্দিরের গর্ভগৃহে একটা গুমোট ভাব। ঘামে শরীর ভিজে উঠেছে। আচার্য উঠলেন। মন্দির অঙ্গনে এসে দাঁড়ালেন। কুয়া থেকে জল তুলে আবার স্নান সারলেন। আবার এসে বসলেন জোড় হাতে। মনে মনে ঠাকুরের উদ্দেশে বললেন।

—তোমার আজ্ঞা না পাওয়া অব্দি উঠব না এখান থেকে।

মারুতিদেবের মন্দিরের উদ্দেশে প্রাণেশাচার্য বেরিয়ে যেতেই চন্দ্রীও উঠে দাঁড়ালো। অন্য ব্রাহ্মণদের সে এড়িয়ে চলতে চায়। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো কলা বাগানে। নদীতে গিয়ে গা ঘষে চান করলো। তারপর ভিজে শাড়ির আঁচলে ভরে নিল পাকা কলা। চকচকে কালো ভিজে চুলের রাশ এলিয়ে পড়েছে পিঠে। যুবতী তনুরেখাটি ঘিরে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে ভিজে শাড়ি। খানিকটা গিয়ে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসলো। অল্প দূরেই মারুতিদেবের মন্দির।

অদূরাগত মন্দির থেকে ঘন্টার ধ্বনি কানে আসছে। প্রাণেশাচার্য ঘন্টাধ্বনি করছেন। চন্দ্রীর মনে একটা মনোরম পরিমণ্ডল রচিত হলো। আবছা আবছা ভাবে একটা পুরোনো স্মৃতির রোমন্থনে মন তোলপাড় করছিল। মা-র কথা মনে পড়ছে। কাল রাতেই তো মাদুর আর বালিশ নিয়ে আচার্য তার মুখের ওপর ঝুঁকে ডাকছিলেন। চন্দ্রী!—আঃ! কী কোমল সে ডাক! আচ্ছন্ন তন্ময়তার মধ্যে তার মনে একটা উল্লাস সৃষ্টি হলো। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো। হায় এখন যে সে তিরিশ পেরিয়ে গেছে! দশ দশটা বছর সে কাটিয়েছে নারাণাপ্পার সংগে। দেহমন সব বিলিয়ে দিয়েছে সেখানে। এতো দিয়েছে কিন্তু প্রতিদান কি পেয়েছে! একটা সন্তানও না। ছেলে হলে তাকে সে গান শেখাতো। মেয়ে হলে শেখাতো উচ্চাঙ্গ নাচ। জীবনে

সুখসম্ভোগ সে সবই পেয়েছিল। কিন্তু কোনোটাই সত্যিকার পাওয়া নয়। বিমর্ষ মনে সে তাকিয়ে থাকলো গাছের দিকে চেয়ে। ছোট ছোট পাখি-গুলো কিচিরমিচির করে গাছের শাখায় বসছে। আর দুলছে শাখাগুলো।

দাসাচার্যর আতঙ্ক হচ্ছিল ক্ষুধার তাড়নায় সে বুঝি মরে যাবে। ছেলে-মেয়েদের জন্য রান্না হচ্ছে। নাকে তার সুবাস যেতে সে আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। জ্বলন্ত আগুনে ঘি ফেললে যেমন তা জ্বলে ওঠে তেমনি জ্বলে উঠলো তার জঠরাগ্নি। মুখের কাছে লালা জমে উঠেছে। থু করে খানিকটা সে ফেললো। বাকিটা গিলে ফেললো। অনশনে অসহিষ্ণু হয়ে একসময় সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো সকলের অসাক্ষাতে। প্রথমে সে গেল তুঙ্গ নদীতে। খররোদে স্নান সারল। তারপর পারিজাতপুরের পথে হাঁটতে লাগলো।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে সে পারিজাতপুর পৌঁছে গেছে খেয়াল হয় নি। খেয়াল যখন হলো তখন দেখলো মঞ্জাইয়ার খড়ের ছাউনি দেওয়া কুঁড়ের আঙিনায় সে দাঁড়িয়ে আছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করলো দাসাচার্য। সে যে ক্ষুধার্ত, মুখ ফুটে সে কথা জানাতে সঙ্কোচ হচ্ছিল তার। জন্মাবধি এই সব অনাচারী ব্রাত্য ব্রাহ্মণদের সে উপেক্ষা করে এসেছে। এদের ছোঁয়া অন্ন দূরে থাক, জল পর্যন্ত খায় নি। এখন যদি এদের রান্না অন্ন সে গ্রহণ করে- যদি তা লোক জানাজানি হয়—তাহলে সমাজে তার নিন্দে হবে। কিন্তু এসব কথা ভাবতে যতটা সময় লাগলো তার ঢের আগেই সে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল মঞ্জাইয়ার সামনে। মঞ্জাইয়া তখন মশলা দেওয়া চিড়ের তৈরি উপ্পিত্তু খাচ্ছিল।

শিষ্টাচার বা ভদ্রতা দেখাতে ভুল করলো না মঞ্জাইয়া। সসম্মানে দাসাচার্যকে অভিবাদন জানালো সে।

—আরে এসো আচার্য! এসো! তারপর ওদিকের খবর কি বলো। প্রাণেশা-চার্য কোনো বিধান দিলেন? সত্যি! বড় দুঃখের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।

অন্ত্যেষ্টি না হওয়া অব্দি তোমরা তো কেউ জলস্পর্শ করতে পারবে না। অথচ—যাক এসেছ যখন একটু বিশ্রাম করে যাও। ওরে কে আছিস! আচার্যির জন্যে একটা আসন দিয়ে যা।

দাসাচার্য দাঁড়িয়েই রইলো। আড়চোখে তাকালো মঞ্জাইয়ার পাতের দিকে। মঞ্জাইয়া সহৃদয় ভাবে বললো।

—কি গো! মাথাটাথা ঘুরছে নাকি? একটু ফলটল আনতে বলি? হাঁ না কিছু বললো না দাসাচার্য। ধপ করে নিচু জলচৌকির ওপর বসে পড়লো। তার পক্ষে আগ বাড়িয়ে কিছু বলা অশোভন। অথচ কথাটাও পাড়া দরকার। মনে মনে খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে সে কথাটা পাড়লো। খেতে খেতেই মঞ্জাইয়া তার কথা শুনছিল।

—দেখ ভাই! গতকাল তোমার এখানে বসে যেভাবে ওরা তোমার সঙ্গে আলাপ করছিল তা আমার মোটেই ভালো লাগে নি।

যেন অত্যন্ত লজ্জা পেয়েছে এমনভাবে মঞ্জাইয়া বলে উঠলো।

—আরে ছি! এ-সব আবার কি বলছো তুমি!

—না না মঞ্জাইয়া! ঠিক কথাই বলছি। এই কলিযুগে সত্যিকার বামুন ক'জনা আছে বলতে পারো?

—তা ভাই ঠিক বলেছ। পচে গলে গেছে যুগটা। খাঁটি জিনিস পাবে কোত্থেকে?

—তবেই বোঝ। নিষ্ঠা বলো, শাস্ত্রাচার বলো—এ-সব কি তুমি কিছু কম মানো ভাই? কিন্তু সমাজের কল্যাণে যদি দরকার হয় তুমি কি নারা-ণাপ্পার শেষকৃত্য করতে এগিয়ে আসবে না? নিশ্চয়ই আসবে—শুধু তাই নয়; কোনো মূল্য না নিয়েই করবে। অথচ গরুড় আর লক্ষ্মণকে দেখ! একটুকরো সোনার জন্যে ওরা নিজেদের মধ্যে কি খেয়োখেয়িটাই না করছে। ছি! ছি!

—তাই না কি? তাই না কি?

পিছলে বিষয় থেকে সরে যেতে চাইছিল মঞ্জাইয়া। অকারণ অপরের বিরাগভাজন হয়ে লাভ কি।

কিন্তু দাসাচার্য অত সহজে তাকে নিষ্কৃতি দিলো না। আবার শুরু করলো

ওদের কথা।
—কথাটা তাহলে খুলেই বলি। তবে দেখো ভাই, ব্যাপারটা যেন আবার জানাজানি না হয়ে পড়ে।
দাসাচার্যর স্বর ঘনিষ্ঠ হলো।
—সবাই বলছে তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাবে নাকি নারাণাপ্পার ক্ষতি করতে গিয়ে গরুড় নিজের এই সব্বনাশ করলো। ছেলেটা মানুষ হলো না। বদসঙ্গে মিশে মিলিটারিতে ঢুকেছে। লোকটা তো পয়সার পিশাচ। অনাথা লক্ষ্মী দেওম্মার টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি সব তো ও-ই হজম করেছে।
মনে মনে খুশি হলো মঞ্জাইয়া। কিন্তু কোনো মন্তব্য করলো না। মঞ্জাইয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে দাসাচার্য বললো।
—দেখ ভাই, ব্যক্তিগতভাবে গরুড়ের ওপর আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। কিন্তু সত্যিকারের ব্রাহ্মণ বলতে যা বোঝায় গরুড় তা নয়। বছরে একবার গুরুদেবের আশীর্বাদ নিলেই সব পাপ ধুয়ে যায় না। যারা নিজেদের আচ-রণে ধর্মবোধ মানে না তারা অপরকে ধর্মাধর্ম কি করে শেখায়? তুমি কি বলো ভাই? আমার তো মনে হয় প্রাণেশাচার্যই যথার্থ ব্রাহ্মণ। কি কৃচ্ছ্র-সাধন? অথচ মুখের দিকে তাকাও—কি তেজোদীপ্ত চোখমুখ!
—ঠিক কথা। তুমি ঠিক কথা বলেছ।
তারপর হঠাৎ বললো।
—তোমার স্নান-টান হয়ে গেছে?
—নিশ্চয়! আসবার পথে নদীতে একটা ডুব দিয়ে এসেছি।
—তাহলে আমাদের সঙ্গে বসে যাও না!
—ইয়ে, মানে বসতে তো আপত্তি নেই। তবে কিনা কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে অগ্রহারের অর্বাচীনগুলো কোনো কাজে কম্মে আর আমায় ডাকবে না। এখন কি করি বলো তো মঞ্জাইয়া?
দাসাচার্য এমন করুণ করে কথাগুলো বললো যা মঞ্জাইয়াকে স্পর্শ করলো। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো দাসাচার্যর। তারপর তার কানে কানে বললো যে শুধু সে-ই নয়। অগ্রহারের আরও একজন এসে ইতিমধ্যে উদরপূর্তি করে গেছে। সুতরাং—

গলা ঝেড়ে মঞ্জাইয়া বললো।

—দেখ ভাই সব কথা সকলকে বলে বেড়ানো যায় না। কেমন করে ভাবতে পারলে যে আমাদের সঙ্গে এখানে তুমি অন্নগ্রহণ করেছ বলে গলা বাড়িয়ে সে কথা সকলকে বলে বেড়াব! নাও ওঠো! হাত পা ধুয়ে এসো। এই! কে আছিস! আমাদের জন্যে একটু উপ্পিত্তু নিয়ে আয় তো?

উপ্পিত্তুর নাম শোনা মাত্রই দাসাচার্যর জঠরে একটা উত্তেজনা শুরু হয়ে গেলো। দীর্ঘসময় উদরে কোনো খাদ্যবস্তু পড়ে নি। তাই খাদ্য বস্তুর নাম শুনেই পেটের মধ্যে গলগল কলকল নানা শব্দ হতে লাগলো। তাহলেও দুশ্চিন্তা তার গেল না। স্মার্তরা ব্রাত্য। তাদের ঘরে রান্নাকরা অন্ন খাওয়া যথার্থ হবে কি না এই হলো তার দুশ্চিন্তার কারণ। তাই সে বলে উঠলো।

—আবার উপ্পিত্তু কেন ভাই। একটু চিড়ে দুধ আর গুড় দিতে বলো। আমার তাতেই চলবে।

দাসাচার্যর সঙ্কোচ যে কোথায় মঞ্জাইয়া তা বুঝতে পারলো। মনে মনে হাসলো একটু। তাকে হাত পা ধোবার জল দিলো। তারপর সঙ্গে করে রান্না ঘরের নিভৃতে নিয়ে গেল। মঞ্জাইয়ার ব্রাহ্মণী বেশ যত্ন করে চিড়ে কলা দুধ গুড় আর সামান্য খাঁটি মধু পরিবেশন করলো। ফলার মেখে বেশ আগ্রহ করেই দাসাচার্য খেলো। মঞ্জাইয়া সর্বক্ষণ পাশে বসেছিল। একসময় বললো।

—এক চামচ উপ্পিত্তু চেখেও দেখবে না? এক চামচে আর কতটুকু ক্ষতি হবে?

উদরপূর্তির পর দাসাচার্যর চেতনা মূঢ়তায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। পেটে হাত বুলোতে বুলোতে সে শুধু পরমব্রহ্মকে একবার স্মরণ করলো। কিন্তু জোর করে না বলতে পারলো না। মঞ্জাইয়ার ব্রাহ্মণী অত্যুৎসাহিত হয়ে এক চামচের বদলে চার চামচ উপ্পিত্তু দাসাচার্যর পাতে ঢেলে দিলো। দাসাচার্য একটুও প্রতিবাদ করলো না। আরও অনেক সে খেতে পারতো। কিন্তু ভদ্রতা আর শিষ্টাচারে বাধলো বলেই এঁটো কলাপাতার ওপর দু'হাত আড়াল করে বললো।—আরে আরে করছো কি? আর না। একটও না। এরপর তোমাদের জন্যে কিছু থাকবে না।

৯

সেদিন গোবর কুড়োতে বেল্লীর বদলে চিন্নী এলো। ওজর একটা দিতে হয়। তাই বললো।

—বেল্লী আসবে কি—ওর বাপ মা তো শুষছে।

কিন্তু অগ্রহারের ব্রাহ্মণীদের ব্যক্তিগত সমস্যা অনেক। চিন্নীর কথা শোনবার সময় কোথায় তাদের। তবে চিন্নীর সেদিকে খেয়াল নেই। সে বলবেই। কেউ শুনুক আর না শুনুক—বয়ে গেল তার।

—ছৌদা আর তার বউ, দু'জনেই মরলো। আমরা তো ওর চালাঘরটা পুড়িয়ে দিলুম। মড়া দুটো পুড়ে গেল ঘরের সঙ্গে। কে জানে বাবা ওঁরা আবার রাগ করলেন কি না!

বলে কাদের উদ্দেশে যেন প্রণাম জানাল চিন্নী।

গরুড়াচার্যর ব্রাহ্মণী সীতাদেবী কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনবরত একটা দুশ্চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। ছেলেটার যদি কোনো অমঙ্গল হয়। কে দেখবে তাকে? আহা! কোন্ দূর দেশে বাছা আমার পড়ে আছে! চিন্নীর সঙ্গে চোখোচোখি হতে একটু দূর থেকে চিন্নী বলে উঠলো।

—আমার দিকে একটু ছুঁড়ে দাও না সীতামা।

ঘরের ভেতর গেল সীতা। কয়েকটা পানপাতা, গোটা সুপুরি আর খানিক দোক্তাপাতা নিয়ে এলো ভেতর থেকে। তারপর ছোঁয়া বাঁচিয়ে চিন্নীর দিকে ছুঁড়ে দিলো। দোক্তাপাতা, পান আর সুপুরি কটা আঁচলে বেঁধে চিন্নী বললো।

—জানো সীতামা! বিয়ে বাড়ির মতন ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর আসছে আমাদের ঘরে। কেন আসছে কে জানে!

কথা শেষে গোবরের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে চিন্নী ফিরল।

ফিরতে ফিরতে চিন্নী ভাবলো বেল্লীর সঙ্গে বসে ক'টা দোক্তা পাতা সে গুঁড়ো করে রাখবে। এইসব ভেবেই সে বেল্লীর কুঁড়েতে গেল। ঢুকেই

কিন্তু চমকে উঠলো। বেল্লীর বাপ-মা দু'জনেই তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। চিন্নী মনে করলো বোধহয় জ্বরের তাড়সে চেঁচাচ্ছে ওরা—অথবা দুষ্ট অপদেবতা বুঝি ভর করেছেন ওদের ঘাড়ে। সন্তর্পণে বেল্লীর খোঁজ করতে গিয়ে চিন্নী দেখলো বাবা-মার পাশটিতে দু'হাতে মাথা ধরে চুপ করে বসে আছে বেল্লী। তাকে দেখে চিন্নী বলতে যাচ্ছিল—জানিস! অগ্রহারেও দেখলাম দলে দলে ধেড়ে ইঁদুর আসছে। কিন্তু বলতে সাহস পেলো না। একটুকরো দোক্তা পাতা ভেঙে সে বেল্লীকে দিলো। তারপর বললো—এই নে! চিবো। সীতামা দিলেন। হাতের তালুতে দোক্তা পাতাটা ঘষে ঘষে মুখে পুরে দিলো বেল্লী। তারপর বললো।

—দ্যাখ্‌, চিন্নী! অপদেবতা ভর করছে বাপ-মার ওপর। দেখছিস না—কিরকম করছে? ছোঁদা আর তার বউকে দেখেছিলি তো? সারা শরীরে কি ছটফটানি রে বাবা! আমি কোনো রকমে বেঁচে গেছি। আর ইঁদুর-গুলোকে দেখেছিস? যেন লড়াই করতে আসছে দলে দলে। বড্ড ভয় করছে আমার।

—ভয় কি! বোকা মেয়ে! ওসব ভাববি না।

বেল্লীকে সাহস দিলো চিন্নী।

বেলা দুটো নাগাদ—যখন মার্তণ্ডদেব মাথার ওপর শিবের তৃতীয় নয়নের মতো রাগে দাউ দাউ করে জ্বলছেন, অগ্রহারের ব্রাহ্মণরা তখন যেন সত্যি-কার হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। ক্ষিদের জ্বালায় ইতিমধ্যেই তারা প্রায় অর্ধমৃত। তারপর যতো বেলা বাড়ছে অনাহার আর খর রোদের তাপ তাদের চৈতন্য প্রায় লুপ্ত করার উপক্রম করলো। চিকচিকে সাদাটে রোদে অগ্রহারের সাদা বালির রাস্তা ঝকঝক করছে। যেন বালুকাময় মরুভূমি। চোখে বিভ্রম লাগলো ওদের। সেই বিভ্রম লাগা চোখে ওদের মনে হচ্ছিল যেন সূর্যদেব রথের ওপর আসীন। আর প্রতিফলিত সূর্যরশ্মির মধ্যে রথের ঘোড়ার মুখ। কিন্তু প্রাণেশাচার্য তখনও ফিরলেন না। অপেক্ষা আর অপেক্ষা। আর কত অপেক্ষা করবে তারা? একটা অবয়বহীন ভয় আশঙ্কা ছড়িয়ে ছিল এই অপেক্ষার মধ্যে। মারুতিদেবের মন্দিরে গেছেন

প্রাণেশাচার্য। একটা কিছু ঈশ্বরাদেশ তিনি পাবেনই। ক্ষীণ একটা আশার আলো খুঁজছিল তারা নিজেদের মনে। হয়তো, হয়তো সে রাতটুকু আর তাদের নারাণাপ্পার শব আগলে বসে থাকতে হবে না।

ভাঁড়ার ঘরে চালের গামলার মধ্যে থেকে সীতাদেবী একটা মরা ইঁদুর বার করল। এক হাতে নাক টিপে অন্য হাতে ইঁদুরের লেজ ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে যাবে তখনই চোখ পড়ল আকাশ পানে। একটা শকুন ছোঁ মারার জন্যে তৈরি হয়ে নেমে আসছে। কিন্তু শকুনটা ছোঁ মারতে নামল না। পাখা গুটিয়ে ছাতের ওপর বসল। ভয়ে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল সীতা। ঘরের চালে শকুন—কি অলুক্ষণে ব্যাপার। মাগো! কই! এর আগে তো এমন অলুক্ষণে কাণ্ড কখনো হয় নি! তাহলে?

দৌড়ে এলো গরুড়াচার্য। শকুনটার দিকে একবার তাকাল। তারপর অবসন্ন মনে বসে পড়ল। সীতা তখনও চেঁচাচ্ছিল। হ্যাঁগা! ছেলেটার কোনো খবর নেই। কেমন রইল কে জানে! ওগো শুনছ!

গরুড়াচার্য ভাবছিল এবার নিশ্চয় তাকে পাপের বেতন দিতে হবে! দাসাচার্য বলেছিল সোনাটুকু মারুতিদেবের মন্দিরে পাঠানো হোক। সে-ই বাধা দিয়ে তা হতে দেয় নি। আতঙ্কিত মনে সেই কথাই ভাবতে বসল গরুড়। এক সময় উঠে দাঁড়াল। স্ত্রীর হাত ধরে গৃহদেবতার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে ভক্তি গদ্‌গদ স্বরে স্বীকারোক্তি করল:— আমি বড় পাপ করেছি ঠাকুর। তোমার মন্দিরে সোনা পাঠাতে দিই নি। আমায় ক্ষমা কর। তোমার সোনা তোমারই থাকুক।

স্বীকারোক্তির পর উৎফুল্ল হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল গরুড়। বার দুই হুসহাস করল। ছাদের মাথায় তখনও বসে শকুনটা। মরা যে ইঁদুরটা সীতা ফেলে দিয়েছিল সেটার মাংস কুরে কুরে খাচ্ছে। গরুড়ের আস্ফালনকে আমল দিলো না। মানী কুটুমের মতন উদ্ধতভাবে গরুড়কে অবজ্ঞা করল।

মুখ তুলে তাকাল গরুড়। তাকিয়েই চমকে উঠল। ঝকঝকে তরতাজা রোদ। আর নীল আকাশের নিচে সেই উন্মুক্ত উষ্ণতায় ডানা মেলে দিয়েছে অজস্র শকুন। শকুন আর শকুন। ঘুরে ঘুরে চক্কর দিচ্ছে মাথার ওপর। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল গরুড়।

—সীতা ! শীগ্‌গির মাথার ওপর তাকাও।

সীতা বাইরে এসে দাঁড়াল। হাতের চেটো আড়াল করে তাকাল আকাশের দিকে। একটা, দুটো, তিনটে—অজস্র শকুন। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল অজান্তেই।

যে শকুনটা ছাতে বসেছিল সে তার লম্বা গলা বাঁকিয়ে আশপাশ একবার দেখল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের পায়ের কাছে। ভাঁড়ার ঘর থেকে ঠিক তখনই একটা ইঁদুর দৌড়ে আসছিল। শকুনটা নিমেষে তার ওপর পড়ল তারপর সেটাকে ঠোঁটে চেপে আবার গিয়ে বসল ছাতের ওপর। গরুড়াচার্য আর সীতাদেবী স্তম্ভিত হয়ে দেখলো ব্যাপারটা। আতঙ্কে মাথায় হাত দিয়ে বসল দুজনেই। এ কি ব্যাপার ! হঠাৎ নজর পড়লো নারাণাপ্পার ঘরের দিকে। অনেক উঁচু থেকে উড়তে উড়তে একটা শকুন এসে নামল নারাণাপ্পার বাড়ির ছাতে। ঘাড় উঁচু করে তাকাল। কুৎসিত ডানা দুটো ঝাপটাল। তারপর স্থির হয়ে বসে তীক্ষ্ণ শ্যেন দৃষ্টি মেলে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল অগ্রহারের সব কিছু। ক্রমে একটা দুটো করে শকুন নামতে শুরু করল অগ্রহারের প্রতিটি বাড়ির ছাতে। কয়েকটা আবার শাঁ শাঁ করে মাটিতে নাবল। তারপর লম্বা শক্ত ঠোঁটের ডগায় জ্যান্ত ইঁদুর তুলে বাড়ির মাথার ওপর গিয়ে বসলো।

কবরখানার আকাশ ছেড়ে এই শিকারী শকুনগুলো অগ্রহারের আকাশে উড়ছে। এ দৃশ্য দেখতে সবাই বেরিয়ে পড়েছে ঘর ছেড়ে। পুরাণের সেই মহাপ্লাবনের কথা মনে পড়ছে সকলের। আজই কি সেই ভয়াবহ শেষের দিন ! সীতাদেবীর সান্ত্বনা যে দুর্লক্ষণ শুধু তাঁর ছেলের নয়। সব বাড়ির মাথার ওপরেই শকুন ছত্রাকারে ঘুরছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে অগ্রহারের ব্রাহ্মণ-সমাজ রাস্তায় নেমে পড়েছে। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় বাক্‌রোধ হয়ে গেছে তাদের। স্তম্ভিত ভাবটা সেকেণ্ড দুয়েক ছিল। তারপর হঠাৎই এই স্তব্ধ ভাবটা ছিঁড়ে গেল যখন দুর্গাভট্ট উৎকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—হু ! হু ! একটা শকুনও উড়ে পালালো না। তবে দুর্গাভট্টের সাহসে সবাই উৎসাহিত হয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—হু ! হু ! এবারও কোনো ফল হলো না। তখনই দাসাচার্য ফিরেছে। খেয়ে পেট ভর্তি। মনে কোনো বিকার নেই

সে-ই পরামর্শ দিলো।

—ওহে, চেঁচিয়ে ওদের তাড়ানো যাবে না। এক কাজ করা যাক বরঞ্চ। কাঁসর নিয়ে এসো। সবাই মিলে পেটানো যাক।

পরামর্শটা মনে ধরল সকলের। সবাই ছুটল। তারপর আপন আপন ঠাকুর ঘর থেকে কাঁসর আর শাঁখ নিয়ে ফিরল। দেখতে দেখতে অপ-রাহ্নের শান্ত পরিবেশ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল কাঁসর ঘণ্টার শব্দে। আকাশ-বাতাস ছত্রখান। মনে হচ্ছিল বুঝি দেবারাধনার সময়। মন্দিরে জ্বলন্ত কর্পূরের নৈবেদ্য দিয়ে পূজার ব্যবস্থা হচ্ছে। অন্তত মাইল পাঁচ-ছয়ের দূরের গ্রামবাসীরা আচমকা শঙ্খধ্বনি শুনে মনে ভাবলো বুঝি বা দুর্বাসাপুরে এখন মঙ্গলারতির সময়। শকুনের দল এই শব্দতরঙ্গে কিছুটা বিস্মিত, কিছুটা চমকিত। তারপরই ঠোঁটে ইতুর নিয়ে দেখতে দেখতে ডানা মেলে তারা আকাশের গায়ে বিন্দুর মতো মিলিয়ে গেল। ব্রাহ্মণরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। ক্লান্ত স্বরে নারায়ণকে স্মরণ করে তারা সামনের উঠোনটা পেরিয়ে ঘরে ঢুকলো মাথার ঘাম মুছতে মুছতে। দুর্গন্ধ আসছিল বলে ধুতির খুঁট নাকে চেপে ধরেছিল তারা।

সীতাদেবী আর অনসূয়া দু'জনেই ভয় পেয়েছে। স্বামীদের কাছে এসে তারা সজল চোখে বলতে শুরু করলো।

—চুলোয় যাক সোনা। যা বলি মন দিয়ে শোন। নারাণাপ্পার প্রেত ঘুরে বেড়াচ্ছে অগ্রহারে। শীগ্‌গির বাসি মড়ার গতি করো। নইলে গ্রাম শ্মশান হয়ে যাবে বলে দিলুম। তাছাড়া পরের সম্পত্তিতে আমাদের দরকারই বা কি!

গরমে শব গলতে শুরু করেছে। গলা শবের পচা গন্ধে থকথক করছে অগ্রহারের পরিবেশ। কোথাও এতটুকু বাতাস নেই যে গন্ধটা ভেসে যায়। সত্যিই যেন প্রেতভূমি। ব্রাহ্মণদেরও সেই রকমই মনে হলো। খিদে, তেষ্টা আর গরমে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে তারা। কি করবে! কেমন করে এই পাঁক থেকে মুক্তি পাবে। গোঁড়া বামুন যারা তারা ধরেই নিল এ থেকে মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই।

দ্বিতীয় পর্ব

৯

আচার্য যখন জেগে উঠলেন তখন মাঝরাত। চন্দ্রীর কোলের মধ্যে তাঁর মাথা। নগ্ন তলপেট দিয়ে আচার্যর গাল চেপে ধরেছে চন্দ্রী। মাথায়, গালে, পিঠে বিলি কাটছে সে। আচার্য চোখ খুললেন। নিজের কাছেই নিজেকে অচেনা ঠেকলো। কোথায় তিনি? কেন এতো অন্ধকার? কোথাকার এই বন? মেয়েটিই বা কে? মনে হচ্ছে তিনি ফিরে গেছেন শৈশবে। অনেক পরিশ্রমের পর মায়ের কোলে শুয়ে ক্লান্তি কাটাচ্ছেন। অবাক হয়ে চারদিক তাকাচ্ছিলেন। আকাশময় ছড়িয়ে আছে অজস্র তারার ফুল। ময়ূরের লেজের মতন ঝলমলে রঙ ওই তো সপ্তর্ষিমণ্ডল! ওই তো অগস্ত্য! ঠিক তলাতেই মিটমিট করছে অরুন্ধতী। ভিজে মাটি ঘাস আর বুনো বিষ্ণুক্রান্তির নীলচে ফুলের সোঁদা গন্ধের সংগে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে মেয়েমানুষের গায়ের ঘামের গন্ধ। অন্ধকার আকাশ, স্তব্ধ রাত, সার দিয়ে দাঁড়ানো বড় বড় গাছ—সব মিলিয়ে এ কোন্ দেশ!

চোখ রগড়ে তাকালেন আচার্য। এ কি স্বপ্ন! হয়ত তাই। মনে ভাবলেন কোথায় এলেন। কোথায়ই বা যাবেন? কিছুই মনে পড়ে না। ফিসফিস করে ডাকলেন—চন্দ্রী! এতক্ষণে জাগরণ ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ হলো। স্তব্ধ বনভূমিতে কান পাতলে অনেক নিভৃত স্বর কানে আসে। কাছাকাছি কোনো ঝোপ থেকে ভেসে এলো ডানা ঝটপটানির নরম শব্দ। ধীরে অতি ধীরে সজাগ হচ্ছে তাঁর ইন্দ্রিয়। দৃষ্টি স্বচ্ছ হচ্ছে। কানে বাজছে বনভূমির অনেক অব্যক্ত শব্দ। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠলো এক ঝাঁক জোনাকি। চন্দ্রীর তলপেটে হাত লাগলো তাঁর। ধীরে ধীরে উঠে বসলেন আচার্য।

ভয় পেয়েছিল চন্দ্রী। মনে ভাবলো আচার্য হয়ত ঘৃণাভরে তাকে ভর্ৎসনা করবেন। তা করুন। তবু মনে মনে সে কৃতজ্ঞ। মনের নিভৃতে পুষছে একটা গোপন কামনা। এই মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে হয়ত কোনো-

দিন সে গর্ভবতী হবে। নিজের জঠরে লালন করবে এমন এক শিশু যার শিরায় বইবে এই মহাপুরুষের রক্ত। কিন্তু মুখে সে কিছু বললো না।
অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না আচার্য। এক সময় উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চন্দ্রীর উদ্দেশে বললেন।
—ওঠো চন্দ্রী! চলো ফিরে যাই। কাল সকালে অগ্রহারের ব্রাহ্মণরা যখন জড়ো হবে আমার বাড়ির সামনে তখন আমার হয়ে তুমি তাদের বলবে আমাদের সম্পর্কের কথা। ব্রাহ্মণদের অগ্রগণ্য হয়ে থাকার অধিকার···
চুপ করলেন আচার্য। এরপর কি বলবেন চট করে ভেবে পেলেন না। খানিক পরে দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বললেন।
—সে অধিকার আমি হারিয়েছি। ওদের সকলের সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকারোক্তির সাহস আমার নেই। তুমি বলবে সে কথা। নারাণাপ্পার শেষ কাজটুকু আমি করতে পারবো। কিন্তু—আর কাউকে দিয়ে এ-কাজ করানোর অধিকার আমার আর নেই। আমি তা হারিয়েছি।
কথাগুলো বলা হলে প্রাণেশাচার্যর মনে হলো তাঁর এতক্ষণের সব ক্লান্তি যেন নিমেষে চলে গেল।

সাঁতরে ওরা দু'জনে একসঙ্গেই নদী পেরোল। চন্দ্রীর মনে সেই থেকে একটা সংকোচ লেগেই ছিল। সে পিছনে রইলো। আচার্যকে এগিয়ে যেতে দিলো। এক সময় ওরা অগ্রহারেও এসে পৌঁছালো। চন্দ্রী ভাবছিল—যা-ই আমি করতে যাই না কেন পরিণতি এমন অশুভ হয় কেন? আমি তো ভালো মনেই সোনার গয়নাগুলো ফেরত দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ফল হলো উল্টো। উল্টো পরিণতির ফল এখন আচার্য ভোগ করছেন! অন্ত্যেষ্টির কাজ যাতে ঠিকঠাক হয় তার জন্যে কত চেষ্টাই না করছেন। কিন্তু বেশিক্ষণ এমন দুরূহ চিন্তা করতে পারলো না চন্দ্রী। তার মনের গঠন প্রমোদপরায়ণ। আত্মনিন্দায় সে অভ্যস্ত হয় নি কখনও।
অগ্রহারের স্তব্ধ রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খানিক আগের সেই মধুর অভিজ্ঞতার কথা তার মনে পড়েছিল। অন্ধকার বনে একা দাঁড়িয়ে সেই অপেক্ষা, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ, নিজেকে সমর্পণ—এ সবই এক অনাস্বাদিত সুখস্মৃতি

তার জীবনে। শুধু সুখ নয়। নিজের কাছে নিজের দামটাও যেন অনেক বেড়ে গেছে। যেন লুকিয়ে রাখা কোনো ফুলের হঠাৎ সৌরভে মুগ্ধ হওয়া। চন্দ্রী জানে এমন করে আচার্য ভাবেন নি। ভাবতে পারেন না। তাই ঠিক করলো প্রাণেশাচার্যর ঘরের বারান্দায় এখন আর সে যাবে না। তাকে দেখলেই তাঁর মনোকষ্ট হবে। বিড়ম্বিত বোধ করবেন তিনি। আজ চন্দ্রীর জীবনে এক পরম লগ্ন উপস্থিত। যা সে পেয়েছে তা পরম সৌভাগ্য। না না। ওই সব শুকনো তত্ত্ববাগীশদের কাছে সে আচার্যকে হেয় করতে পারবে না। কিছুই বলবে না সে তাদের কাছে। আচার্য যতই অনুরোধ করুন না কেন। সব কথা শোনার পর ওই মানুষগুলোর কাছে অনেক ছোট হয়ে যাবেন আচার্য। তা সে জানে। কিন্তু তার বদলে সে কি করবে? ফিরে যাবে নারাণাপ্পার ভূতুড়ে বাড়িতে। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিলো তার। আবার আচার্যর কাছেও যাওয়া চলে না। তাহলে?

কিন্তু নারাণাপ্পার বাড়িতেই সে যাবে না কেন? এতদিন তো ওখানেই কাটিয়ে এলো! সাহস সঞ্চয় করলো চন্দ্রী। মনে মনে বললো—হ্যাঁ ওখানেই যাব। বারান্দায় শুয়ে রাত কাটাব। নেহাৎ যদি ভয় করে তখন না হয় আচার্যর বাড়ি গিয়ে শোব। যেমন একদিন শুচ্ছিলাম। যখন যেমন তখন তেমন।

মনে মনে কথাগুলো ভেবে চন্দ্রী সোজা গিয়ে উঠলো নারাণাপ্পার পরিত্যক্ত বাড়িতে। খড় ছাওয়া বারান্দার তলায় সে কান পেতে দাঁড়ালো। কুকুরের ডাকে থমথম করছে রাত। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলো। আস্তে ঘরের দরজা ঠেললো। খোলা। কোনো শেয়াল কুকুর ঢোকে নি তো? কি ঘুট-ঘুটে অন্ধকার! তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে অভ্যস্ত হাতে দেশলাই খুঁজলো। তারপর হারিকেন জ্বাললো। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো। মড়াটা বীভৎস হয়ে পচে ফুলে উঠেছে। ইস! কি দুর্গন্ধ! মড়া পচছে। পচছে মরা ইঁদুর। একটু কষ্ট পেলো চন্দ্রী। আহা! মড়া আগলাতে কেউ নেই। সে-ও ছিল না। অথচ তাকে নিয়েই মানুষটা একদিন অগ্রহারে চমক এনে দিয়েছিল। ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে উঠতে সে ভাবছিল—আহা! যদি কয়েকটা ধূপ জ্বালানো যেতো তাহলে বোধহয় ঘরের বাতাসে এই পচা

গন্ধটা ভেসে বেড়াতো না।

হারিকেনের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মড়া। গা থেকে ধোঁয়া ধোঁয়া কি যেন বেরুচ্ছে। পেটটা ফুলে ঢোল। মুখখানা বেঁকেচুরে একেবারে কদাকার। একনজর তাকিয়েই আতঙ্কে চমকে উঠলো চন্দ্রী। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে গেল। অন্তরাত্মা কাঁদছিল চন্দ্রীর। কে! কে ওই মানুষটা! ওকে তো চেনে না সে! কখনও ভালবাসে নি ওকে। ওই লোকটার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ ছিল না তার কখনও। ভয় পাওয়া মানুষের মতন ছুটে বেরিয়ে এলো চন্দ্রী। এক হাতে হারিকেনটা শক্ত করে ধরে দৌড়তে লাগলো সে। প্রায় মাইলখানেক দৌড়েছিল। যখন থামলো দেখলো ঠেলা-গুলা শেষাপ্পার বাড়িব দোরগোড়ায় এসে পৌঁচেছে সে। ওই তো সাদা বলদ দুটো। শেষাপ্পার উঠোনের খোঁটার সঙ্গে বাঁধা। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো চন্দ্রী। অচেনা মানুষ দেখে বলদ দুটো অস্বাভাবিক ভাবে উঠে দাঁড়ালো। জোরে জোরে নিশ্বাস ছাড়লো। মুখের বাঁধন খোলবার চেষ্টা করলো। কুকুর-গুলো চেঁচিয়ে উঠলো। ঘুম ভেঙে গেল শেষাপ্পার। ঘুম চোখে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলো। যত দ্রুত সম্ভব সব কথা তাকে খুলে বললো চন্দ্রী। আরও বললো—তুমি শীগ্‌গির তোমার গাড়ি নিয়ে এসো। মড়াটা আমরা গাড়ি করে শ্মশানে নিয়ে যাব। তারপর বাড়িতে যে কাঠ আছে তাই দিয়েই দাহ হবে।

একপেট খেয়ে শেষাপ্পা বোধহয় কোনো মধুর স্বপ্ন দেখছিল। তাই প্রথমটা সে ঠিক বুঝতে পারে নি। যখন বুঝলো তখনই আতঙ্কে পাংশু হয়ে উঠলো সে। ভারি বিনীত ভাবে বললো।

—বলছো কি চন্দ্রাদিদি? বামুনের মড়া ছুঁয়ে আমায় কি তুমি নরকে যেতে বলো? না না ও কাজ আমি করতে পারবো না। অষ্টধাতুর মুদ্রা দিয়ে লোভ দেখালেও পারবো না। তার চেয়ে বরং এক কাজ কর। মনে হচ্ছে ভীষণ ভয় পেয়েছো তুমি। আমার এখানে জায়গা আছে ঢের। রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে সক্কালেই চলে যেও।

কোনো কথা বললো না চন্দ্রী। ধীরে ধীরে ফিরে চললো। মনে ভাবলো এ কি করতে যাচ্ছিল সে? একটাই চিন্তা তখন সর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে

তার। নারাণাপ্পার অন্ত্যেষ্টি। কিন্তু যে গলা পচা মড়াটা সে দেখে এসেছে সেটা একটা শবদেহ। বামুন নয়। শূদ্র নয়। নারাণাপ্পাও নয়। শুধু গলা পচা একটা মড়া।

গাঁয়ের যে দিকে মুসলমানের বাস সেই দিকে গেল চন্দ্রী। প্রথমে গেল মেছো আমেদ বারীর কাছে। এক সময় নারাণাপ্পার কাছে টাকা ধার করেছিল লোকটা। ষাঁড় কিনবে বলে। সে কথা ভোলে নি বারী। বিশেষ কিছু বলতে হলো না চন্দ্রীকে। বলদ গাড়ি নিয়ে বেরোল বারী। নিঃশব্দে মড়া তুললো গাড়িতে। কাঠ তুললো। তারপর সোজা চলে এলো শ্মশানে। কেউ জানতেও পারলো না কখন মড়া পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ভোরের দিকে যখন সব শেষ হলো তখন আমেদ বারী বলদের লেজ মুড়তে মুড়তে ফাঁকা গাড়ি নিয়ে ফিরে আসছে।

অনেকক্ষণ কাঁদলো চন্দ্রী। তারপর বাড়ি ফিরলো। খানকয়েক যে সিল্কের শাড়ি ছিল সেগুলো দলা করে একটা থলেতে পুরে নিল। বাক্স থেকে টাকাপয়সা বার করলো—আচার্য যে গয়নাগুলো ফেরত দিয়েছিলেন সেগুলো নিয়ে পুটলির মধ্যে ঢোকালো। তারপর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। খুব ইচ্ছে করছিল ঘুম থেকে আচার্যকে তুলে তাঁকে প্রণাম করে আসে। অনেক কষ্টে সে ইচ্ছে দমন করলো সে। বরং ভাবলো সকালের বাস ধরে সে কুন্দপুরে যাবে। এই ভেবে সে তাড়াতাড়ি বনের পথে হাঁটতে শুরু করলো বাসরাস্তার দিকে। হাতে তার কাপড়ের পুঁটলি।

২

এদিকে পারিজাতপুরের ধনী গৃহস্থ মঞ্জাইয়ার বাড়ির চওড়া দাওয়ার ওপর ভিড় করেছে ছেলেরা। আশপাশের চার পাঁচটি ছেলেরা অগ্রহার থেকে নাটকের মহড়া দিতে জড়ো হয়েছে—শ্রীপতি, গণেশ, মঞ্জুনাথ। মধ্যিখানে একটা হারমোনিয়াম। নারাণাপ্পাই কিনে দিয়েছিল। সে-ই ছিল পারিজাত-পুরের নাট্কে দলের প্রাণ। সর্বক্ষণ কাছাকাছি থেকে ওদের উৎসাহ দেওয়া, অভিনয় শেখানো থেকে শুরু করে এটা ওটা কিনে দেওয়া সবই করতো নারাণাপ্পা। সিমোগী শহর থেকে থিয়েটারের কিছু দৃশ্যপট আনিয়েছিল। আর ছিল হিরণ্যকশিপু পালার সব ক'টা রেকর্ড। আশপাশের ক'খানা গ্রামের মধ্যে গ্রামোফোন ছিল শুধু তারই। দম দিয়ে পালার রেকর্ডগুলো সে ওদের জন্যে বাজাতো। কোনোদিকেই উৎসাহের অভাব তার ছিল না। যেদিন নারাণাপ্পা কংগ্রেসের দলের নাম শুনলো, সেদিনই গ্রামের ছোকরাদের জড়ো করে সে কংগ্রেস দলের নতুন পোশাকের কথা বোঝালো। তাদের পরতে শেখালো হাঁটু অব্দি লম্বা হাতে কাটা সুতোর সার্ট, ঝোলা পাজামা আর মাথায় সাদা গান্ধীটুপি।

তাই নারাণাপ্পার হঠাৎ এমনি করে চলে যাওয়ায় ছেলেরা সবাই মনে মনে কষ্ট পেয়েছিল। কিন্তু বড়দের ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পায় নি কেউ। দরজা জানলা বন্ধ করে মহড়া দিতে দিতে সেদিন সবাই এইসবই ভাবছিল। মহড়া তেমন জমছে না। সিগারেট টানতে টানতে শ্রীপতি উদ্বিগ্ন মুখে বসেছিল। অভিনয়ের ওপর তেমন ঝোঁক তার নেই। সে ভালবাসে নৃত্যনাট্য। অবশ্য অভিনয়ের ওপর ঝোঁক না থাকলেও যাত্রা দলের রাজা উজির সাজতে তার মন্দ লাগে না। যেখানে মহড়া চলছে তার পাশেই রাখা এক ঝুড়ি মশলা মাখা শুকনো ভাত আর গামলা ভর্তি কফি। প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত শুকনো ভাত আর কফি খেতে খেতে যাত্রার মহড়া চললো। শেষ হলে গণেশের দিকে চেয়ে ইশারা করলো নাগরাজা। গণেশ

চিমটি কাটলো মঞ্জুনাথের গায়ে। যাত্রাদলে মেয়ে সাজে মঞ্জুনাথ। সে ঠেললো গঙ্গান্নাকে। শেষে হরিজন গঙ্গান্না শ্রীপতির ধুতি ধরে টান দিলো। পরস্পরের মধ্যে গোপনে সঙ্কেত জানাজানি শেষ হলে অন্য সবাইকে চলে যেতে বলা হলো। শুধু থেকে গেল ওরা চারজন।

সকলে চলে যাবার পর নাগরাজ উঠে দরজায় হুড়কো এঁটে দিলো ভেতর থেকে। তারপর একটা ট্রাঙ্কের ডালা খুলে দুটো মদের বোতল বার করলো। নারাণাপ্পার কথা অহরহই মনে পড়ে যাচ্ছে। এখন তার স্মৃতির সম্মানে এককলি নেশার গান গেয়ে উঠলো নাগরাজ। তারপর বোতল দু'টো একটা থলির মধ্যে পুরে মুখটা এঁটে দিলো। মশলা মাখা ভাত অনেকখানি পড়ে আছে। একটা বড় কলাপাতায় সব ভাতকটা ঢেলে নিল নাগরাজ। কয়েকটা গেলাসও পুরে নিল থলির মধ্যে। নিঃশব্দেই সব কাজ সারলে সে। তারপর জিজ্ঞেস করলো।

—রেডি তো ?

—হ্যাঁ রেডি।

ওরা সবাই এক এক করে দরজা খুলে বেরোল। হঠাৎ মঞ্জুনাথ দাঁড় করালো ওদের।

—একটু দাঁড়া।

ব'লে একটুকরো পাতি লেবু পকেটে পুরে নিল।

যুবক ক'জন নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরোল। তারপর অগ্রহারের সীমানা পেরিয়ে নদীর দিকে এগোল। নিঃশব্দ অন্ধকার রাত। রাত-চরা মানুষগুলোর মনের গতি অন্ধকারের মতই কুটিল। শ্রীপতির হাতে টর্চ। তার আলোয় পথ চলতে চলতে নাগরাজের হঠাৎই নারাণাপ্পার কথা মনে পড়ে গেল।

—আমাদের গুরু একটা আস্ত বোতলের মাল শেষ করেও ঠিক খাড়া থাকত। ড্রাম বাজাতে তাল ভুল করতো না।

ওরা ততক্ষণে একটা ছোট্ট বালিয়াড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বালির ওপর গোল হয়ে বসে পড়লো ওরা। মধ্যে বসালো বোতল দুটো, গেলাস্ আর ভাতের ঝুড়ি। ক্রমে ক্রমে তাদের মনে হতে লাগলো যেন পৃথিবীটা শুধু তাদের পাঁচজনের জন্যেই। সাক্ষী আকাশের তারারা। অনেক অপূর্ণ

আকাঙ্ক্ষার কথা বলাবলি করতে লাগলো তারা। ছোট চাওয়া বা আকাঙ্ক্ষা নয়। অগ্রহারের খাঁটি বামুন হতে পারার কামনা নয়। মারি তো গণ্ডার লুঠি তো ভাণ্ডার। যদি হতে হয় তো মাল খেয়ে ত্রিবিক্রমের মতন বিরাট হতে হবে। কুলকুল করে বয়ে যেতে যেতে তাদের কামনার কথা শুনতে পেল শুধু নদী। ধেনো মালের তপ্ত ক্রিয়া তখন শ্রীপতির মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। গলার স্বর ভেঙে গেছে। ভাঙা গলায় সে আক্ষেপ করে উঠলো।

—শালা অমন জমাটি দোস্ত মরে গেল!

মাথা নাড়লো নাগরাজ। ভাতের ঝুড়ির দিকে হাত বাড়ালো সে।

—ঠিক বলেছিস মাইরি। দলের চাঁই মরে গেল। এ তল্লাটে অমন ঢোলের হাত কটা লোকের আছে।

মঞ্জুনাথ লেবু কচলাচ্ছিল। মাথাটা শোলার মতন হাল্কা। কিছু একটা বলতে গেল সে। বলতে পারলো শুধু—চন্দ্রী! চন্দ্রী!

হঠাৎ যেন দারুণ উৎসাহিত হয়ে পড়লো শ্রীপতি। হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো সে।

—শালা বামনাগুলো যা-ই বলুক—ষাঁড়ের মতন চেঁচাক—এক'শ মাইলের মধ্যে চন্দ্রীর মতন অমন খাসা ডাগর মেয়ে পাবে? জিজ্ঞেস কর সবাইকে। যদি একজনও থাকে শালা আমি জাত বেচে দেবো আমার। বেশ্যা তো কি হয়েছে? কিরে শালা বলছিস না কেন কিছু? নারাণাপ্পার সঙ্গে বিয়ে করা বউয়ের মতন থাকতো না? সেবা করতো না? দেখেছিস তো নিজের চোখেই। দম নেবার জন্যে একটু থেমে আবার শুরু করলো বলতে।

—মাল খেয়ে বমি করে ভাসিয়ে দিয়েছে শালা নারাণ। নিজের হাতে পস্কের করেছে। কতবার আমরাই বমি করেছি তার নেই ঠিক, বল্ শালারা। চুপ মেরে গিলে যাচ্ছিস! মাঝরাত হোক, ভোররাত হোক, নারাণাপ্পা এসে ডাকলেই হলো, তাড়াতাড়ি উঠে তার জন্যে রান্না করা, তাকে খাওয়ানো—সব হাসিমুখে করতো। পারবে কোনো বামনা মেয়ে! ওইসব মাথা কামানো বেওয়াগুলো হাড় বজ্জাত।

বলতে বলতে এক দলা থুথু ফেললো শ্রীপতি। মঞ্জুনাথ একটাই ইংরিজি শিখেছে। সেইটেই বললো—ইয়েস, ইয়েস।

নাগরাজ হেসে উঠলো ওর ইংরিজি শুনে।

—মঞ্জুর পেটে এক পাত্তর মাল পড়লেই মাইরি গড়গড় করে ইংরিজি বেরোয় ওর মুখ থেকে।

আবার মেয়েমানুষের আলোচনা করছে ওরা। শ্রীপতির কান খাড়া হলো। হরিজন মেয়েদের নিয়ে কথা বলাবলি হচ্ছে। বেল্লীর কথা উঠবে না তো! বেল্লীর সঙ্গে তার নিজের ঘাঁটাঘাঁটির ব্যাপারটা শুধু নারাণাপ্পাই জানতো। এদের নজর পড়ে নি ওর ওপর। আর পড়লেই বা কি! বেল্লী অচ্ছ্যুৎ। ওকে ছুঁতে ওদের সংস্কারে বাধবে।

দ্বিতীয় বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে হঠাৎ কেঁদে উঠলো শ্রীপতি।

—আমাদের সেরা দোস্ত মরে গেল। মড়াটা পচছে। দাহ করতেও কেউ এগিয়ে এলো না। আর এখানে বসে আমরা মজা লুটছি। ছিঃ।

শ্রীপতির দেখাদেখি ওরাও জড়াজড়ি করে কাঁদতে শুরু করলো। হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো শ্রীপতি।

—আমাদের মধ্যে কেউ কি পুরুষ নেই?

সবাই বলে উঠলো—আমি আমি।

চোখ ঢুলুঢুলু করে নাগরাজ সকলের দিকে তাকালো। মঞ্জুনাথের দিকে তাকাতেই ফিক করে হেসে ফেললো।

—তুই তো শালা মেয়ে। তুই তো শকুন্তলা।

বলে জড়িয়ে ধরলো নাগরাজ। তারপর মঞ্জুনাথকে চুমু খেলো।

যাত্রার দলে মেয়ে সাজে মঞ্জুনাথ।

শ্রীপতি বলতে লাগলো।

—যদি শালা সত্যিকারের মরদ হোস আর যদি আমার কথামতো চলিস —তবে বলবো, হ্যাঁ। কি রাজি?

সবাই ঘাড় নাড়লো।

শ্রীপতি আবার শুরু করলো।

—নারাণাপ্পা সত্যিকার বন্ধু ছিল আমাদের। বদলে আমরা তাকে কি দিয়েছি? এইবার আমরা তার জন্যে কিছু করার সুযোগ পেয়েছি। শোন্! চুপিচুপি ধরাধরি করে লাশটা তুলে দাহ করে আসি। ওঠ!

সকলের গেলাসে আর একটু করে মদ ঢেলে দিলো শ্রীপতি। এক চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়ালো ওরা। তারপর শ্রীপতির টর্চের আলো নিশানা করে হাঁটতে লাগলো অন্ধকার চিরে। কেউ কোথাও তখন জেগে ছিল না। নদী পেরোল ভূতের মতন। নেশাটা সোজা ওদের মগজে ঢুকে গেছে যখন ওরা নারাণাপ্পার বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলো। মড়া পচা গন্ধটা তখন আর পাওয়া যাচ্ছিল না। নেশার ঘোরে ওরা তা বুঝলো না। নাকে কাপড় চেপে ওরা ওপরের দোরগোড়া অব্দি পৌছালো। তারপর দরজা ঠেলে শ্রীপতি টর্চ জ্বাললো। কোথায় মড়া? সকলে একবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো। তারপর ভয় ধরলো ওদের। ফিসফিস করে নাগরাজ বলে উঠলো।—নারাণদা বোধহয় ভূত হয়ে চলে গ্যাছে রে! আতঙ্কে অসাড় হয়ে সবাই সে কথা শুনলো। তারপরই মদের বোতলের থলিটা নামিয়ে রেখে ওরা প্রাণভয়ে দৌড়োল।

পাগলী বুড়ি লক্ষ্মীদেওম্মা অনেকরাত অব্দি জেগে বসেছিল। এক সময় উঠে দাঁড়ালো। কর্কশ আওয়াজ করে কাঠের দরজা খুললো। তারপর বাইরে বেরোল। ওরা পাঁচজনা তখন প্রাণভয়ে দৌড়োচ্ছিল। ওইভাবে ওদের দৌড়ে পালাতে দেখে চিৎকার করে উঠলো লক্ষ্মীদেওম্মা।

—হেই গো! তোমরা ছ্যাখো গো। ছ্যাখো, ভূত পালাচ্ছে, ভূত। তারপরই উৎকট শব্দে লম্বা হেঁচকি তুললো—হীঃ!

৩

অগ্রহারের ব্রাহ্মণদের নিতান্ত দুঃসময় চলছে। অনেক রাত অব্দি অপেক্ষা করলো তারা। কিন্তু প্রাণেশাচার্য ফিরলেন না। তখন তারা দরজা জানলায় কুলুপ এঁটে নাকে কাপড় বেঁধে ঘুমোবার চেষ্টা করলো। নাকে লেগে থাকা পচা গন্ধটা আর যেন সইতে পারছে না। মনে হচ্ছে এই বুঝি বমি হয়ে যাবে। আতঙ্ক আর খিদে—যুগপৎ আক্রমণ করছে তাদের। ঠাণ্ডা মেঝের ওপর গড়াগড়ি খেতে খেতে ওরা এই আক্রমণ ঠেকাবার চেষ্টা করছিল। নিশুতি রাতে অগ্রহারের চেহারাটাই কেমন যেন পাল্টে গেছে। ঠেলাগাড়ির চাকার শব্দ—লক্ষ্মীদেওম্মার বিলাপ আর বিচ্ছিরি আওয়াজের হেঁচকি—সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা ভূতুড়ে পরিবেশ। যেন ছেড়ে চলে গেছে সবাই। ভগবানও। শুধু ওরা ক'জন আপন আপন দুর্ভাগ্য নিয়ে পড়ে আছে এখানে।

প্রতিটি ঘরে বাবা মা ছেলে মেয়ে নিয়ে একটা আকারহীন জড়পিণ্ড হয়ে পড়ে আছে। ভয়ে আতঙ্কে তিরতির করে কাঁপছে। ভরসা পেতে একে আর একজনের কাছে যাচ্ছে। কিন্তু কে কাকে ভরসা দেবে। সবারই তো সমান অনিশ্চিত অবস্থা। অবশেষে দুঃস্বপ্নের রাত একসময় শেষ হলো। ভোরের আলো বরগার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে। একটু সাহস পেল সবাই। উঠলো। ধীরে ধীরে দরজা খুললো। বাইরে তাকিয়েই ওরা স্তম্ভিত। ওকি! চমকে উঠেছে সবাই। ঘরের ছাতে ছাতে সারি দিয়ে বসে আছে শকুন। এত গৃধ্র! গলা পচা মড়া নিয়ে এবার শুরু হবে টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি। সকলে মিলে চিৎকার করলো। হাততালি দিলো। কিন্তু শকুনগুলো একটুও নড়লো না। এবার সবাই মিলে শাঁখ বাজালো। কাঁসর পেটালো। সত্যিই সকলের মন দমে গেছে তখন।

সবে ভোর হয়েছে। কাঁসর, ঘণ্টা আর শাঁখের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে প্রাণেশাচার্যর। সবে তো দ্বাদশী। তবে কেন এই কাঁসর ঘণ্টার সোরগোল?

দ্বিধাগ্রস্ত মনে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বিহ্বল ভাবটা কাটাবার জন্যে ঘরবার করতে লাগলেন।—'কি করি'। 'কি করি'! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ স্ত্রীর কাতরানি কানে এলো। ছুটে গেলেন খাবার ঘরে। ওষুধ ঢালতে গিয়ে খানিকটা চলকে পড়ে গেল। স্ত্রীর ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ওষুধটা ঢেলে দিলেন আচার্য। চেয়ে থাকলেন রুগ্না স্ত্রীর যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে। অভিব্যক্তিহীন অসহায় দৃষ্টি। সকলের বোঝা হয়ে পড়ে আছে এক-কোণে। একান্তভাবে নির্ভর করে আছে তাঁর উদারতার ওপর। কর্তব্য-কর্মে তিনি উদাসীন নন। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি সেটাই কি তাঁর একমাত্র কর্তব্য? মনে হলো তিনি যেন দুঃস্বপ্ন দেখছেন। আর সেই দুঃস্বপ্নের মধ্যেই তাঁর পায়ের নিচে থেকে সরে যাচ্ছে মাটি। দ্রুতবেগে তিনি নেমে যাচ্ছেন অতলে।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে যে সম্পর্ক বজায় রেখে তিনি চলেছেন সেটা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নয়, ডাক্তার-রুগীর। প্রেম ভালবাসা আর টিঁকে নেই ওদের এই সম্পর্কে। তিনি উদার। তাই করুণা করেন স্ত্রীকে। এ কথা মনে হতেই শরীরে কাঁপন লাগলো তাঁর। একটা বমিবমি ভাব গুলিয়ে উঠছে শরীরে। নাকে লেগে রয়েছে পচা গন্ধটা। একটা কৃত্রিম ধর্মাচার দিয়ে সম্পর্কটা জিইয়ে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। এতেই যেন তাঁর অধিকার। একটা শিশু বানর গাছের একটা ডাল থেকে আর একটা ডালে লাফা-লাফি করতে করতে যেমন হঠাৎ হাত ফসকে পড়ে যায়, তিনিও তেমনি তাঁর সেই সযত্ন লালিত অধিকার থেকে চ্যুত হয়েছেন। সব অবলম্বন হারিয়ে গেছে তাঁর।

একি তাঁর কর্তব্যবোধ না ধর্মবোধ—যা দিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটা এত কৃত্রিম করে বজায় রেখেছেন? কি দিয়েছেন, দিতে পেরেছেন এই রুগ্না মুমূর্ষ রমণীকে? ভিক্ষুরমণীর দীনতা নিয়ে কোনো রকমে বেঁচে আছে বেচারি। তাঁর কৃপাপ্রার্থী হয়ে। এ ধর্মবোধের কীই বা দাম? কতটুকুই বা তাঁকে পথ দেখাতে পেরেছে? আজও তিনি তা জানলেন না। যখন তাঁদের বিয়ে হয়েছিল তখন তাঁর বয়স ষোলো আর ভগীরথীর বারো। আচার্য ভেবেছিলেন বিয়ে করলেও বিবাহিত জীবন তিনি বেছে নেবেন না।

ত্যাগ আর সংযমের জীবন যাপন করবেন। পরে একসময় প্রব্রজ্যা নিয়ে সংসার ত্যাগ করবেন। এ-ই ছিল তাঁর আদর্শ। ছেলেবেলা থেকে এই সংকল্প নিয়েই বড় হয়েছেন। তাই তো চিররুগ্না ভগীরথীকে বিয়ে করতে একটুও দ্বিধা হয় নি তাঁর।

বিয়ের পর যুবতী বউকে তার বাপের কাছে রেখে তিনি গেলেন কাশী। ভালো করে বেদান্ত দর্শন বুঝলেন। ফিরে এলেন মন তৈরি করে। এসে যেন এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়ালেন। আসক্তি, আনুগত্য, বন্ধন, মায়া —সব কাটিয়ে সংসার করতে হবে তাঁকে। তাই তো ঠাকুর তাঁর ওপর রুগ্না স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব দিয়েছেন। প্রাণেশাচার্য মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন সেবা—সেবাধর্মের মধ্যেই তাঁদের দাম্পত্য জীবনযাপন করবেন। এতদিন সেইভাবেই কাটিয়ে এসেছেন। নিজের হাতে স্ত্রীর পথ্য রেঁধেছেন। তাকে খাইয়েছেন যত্ন করে। পোশাক বদলে দিয়েছেন। রোগের পরিচর্যা করেছেন। আনন্দ পেয়েছেন এ কাজে। অনাবিল আনন্দ। এর মধ্যেই সময় করে ঠাকুরের নিত্য পুজোর যোগাড় করেছেন। ব্রাহ্মণদের ডেকে এনে রামায়ণ, মহাভারত আর গীতা উপনিষদের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। কৃপণ যেমন করে পয়সা জমায় তেমনি সংযমে জীবনধারণের প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্র তা মেনে চলেছেন। হাতে জপমালা নিয়ে লক্ষবার গায়ত্রী জপেছেন। লক্ষ থেকে নিযুত কোটিতে গিয়ে পৌঁচেছে এই মন্ত্রোচ্চারণ। মনে ভেবেছেন কৃচ্ছ্র সাধনের কঠিন পথেই পাপক্ষালন হবে। তিনি মুক্তি পাবেন। পুণ্যফল যা কিছু অর্জন করবেন—সবই আসবে প্রায়শ্চিত্তের কঠিন পথে।

পুণ্যফল! মুক্তি! মনে পড়লো একবার এক স্মার্ত পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছিলেন এই নিয়ে।

—আপনি বলেন, যে সৎ ; যে ভালো সে-ই শুধু মুক্তি পাবে। আপনার এ ধারণার মধ্যে কি আশাভঙ্গতা ফুটে ওঠে না? কামনা করে যখন তা পাওয়া যায় না, তখন মানুষের মন আশাহত হয়।

উত্তরে তিনি বলেছিলেন।

—তা কি করে হয়! জীবন যাপনে যারা সৎ নয়, ভালো নয় তারা তো

মুক্তি খোঁজে না! আর খোঁজে না বলেই তারা হতাশও হয় না। জোর করে কেউ বলতে পারে না—আমি ভালো হবো। বরং এটুকু বলা যায় আমি ভালো। আর তারাই শুধু ঈশ্বরের দয়া করুণার প্রত্যাশী হয় যারা সৎ আর ভালো। আচার্য মনে করতেন—'আমি ভালো!' রুগ্না, অসমর্থ স্ত্রীর ওপর তাঁর ভালবাসা, প্রেম—তার প্রতি করুণা-নিষ্ঠার সঙ্গে তার রোগের সেবা—এই সবই প্রমাণ করে যে তিনি সৎ, ভালো। যজ্ঞেতে যেমন বলি নৈবেদ্য দিতে হয় তেমনি মুক্তির বেদীতে এই নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন তিনি। নারাণাপ্পার কথা মনে পড়লো। তাঁর জীবনপথে হঠাৎই এসে পড়েছিল এই নরাধমটা। বোধহয় ভালোই হয়েছিল। তাঁর 'ভালো' থাকার পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পুরোনো বিশ্বাস আর প্রত্যয়গুলো কেমন যেন নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় ষোলো বছর আগে যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানেই আবার ফিরে এসেছেন তিনি। মুক্তির পথ হারিয়ে গেছে। খুঁজে পাচ্ছেন না। কোথায় সেই পথ? কে চিনিয়ে দেবে তাঁকে? অথচ ঠিক পথটি তাঁকে চিনে নিতেই হবে। নতুবা যে পাতালের অন্ধকারে তিনি নিমজ্জিত হবেন!

খানিকটা বিহ্বল হয়েই তিনি কোলে নিলেন স্ত্রীকে। এ-কাজ প্রতিদিনই করেন। কিন্তু আজ যেন বিরক্তি আসছে। ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। স্নানের ঘরে নিয়ে এলেন স্ত্রীকে। মাথায় জল ঢালতে গিয়ে থমকে গেছেন। হঠাৎ যেন নতুন করে স্ত্রীকে দেখলেন। এই নারী তাঁর স্ত্রী! কিন্তু কোথায় এর নারীত্ব? বসা চ্যাপটা বুক। অস্বাভাবিক চওড়া নাকের পাটা। সরু একহারা চুলের বেণী। পুরুষকে বশ করার এই কি তার সব সম্পদ! বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলেন আচার্য। শুধু স্ত্রী নয়। সকলের ওপর। মনে হলো 'থামাও থামাও' বলে চিৎকার করে ওঠেন। ব্রাহ্মণরা তখন মহোৎসাহে শাঁখ আর কাঁসর বাজিয়ে গৃধ্র তাড়াবার চেষ্টা করছিল।

জীবনে এই প্রথমবার সুন্দর আর কুৎসিতের তফাৎ বুঝলেন আচার্য। এতকাল সুন্দর কোনো কিছুর ওপর আলাদা মোহ তাঁর ছিল না। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত পড়েছেন। পড়তে গিয়ে কত সুন্দর জিনিসের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। সেগুলো কখনো পৃথকভাবে তাঁর মনে দোলা

জাগায় নি। ফুলের বুকে কত সুগন্ধ। কত সৌরভ তাকে ঘিরে। কখনও সাধ হয় নি সেই সৌরভের ঘ্রাণ নিতে। বরং ঠাকুরের মাথায় গুঁজে দিয়েছেন সেই সুরভিত ফুল। চক্ষু সার্থক হয়েছে। ভেবেছেন—আহা! মরি মরি! কি সুন্দর! নারীর রূপ আলাদা করে ভাবতে পারেন নি কখনও। সব নারীই তো লক্ষ্মীস্বরূপিণী। বিষ্ণুর বাঁ দিকে আলো করে বসে আছেন। মাঝে মাঝে তীব্র মিথুনাসক্তিতে যখন বিহ্বল হতেন তখন জোর করে ভাববার চেষ্টা করতেন—কেন এই আসক্তি? সম্ভোগ সুখের অধিকার তো শুধু কৃষ্ণের! গোপ নারীদের বস্ত্র হরণ করে শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ সে তো তাঁরও সুখ! কিন্তু আজ হঠাৎ এতকালের সেই পুরনো ধারণাগুলো বদলে গেল। মনে হলো এতকাল তিনি বঞ্চিত ছিলেন। নতুন করে সব পেতে হবে তাঁকে। পরিপূর্ণ ভোগ করার সব অধিকার তাঁরও আছে।

স্ত্রার গা থেকে জল মুছিয়ে তাকে এনে শুইয়ে দিলেন আচার্য। তারপর বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। শাঁখ আর কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ হঠাৎ থেমে গেল। আর সেই অসীম নৈঃশব্দে তাঁর মন ডুব দিলো জলের অতলে। যেন কানে এসে লাগলো নদীর কুলুকুলু ধ্বনি। নিজের মনের গভীরে তাকালেন আচার্য। মনে মনে বললেন—কেন? কেন? কেন এলেন বারান্দায়? চন্দ্রীকে দেখতে? কিন্তু কোথায় সে? সে তো এখানে নেই? তাঁর মনে হলো এই এক নারী—যে তার পুষ্ট স্তনের ওপর তাঁর হাত চেপে ধরেছিল। আর এক নারী, তাঁর চিররুগ্না স্ত্রী। তাঁর জীবনে এসে পড়েছে এই তুই নারী। এরা তু'জনেই যদি ছেড়ে চলে যায় তাঁকে? শূন্যতাবোধে ছেয়ে গেল আচার্যর মন। মনে হলো তিনি বোধহয় অসহায় হয়ে পড়বেন।

শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণরা শিকারী শকুনগুলোকে তাড়াতে পারলো। কিন্তু এই সাফল্যে খুব আনন্দ হলো না তাদের। মরা মানুষের মতন মুখ নিয়ে তারা সবাই এসে জড়ো হলো প্রাণেশাচার্যর বারান্দায়। নিঃশব্দে চেয়ে রইলো তাঁর দিকে। একটি একটি করে মুহূর্ত কেটে যেতে লাগলো। কিন্তু আচার্য নিঃশব্দ। একটু যেন দ্বিধাগ্রস্তও। ওরা ভয় পেল মনে মনে। তবে কি?

আচার্যও চেয়েছিলেন ওদের দিকে। মূঢ় মানুষগুলো তাঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বসে আছে বিধানের অপেক্ষায়। ওদের ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখার সব দায়দায়িত্ব তাঁর ওপর চাপিয়ে দিয়ে ওরা নিশ্চিন্ত। ওরা জানে তিনিই ওদের পথ দেখাবেন। কিন্তু কোন্ সে পথ ? আর তিনিই বা কে ? তবে শুধু অনুতাপ নয়। মুক্তির একটা তরল ইচ্ছা তাঁকে ঘিরে ধরেছে। মনে ভাবলেন ওদের ডেকে বিনীতভাবে বলেন—ওহে ! আমিও তোমাদের মতন লোভ কামনা ভয় ঘৃণার আকর হয়ে বসে আছি। আমায় কেন তোমাদের মুক্তিদাতা ভাবছ ? চন্দ্রীকে ডাকো। তার মুখ থেকেই শোনো। সেই বলবে আমি কেমন মানুষ ! সত্যি সত্যি চারপাশে তাকালেন আচার্য। কোথায় চন্দ্রী ? কোথাও দেখা গেল না উর্বশীকে। সে চলে গেছে।

ভয় পাচ্ছিলেন আচার্য। স্পষ্ট করে স্বীকারোক্তি করতে ভয় হচ্ছিল তাঁর। কি করে বলবেন যে নারাণাপ্পার মতন তিনিও চন্দ্রীকে ভোগ করেছেন ! হাতের চেটো ঘামতে লাগলো। অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা হয়ে গেল হাত। জীবনে প্রথমবার মিথ্যা ভাষণের প্রয়োজন বোধ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন নিজের সম্মান বাঁচাতে কেন মানুষ মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এই ছলনার আশ্রয়টুকু তাঁকেও নিতে হবে। নইলে সকলের কাছে বড্ড ছোটো হয়ে যাবেন তিনি। সম্মানের চূড়ো থেকে প্রয়াত হবেন। কিন্তু কেন ? মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন—শাস্ত্রের দোহাই পাড়ছিলেন। যাতে সাহসটুকু ফিরে পান। বলতে পারেন—আমি পাপী।

আমার চিন্তাভাবনা, আমার কর্মে পাপ ঢুকেছে। আমার আত্মা, আমার জন্ম অশুচি। আবার মনে হলো সত্যিই কি তিনি পাপ করেছেন ? আত্মা তো অশুচি হয় না ? আত্মা মুক্ত। আত্মা অসঙ্কোচ। শিশুর মতন। মাতৃস্তনে হাত রেখে শিশুর মনে কোনো বিকার জন্মায় না। সে নিঃসঙ্কোচ। আচার্যও তেমনি অপাপবিদ্ধ। চন্দ্রীর স্তন স্পর্শ করে তাঁর মনে কোনো বিকার জন্মায় নি। মনে হয় নি যে তিনি পাপ করেছেন।

চন্দ্রী কাছাকাছি না থাকায় অনেকখানি স্বস্তি বোধ করলেন আচার্য। মনে হচ্ছে মেয়েটা না থাকায় ভালোই হয়েছে। অবচেতন মনের যে ভাবনা তার সঙ্গে চেতন মনের ভাবনার কোনো মিল নেই। কারণ জীবনটা অক-

পট সরলরেখায় চলে না। জীবন জটিল। জটিল এবং দুঃখময় এই জীবন-চক্রের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছেন তিনি। জীবনের এই এক দিক। আর একদিক হলো কামনার কাছে ফিরে যাওয়া। চন্দ্রীর আশ্লেষ আলিঙ্গ-নের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে দুঃখময় বিষাদময় কর্মচক্র থেকে পালিয়ে আসা। কর্মময় জীবন। কামনাময় জীবন। কামনাকে তিনি ত্যাগ করলেও কামনা তাঁকে রেহাই দেবে না।

নিঃসঙ্কোচ, অকপট সত্য স্বীকারোক্তি করতে পারলেন না আচার্য। মনে দারুণ কষ্ট হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ঠাকুর ঘরে চলে গেলেন। রোজকার মতন খানিকটা অভ্যাস বশে দেবদেবীদের স্মরণ করলেন। যা সত্য তাকে স্বীকার করতেই হবে। নতুবা পুড়ে পুড়ে সত্য ছাই হয়ে যাবে। তখন মারুতিদেবের সামনে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্কোচে ঠাকুরের চোখের দিকে তাকাতে পারবেন না। এমন কি মুমূর্ষু স্ত্রীর সামনেও নিজেকে ছোট মনে হবে। ঠাকুর! এ সংকট থেকে আমায় মুক্তি দাও! চন্দ্রী কি ফিরে এসেছে? সে ফাঁস করে দেবে না তো সব? মনে মনে ভয় ভাবনা নিয়ে ঘর থেকে বেরোলেন আচার্য। ব্রাহ্মণরা তখন অপেক্ষায় বসে। গৃধ্রের দল আবার ফিরে এসেছে। ঘরের চালার ওপর আবার তারা সারি দিয়ে বসে পড়েছে। আচার্য চোখ বুজলেন। অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। একটা লম্বা শ্বাস নিলেন। মনে হচ্ছিল সাহস সঞ্চয় করছেন তিনি। একসময় চোখ খুলে সকলের দিকে তাকালেন।

—আমাকে ক্ষমা করো তোমরা। মারুতিদেবের কাছে ব্রাত্য হয়ে গেছি আমি। কোনো নির্দেশই আমায় তিনি দেন নি। এখন তোমরা যা ভালো বোঝো করো। আমার দিকে চেয়ে বসে থেকো না।

সবাই স্তম্ভিত। হায়! হায়! এ কি বললেন আচার্য? গরুড়াচার্য ছি ছি করলো। দাসাচার্যর এখন নতুন উৎসাহ। মাত্র আগের দিন রাত্তিরেই একপেট খেয়ে এসেছে সে। গলার স্বরে নতুন বল। জোর দিয়ে চেঁচিয়ে বললো।

—তাহলে আমাদের এখন কি করা উচিত?

কেউ কথা বললো না। দাসাচার্য আবার বললো।

—তাহলে এক কাজ করা যাক। চলো সবাই মিলে কৈমারে যাই। অগ্রহারাচার্য পণ্ডিত শুভানাচার্যকে জিজ্ঞেস করি। আমাদের আচার্য যে বিধান দিতে পারলেন না তিনি যে তা দিতে পারবেন, তা নয়। তবে যদি পারেন। অন্যথায় আমরা মঠে যাব। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করবো। আর কতকাল এইভাবে বাসি মড়া আগলে বসে থাকব আমরা! এ কদিন এক দানা অন্ন, একবিন্দু জল—কিছুই পেটে পড়ে নি আমাদের।

নিঃশব্দে সবাই মাথা নাড়লো। সকলের প্রতিক্রিয়া দেখে দাসাচার্য আবার বললো।

—মঠে গেলে গুরুদর্শনের সুযোগ পাব আমরা। তাছাড়া আমরা যেদিন মঠে পৌঁছবো সেদিন ত্রয়োদশী। শুভদিনে অনেকেই পূজো দিতে আসবে। তাহলে ওই কথাই ঠিক রইলো। আমরা প্রথম যাব কৈমারে। সেখানে আমাদের প্রথম কাজ হবে উপবীতগুলো বদলানো। অপবিত্র হয়ে গেছে এগুলো। তারপর সেখানকার ব্রাহ্মণরা যদি প্রসাদ দেন তাহলে সেই প্রাসাদী অন্ন মুখে দেবো। তাতে কোনো অন্যায় নেই। আমরা তো এখানে বসে ভাত খাচ্ছি না! তোমরা কি বলো?

সকলেই সায় দিলো। ঠিক কথা। ঠিক কথা। লক্ষ্মণাচার্যর মনে পড়লো ভেঙ্কন্নাচার্যর কথা। তিনি শতখানেক পাতার ঠোঙা কিনবেন বলেছিলেন। আর হাজারখানেক শুকনো পান পাতা। ভালোই হলো। সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে সে। গরুড়াচার্যের মনে হলো গুরুদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষা তার অনেক দিনের। ভালোই হলো—এই ফাঁকে দর্শনলাভও হয়ে যাবে। প্রাণেশাচার্যর বুক থেকেও একটা বোঝা যেন নেবে গেল। মনে মনে ঢের স্বস্তি পেলেন তিনি। অনেকখানি ক্লান্তি যেন কেটে গেল তাঁর।

দাসাচার্যও খুশি। তার প্রস্তাব মেনে নিয়েছে সবাই। তবে আরও একটা সমস্যা আছে। সকলের দিকে সে তাকালো।—আমাদের ব্যবস্থা তো হলো। কিন্তু ব্রাহ্মণীদের, ছেলেমেয়েদের কি হবে? সব কাজ শেষ করে এখানে ফিরতে দিন তিনেক সময় নেবে। সেই ক'টা দিন ওরা না হয় বাপের বাড়িতেই গিয়ে থাকুক।

দাসাচার্যর শেষ প্রস্তাবটা মেনে নিল সবাই।

৪

মনে মনে শাপশাপান্ত করতে করতে দুর্গাভট্ট ফিরলো। এই মাধ্বী বামুন-গুলো স্রেফ বেজন্মা। এদের সঙ্গে বাস করতে করতে তার নিজের মন-টাও ছোট হয়ে যাচ্ছে। গজগজ করতে করতে ঘরে ফিরে দুর্গাভট্ট বলদ-গাড়ি জুততে বসলো। তারপর ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চললো। অন্যরাও যাত্রার আয়োজন করছিল। লক্ষ্মণাচার্য কলাপতার ঠোঙাগুলো গুছিয়ে নিল। আরও খানিকটা চিঁড়ে সঙ্গে নিল দাসাচার্য। বলা যায় না—পথে দরকার পড়তে পারে। লক্ষ্মীদেওম্মাও তৈরি। লক্ষ্মণের সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সে উঠবে। খানিক পরে সবাই মিলে এসে জড়ো হলো প্রাণেশাচার্যর বাড়ির উঠোনে। প্রাণেশাচার্য সবিনয়ে বললেন—আমার ব্রাহ্মণী বড় অসুস্থ। আমি তাকে ফেলে তো তোমাদের সঙ্গে যেতে পারবো না ভাই। ওরা আর দাঁড়ালো না। আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই তাদের। এমন কি শকুনের দুশ্চিন্তাটাও মন থেকে ততক্ষণে ঝেড়ে ফেলেছিল ওরা। দুপুরের রোদ মাথায় করেই বেরিয়ে পড়লো সবাই। কৈমারায় যখন এসে পৌঁছালো তখন সন্ধ্যে। বাতাস বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ততক্ষণে। ওরা স্নান করলো। নতুন পৈতে পরলো। হাতে গায়ে চন্দন বাটা মাখলো। তারপর শুভানাচার্যর বারান্দায় এসে বসলো। পণ্ডিত আদেশ করলেন—তোমরা আগে কিছু খেয়ে নাও। তারপর কথা বলবো। অভুক্ত, হতভাগ্য ব্রাহ্মণরা ঠিক এই আদেশটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল। তাড়াতাড়ি করে আকণ্ঠ পরিমাণ খেলো গরম গরম ভাত আর সরু। এতক্ষণে মহাপ্রাণী বুঝি শান্ত হলেন।

দু'একদিন অভুক্ত থাকার পর ভরপেট খাওয়া শেষে একটা সুখকর ঢুলুনি আসে। শুভানাচার্যর চারপাশে বসে ওরাও সেই আমেজে ঢুলছিল। শুভানা-চার্য তখন মাটিতে আঁক কষে, পঞ্জিকার পাতা উল্টে দেখছিলেন নারাণাপ্পার মৃত্যুক্ষণটিতে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান কেমন ছিল। হঠাৎ একসময় বলে উঠ-

লেন।—প্রতিকূল। দৃষ্টি কুপিত।

তারপর সকলের উদ্দেশে বললেন।

—ছাখো বাপু—প্রাণেশাচার্য যা পারেন নি—আমি কেমন করে সে বিধান দিই।

একথায় মনে মনে খুশি হলো দাসাচার্য। অযথা সময়ক্ষেপ না করে তখনই মঠের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবে তারা। সামনেই মহোৎসব। মঠাচার্যর উদ্দেশে তারাও পুজো দিতে পারবে।

কৈমারের মানুষজন কিন্তু সে রাত্তিরে যেতে দিলো না!

—তাই কখনও হয়! আজ রাতটা কাটিয়ে কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়ো তোমরা।

কিন্তু ভোরের দিকে দাসাচার্য শয্যা ছেড়ে উঠতে পারলো না। সবাই চেষ্টা করলো অনেক। ঘোরের মধ্যে ছিল দাসাচার্য। গায়েও বেশ উত্তাপ। গরুড় বললো।

—অজীর্ণতা-জনিত জ্বর। এমন কিছু নয়। কাল মরা পেটে যা খেয়েছে তা পরিপাক হয় নি।

সবাই দুঃখিত হলো। দাসাচার্যর ভাগ্যে আর উৎসব দেখা হলো না। কিন্তু তাই বলে ওর আরোগ্য অব্দি অপেক্ষাও করা যায় না। তাই সামান্য আলো ফুটতেই মুখ হাত ধুয়ে সামান্য চিঁড়ে খেয়ে ওরা যাত্রা শুরু করলো। দীর্ঘ কুড়ি মাইল পথ ওরা হাঁটলো। তারপর সময় যখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাতের দুয়ারে ঘা দিচ্ছে ওরা পৌঁছালো আর এক অগ্রহারে। খাওয়া-দাওয়া সেরে সেখানেই রাতটা কাটালো। পরদিন যাত্রা শুরুর আগে ওরা আবার হায় হায় করে উঠলো। আর একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে তখন। পদ্মনাভাচার্য। ওরা ভাবলো নিশ্চয়ই পথশ্রম আর ক্লান্তির জন্যেই এই অসুস্থতা। পদ্মনাভাচার্যকেও ফেলে যেতে হলো। এখনও দশ মাইল হাঁটতে হবে। তাই ভোরে উঠেই যাত্রা শুরু করলো ওরা। মঠে গিয়ে যখন পৌঁছালো তখন বেলা দুপুর। উপাসনার জন্যে বড় ঢাকটা পেটানো হচ্ছিলো তখন।

৫

সারা অগ্রহারে মানুষ বলতে রইলো শুধু ওরা দু'জন—প্রাণেশাচার্য আর তাঁর রজস্বলা স্ত্রী ভগীরথী। আর থাকলো কাক, শকুন। বাড়িঘরে খাঁ খাঁ করছে শূন্যতা। কাঁসর ঘন্টার শব্দ নেই। দেবারাধনা নেই। সারা গ্রামখানা জুড়ে কেমন যেন অপ্রাকৃত এক স্তব্ধতা। খান সাত বাড়ি পরেই পচেছে সেই বাসি মড়া। পচা গন্ধে জ্বালা করছে নাক। উৎকট শব পচা গন্ধ। পাক দিয়ে উঠছে শরীর। বাড়িগুলোর মাথায় শকুনের ডানা ঝটপটানি। সব মিলিয়ে এমন এক অপ্রাকৃত অবস্থা যা ভোলা যায় না।

ঠাকুর ঘরে যাবার মুখে আচার্য দেখলেন একটা বড় ইঁদুর পেট উল্টে ডান-দিক থেকে বাঁদিকে ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। একসময় থমকে গেল ইঁদুরটা। তারপর নিঃশব্দে মরে গেল। প্রাণেশাচার্য তাড়াতাড়ি মরা ইঁদুরের লেজটা ধরে ছুঁড়ে দিলেন একটা শকুনের দিকে।

কাক আর শকুনের অশুভ ডাকাডাকিতে প্রাণেশাচার্য বাইরে এসে দাঁড়ালেন। মধ্যদিনের দুঃসহ রোদের তাত। তার ওপর এই বীভৎস স্তব্ধতা। অসহ্য মনে হচ্ছিলো তাঁর। বার দুয়েক শকুনগুলো তাড়াবার নিস্ফল চেষ্টা করে আবার ফিরলেন ঘরে। ইতিমধ্যে ক্ষুধাতৃষ্ণায় অসহ্য কাতর লাগছিল শরীর। ঘরের মধ্যে গোটা কয়েক পাকা কলা ছিল। সেগুলো ধুতির কোঁচায় বেঁধে নদী সাঁতরে স্নান সারলেন। একটা ছায়ায় বসে কলাগুলো খেলেন। ক্ষুৎপিপাসা যেন একটু কমলো। মনে পড়ে গেল সেই আঁধার রাতের কথা। কোল থেকে একটার পর একটা কলা নিয়ে চন্দ্রী তাঁকে দিচ্ছে। আর তিনি খেয়ে চলেছেন।

সেদিন কি মেয়েটাকে করুণা করেছিলেন তিনি! হয়ত তাই। তাঁর নারী-দেহ বঞ্চিত মনে যে বুভুক্ষা—তা যেন দয়া, অনুকম্পা, ন্যায় নীতিবোধ, ইত্যাদির মধ্যে একটা পরিণতি পেতে চেয়েছিল মাত্র। কিন্তু যে মুহূর্তে চন্দ্রীর যুবতী স্তনে হাত পড়লো সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘুমন্ত জন্তুটা দাঁত বার করে

লাফিয়ে উঠলো। মনে পড়লো নারাণাপ্পার কথা। সে বলেছিল—দেখা যাক, আপনি না আমি, কে জেতে। আঁশটে গন্ধ নিয়েও কোনো মৎসগন্ধার তপ্ত আলিঙ্গনের হাতছানি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

নারাণাপ্পাকে প্রায়ই উপদেশ দিতেন তিনি। বলতেন:—আমাদের সব কাজেরই একটা বিপরীত ফল আছে জেনো। তখন ভাবতেন অগ্রহারের এই নৈতিক অধঃপতনের জন্যে দায়ী নারাণাপ্পাই। পরে মনে হতো—তাই কি? নাকি নারী পুরুষ সম্পর্কে তাঁর নিজের শুচিবাই এর কারণ? হয়ত তাই উল্টো ফল ফলেছে। তিনি শুনেছেন তাঁর মুখ থেকে শকুন্তলার রূপ-বর্ণনা শুনে এখানকারই একটা ছোঁড়া এক হরিজন যুবতী নিয়ে রাত কাটিয়ে এসেছিল একবার।

এক তীব্র কামজ সুখের অনুভূতির মধ্যে ওই অস্পৃশ্য মেয়েগুলোর কথা মনে পড়ছে। কে যেন তাঁকে তাড়না করে নিয়ে যাচ্ছে সেই সুখের দিকে। তাদের নগ্ন শরীরটা যেন ভেসে উঠলো চোখের ওপর। কে হতে পারে মেয়েটা? নিশ্চয়ই বেল্লী! ওই রকমই মাটি-মাটি শ্যামলা ওর স্তনের রঙ। স্তনের এমন নিটোল রঙ কখনো দেখেন নি আচার্য। মাটির গাঢ় উত্তাপ লুকিয়ে আছে ওই স্তনে। ভাবতে ভাবতে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো শরীর। কিন্তু এ-সব কি ভাবছেন তিনি! ছটফট করে উঠলেন আচার্য। ব্যঙ্গ করে নারাণাপ্পা বলতো—আপনার ব্রাহ্মণত্ব সাজানো; কপটাচার রয়েছে তার মধ্যে। বেদ উপনিষদ শাস্ত্রাদি পড়েন অথচ তার ভেতরের উত্তাপ পান না—এ-যেন ভাবতেই পারি না। বস্তুত তাঁর জ্ঞানান্বেষণ স্পৃহার মধ্যে একটা স্ফুলিঙ্গ আছে যা অপরের মূঢ়তাব মধ্যে ধরা পড়ে না। সেই পোষ মানানো কাম-নার বাঘটা আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। দাঁত বার করে ছুটে আসতে চাইলো।

এখন যেন একটা নতুন সুখকর অভিজ্ঞতার অন্বেষণে ছুটতে ইচ্ছে করছে তাঁর। ইচ্ছে করছে বেল্লীর পুষ্ট দুই স্তনের ওপর চাপ দিতে। হ্যাঁ। ঠিক এইরকমই কামনা—যা আগে তাঁর জীবনে আসে নি। জীবন ধারণের দৈনন্দিনতার মধ্যে যা কখনও ভাবেনও নি। গায়ত্রী জপ দিয়ে যে প্রাত্য-হিকতা শুরু—সেই প্রথাবদ্ধ জীবনযাপনের মধ্যে এমন অভিজ্ঞতার সুযোগ

কোথায় ? অভিজ্ঞতা কুড়োতে গেলে নতুন নতুন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। যা আগে কখনো ঘটে নি অথচ ঘটলো—তাই অভিজ্ঞতা। যেন অপরিচিত বনভূমির দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করা। আগে ভাবতেন যা চাইছেন তা পাওয়াই হলো অভিজ্ঞতা। কিন্তু এ ধারণা ভুল। যা চিনি না, জানি না তার প্রতি দুর্বার মোহ, অনিবার্য আকর্ষণই বোধহয় অভিজ্ঞতা। যেমন প্রথম নারীদেহ স্পর্শের শিহরণ। ঈশ্বরানুভূতিও ঠিক এইরকমই অভিজ্ঞতার শিহরণ। বৃষ্টির জল পেয়ে নড়ে চড়ে ওঠে মাটি। বীজের শক্ত খোলার ওপর আলতো চাপ পড়ে উত্তপ্ত মাটির। একসময় দেখা যায় বাইরের খোলস ফেটে বেরিয়ে পড়েছে অঙ্কুর। আসল কথা হলো সাড়া। মাটির ডাকে সাড়া দেয় না যে বীজ সে শক্তই থেকে যায়। তারপর একসময় পচন ধরে বীজের। বেচারা নারাণাপ্পাও তেমনি এক শক্ত খোলস। সারা জীবনে একবারও ডাক শুনতে পেল না। এখন চেয়ে দেখো ! কেমন পচছে তার দেহটা। চন্দ্রীর দেহটা না ছোঁওয়া অব্দি বোধহয় আমিও এমনি শক্ত খোলস ছিলাম। নিজের অজান্তেই ইচ্ছে আর কামনার বিরুদ্ধে চলবার চেষ্টা করেছি। জোর করে কৃচ্ছ্র সাধন করেছি। দেহসুখ থেকে বঞ্চিত করেছি নিজেকে। শেষ পর্যন্ত চন্দ্রীর মধ্যেই মুক্তি পেয়েছে আমার কামনা। ঠিক এমনি ভাবেই ঈশ্বরানুগ্রহ কখন বৃষ্টিধারার মতন ঝরে পড়বে অজান্তে—হয়তো তখন চাইব না !

চন্দ্রী এখন কোথায় ? সে কি এখনও নারাণাপ্পার মড়া আগলে বসে আছে ? কিন্তু পচা গন্ধটা সইছে কি করে ? দুশ্চিন্তা হলো তাঁর। ডুব দিলেন নদীর জলে। আরও আরও গভীরে। তারপর সেই গহন শীতল জলে সাঁতার দিতে দিতে তাঁর মনে হলো আর উঠবেন না। সারা জীবনই ডুবে থাকবেন নদীর জলের গভীরে। যেমন থাকতেন ছেলেবেলায়। মনে পড়ল তখনকার কথা। মায়ের শাসন এড়িয়ে চলে আসতেন নদীতে। অনেকক্ষণ ধরে ঝাঁপাঝাঁপি করতেন জলে। তারপর জল থেকে উঠে বালুবেলায় শুয়ে গড়াগড়ি খেতেন। যখন বাড়ি ফিরতেন তখন সারা শরীর তেতে আগুন। জলে দাপাদাপির ব্যাপারটা মা বুঝতে পারতেন না। কি আশ্চর্য ! ছেলেবেলার সেই ইচ্ছেটাই আবার যেন পেয়ে বসলো তাঁকে। মনে ভাবলেন

অগ্রহারে আর ফিরবেন না। তাই সাঁতার কেটে উঠে বালুবেলায় পিঠ দিয়ে শুয়ে রইলেন। অচিরেই ঝরঝরে শুকনো হয়ে উঠলো শরীর। পিঠটা তখন যেন পুড়ে যাচ্ছে।

একটা কি মনে পড়তে উঠে পড়লেন আচার্য। জন্তুরা যেমন ঘ্রাণ নিতে নিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তেমনি গিয়ে পৌঁছলেন বনের সেই জায়গাটায়। হ্যাঁ। এই তো সেই জায়গা! এখানেই চন্দ্রীর সঙ্গে তাঁর শরীরের মিলন হয়েছিল। জীবনের অর্থ বদলে গিয়েছিল সেদিন থেকেই।
ভরদুপুরেও জায়গাটা ছায়াঘেরা। স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন আচার্য। তাঁর শরীরের ভর আর অবয়বের একটা অস্পষ্ট ছাপ যেন দেখতে পেলেন ভিজেভিজে ঘাসের ওপর। বসে পড়লেন আচার্য। বোকার মতন ঘাসের শীষ ছিঁড়ে তার ঘ্রাণ নিলেন। নাকে লেগে থাকা শব পচা গন্ধটা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। ঘাসের শীষের শেকড় আর ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে লাগছে—নেশার মতন মনে হচ্ছে। মুরগি যেমন খুঁটে খুঁটে খাবার খোঁজে তেমনি তন্নতন্ন করে তিনি যেন কিছু খুঁজছিলেন। হাতের কাছে যা পাচ্ছেন তাই টেনে টেনে তুলছিলেন আর ঘ্রাণ নিচ্ছিলেন। একটা গাছের ছায়ায় বসলেন। আঃ! বসেই মনে হলো একটা পরিপূর্ণতার তৃপ্তি পেলেন। এত দান প্রকৃতির! এই ছায়া, এই সবুজ প্রাণময়তা, এই তাপ, এই শীতল শান্তি—সব মিলিয়ে এক অকৃপণ পরিপূর্ণতায় ছেয়ে গেল মন। কিছু চাওয়া নয়—কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে হাঁকপাঁক করা নয়। পার তো সরিয়ে রাখ সব ব্যক্তিগত কামনাগুলো। এখন শুধু হাত পেতে প্রকৃতির এই অজস্র দান নিয়ে নাও।
সদ্য পাতা গজিয়েছে এমন একটা সালসা গাছের সঙ্গে হাতটা ঠেকে গেল। শিকড়সুদ্ধ গাছটাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করলেন আচার্য। লতানে গাছটার শিকড় কিন্তু অনেক গভীরে চলে গেছে। দুব্বো ঘাস তো নয়! এসব গাছের শিকড় মাটির অনেক গভীরে ঢুকে যায়। দু'হাতে অনেকক্ষণ টানাটামি করলেন। অবশেষে আধখানা শিকড়সুদ্ধ গাছটা উপড়ে এলো। ঘ্রাণ নিলেন। একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। মাটির নিচে আলো

বাতাসহীন পরিবেশের চাপা একটা মিষ্টি গন্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে যায়। যতবারই ঘ্রাণ নেন ততবারই মিষ্টি গন্ধটা নাকে লাগে।

গন্ধটা ভালো লাগছিল। লোভীর মতন অনেকক্ষণ বসে বসে ঘ্রাণ নিলেন। বেশ বুঝতে পারছিলেন নাকের মধ্যে গন্ধটা পাকাপাকি লেগে আছে। ধীরে ধীরে রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে লাগলো গন্ধটা। খুব ভালো লাগছিল তখন। কিন্তু খানিক পরেই হারিয়ে গেল গন্ধটা। তখন ভারি বিষণ্ণ বোধ করছিলেন আচার্য। শিকড়ওলা গাছটা একসময় সরিয়ে রাখলেন। বনের সেই বুনো গন্ধটা আবার নাকে লাগলো। একসময় বেরিয়ে পড়লেন বন থেকে। সামনেই ফুটে আছে অজস্র ঘন নীল অপরাজিতা ফুল। নীল-কান্তমণি। যেন কোনো অপার্থিব ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকা। আবার নদীতে নামলেন। নদীর সবচেয়ে গভীর দহ যেখানে সেখানে ডুব দিলেন। এখানে গলাজল। ছোট ছোট মাছগুলো তাঁর চারপাশে ঘুরে ঘুরে বিরক্ত করছে। কপাল, বুক, পায়ের গোড়ালি, বগলের তলা দিয়ে অবাধে নিঃশঙ্কভাবে চলাফেরা করছিল মাছের ঝাঁক। সুড়সুড়ি লাগছে তাঁর। যেন দুষ্টু ছেলের দুষ্টুমি। একবার যেন ঈষৎ বিরক্ত হয়েই বলে উঠলেন—আঃ! এইভাবে আরও খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে উঠলেন আচার্য। অনেকক্ষণ ধরে রোদ পোয়ালেন। হঠাৎ ভগীরথীর কথা মনে পড়লো। তাইতো! এখন যে ওর পথ্যের সময়! কথাটা মনে হতে একটুও দেরি না করে অগ্রহারের পথে হাঁটা দিলেন।

ফেরার পথে আবার সেই অশুভ দৃশ্যটা চোখে পড়লো। কাক আর শকুনের দল তেমনি বসে—কে যেন গালে চড় মারলো তাঁর। একটু উদ্বিগ্ন হয়েই ঘরে ঢুকলেন। ভগীরথীর মুখচোখ অস্বাভাবিক লাল। থমথম করছে জ্বরে। ওগো! শুনছো! ওগো!—বার দুই ডাকলেন। কোনো সাড়া মিললো না। জ্বরটা কি তাহলে বাড়লো? গায়ে হাত দিয়ে তাত পরীক্ষার উপায় নেই। ভগীরথী ঋতুমতি হয়েছে। রজস্বলা স্ত্রীর অশুচি দেহ স্পর্শের বিধান শাস্ত্রে নেই। তাহলে? নিজের ওপরেই বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলেন আচার্য। একসময় সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে আলতো ভাবে হাত রাখলেন স্ত্রীর কপালে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন চমকে সরে গেলেন। এতো

তাপ ! কি করবেন ভেবে না পেয়ে একখণ্ড ন্যাকড়া জলে ভিজিয়ে স্ত্রীর কপালের ওপর রাখলেন। কম্বলটা পাশে সরিয়ে রাখলেন। গায়ে হাত দিলেন। পেটের একটা পাশ যেন সামান্য ফোলা ফোলা। হঠাৎ মনে হলো নারাণাপ্পারও এই রোগ হয়েছিল ! মনে হতেই নিথর হয়ে গেল চেতনা। কোনরকমে উঠে গিয়ে ওষধির ঝোলা নিয়ে গেলেন। যত রকম ভেষজ জানতেন সবেরই নির্যাস জোর করে ঠোঁটের ফাঁকে ঢেলে দিলেন। কিন্তু কোনো ওষুধই গলা দিয়ে নামলো না।

পায়চারি করতে করতে আচার্য ভাবছেন—এ তাঁর কিসের পরীক্ষা ? ওদিকে তারস্বরে ডেকে চলেছে কাক আর শকুন। এক দিকে বায়সকুল আর গৃধ্রের ডাক, অন্যদিকে শব পচা গন্ধ। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিভ্রংশ হবার উপক্রম। সহ্যশক্তির ওপর এত চাপ আর যেন সইতে পারছেন না। একরকম দৌড়েই ছুটে এলেন পিছন দিকের উঠোনে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন খেয়াল হয় নি। একসময় দেখলেন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাক আর শকুনরা একে একে বিদায় নিলো। একটু যেন স্বস্তি পেলেন আচার্য। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। তখনি মনে পড়লো রুগ্না স্ত্রীর কথা। একা পড়ে আছে বেচারা। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে প্রদীপ জ্বাললেন। মাথার কাছে মুখটা নামিয়ে এনে ডাকলেন—ওগো ! শুনছো !

কোনো সাড়া নেই। উপরন্তু মনে হলো নৈঃশব্দ্য যেন আর্তনাদ করছে। গা ছমছম করে উঠলো তাঁর। হঠাৎ একটা হেঁচকি তুলে কেঁপে উঠলো স্ত্রীর দেহখানা। চমকে তাকালেন। আর অব্যক্ত একটা কান্না তাঁর অন্তরতম প্রদেশের অস্থিমজ্জা ভেদ করে উত্থিত হলো। শিউরে উঠলেন আচার্য।

একসময় মনে হলো নৈঃশব্দ্যের আর্তনাদ আর নেই। তার বদলে অবিচ্ছিন্ন একটা স্তব্ধতা—কালো রাত্রির ঘোর আঁধারের স্তব্ধতা। চকিত বিদ্যু-ল্লতার ক্ষণিক উজ্জ্বলতার পর যেমন অন্ধকার স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হয় পৃথিবী, ঠিক সেইরকম। সেই অসীম স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে একা থাকতে তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল। ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কি করছেন নিজেই জানেন না। ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছলেন নারাণাপ্পার ঘরে। চিৎকার করে ডাকলেন—চন্দ্রী ! চন্দ্রী ! কেউ সাড়া দিলো না। কেমন যেন ঘোর

লাগা মানুষ তিনি তখন। মধ্যিখানের ঘরে গেলেন। আবার সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার। তারপর রান্নাঘর। সেখানেও কেউ নেই। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছেন হঠাৎ যেন চৈতন্য ফিরে এলো। কোথায় চলেছেন? কি করতে চলেছেন? তিনি তো জানেন নারাণাপ্পা এখন পচে ফুলে ওঠা শব মাত্র—পড়ে আছে ওখানে! একটা অশরীরী ভয় পেয়ে বসলো তাঁকে। ঠিক যেমনটি ভয় পেতেন ছেলেবেলায়—অন্ধকার ঘরে একলা ঢুকতে। প্রায় দৌড়েই ফিরে এলেন বাসায়। স্ত্রীর কপালে হাত রাখলেন। বরফের মতন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শরীর।

প্রায় মাঝরাত নাগাদ কৈমারায় পৌঁছলেন আচার্য। হাতে লণ্ঠন। মুখে উদ্বেগ। সুবন্নাচার্যর বাড়িতে যখন পৌছলেন তখনই তারা চারজন ফিরে এলো। এইমাত্র দাসাচার্যর শব দাহ করে ফিরে এলো—মুখে হরিধ্বনি দিতে দিতে। ভিজে ধুতিগুলো সব ওদের মাথায় জড়ানো। আচার্য দেখলেন। তারপর সবাইকে নিয়ে অগ্রহারে ফিরে এলেন। স্ত্রীর শবদেহ নিয়ে শ্মশানে গেলেন। শাস্ত্রমতে শেষকৃত্য সম্পন্ন যখন হলো তখন সবে ভোর হয়েছে।
নিজেকে শোনানোর মতন করেই ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে বললেন।—আরও একটা মড়া এখনো পড়ে--সংকার হয় নি। কোন্ প্রথায় সংকার হবে তা স্থির করবেন মঠাধ্যক্ষ। তোমরা আর কদ্দিনই বা বসে থাকবে!
সবাই দেখলো আচার্য স্থির হয়ে স্ত্রীর পুড়ে যাওয়া দেহটার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁকে সেই অবস্থাতেই ফেলে গেল ওরা। আচার্যর দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ্রসাধনার সঙ্গী। নিছক শূন্যতার মধ্যেই কেটে গেল বেচারার জীবনটা। কিছুই পায় নি কখনও। তবুও দেহখানা ছিল। ছিল প্রাণটাও। এখন শুধু ছাই। একটা অব্যক্ত বেদনায় হু হু করে উঠলো মনটা। অবরুদ্ধ কান্নাটা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চেষ্টা করে তাকে থামালেন না। অনেক-ক্ষণ ধরে কাঁদলেন আচার্য। চোখের জলের ধারার সঙ্গে গলে গেল মনের সব বিষণ্ণতা।

৬

মঠে পৌঁছেই ব্রাহ্মণরা অশুভ ঘটনাটা জানালো না কাউকে। ভোজের আজ এলাহি ব্যবস্থা। সেটা ভালোয় ভালোয় মিটুক তারপর অন্য কথা। শান্তিজল নিয়ে খেতে বসে গেল সবাই। অনেক পদ রান্না। শেষ পাতে পায়সান্ন। গুরুদেব সব্বাইকে এক আনা করে দক্ষিণা দিলেন। লক্ষ্মণাচার্য ক্ষুণ্ণ হলো। মাত্র এক আনা! কৃপণটার না আছে সংসার না ছেলেমেয়ে। তবুও ছাখ টাকার ওপর কেমন লোভ মানুষটার। বলাবাহুল্য গেঁজের মধ্যে ততক্ষণে আনিটি চালান হয়ে গেছে।

খাওয়া দাওয়ার পর সবাই মিলে ঘিরে বসলো গুরুদেবকে। সিমেণ্ট বাঁধানো ঠাণ্ডা মেঝে। গুরুদেব মাঝখানে চেয়ারের ওপর বসলেন। পরনে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা। হাতে জপমালা। কপালে চন্দন। পা মুড়ে বসে নিজের ছোট ছোট পা ছু'খানি টিপছেন। গোল পুতুলের মতন আত্বরে আত্বরে দেখাচ্ছিল তাঁকে। একথা সেকথার পর জিজ্ঞেস করলেন।

—তোমাদের সঙ্গে তো প্রাণেশাচার্যকে দেখছি না? সে কি আমার আজ্ঞা শোনে নি? কেমন আছে সে?

গরুড়াচার্য তখন কেশে গলা সাফ করে আছন্ত সব কথা জানালো। মন দিয়ে শুনলেন গুরুদেব। তারপর ধীরে ধীরে বললেন।

—দেখ বাপু! নারাণাপ্পা অব্রাহ্মণ হবার যত চেষ্টাই করুক না কেন দ্বিজত্ব তাকে ত্যাগ করে নি। সুতরাং ব্রাহ্মণের মতোই শাস্ত্রমতে তার সৎকার হবে। তবে যেহেতু মনে তার অনেক প্রত্যবায় ছিল তাই একটা প্রায়শ্চিত্ত দরকার।

খানিক থেমে বললেন।—সৎকারের পর তার সমস্ত গহনা সম্পত্তি মঠে দান করে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করলেই যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হবে।

গুরুদেবের কথা শুনে গরুড়াচার্য বিমর্ষ হলো যেন। ধুতি দিয়ে মুখটা রগড়ে নিলো সে। তারপর সাহস সঞ্চয় করে বললো।

—গুরুদেব ! আপনি তো জানেনই, আমার পিতৃদেবের সঙ্গে নারাণাপ্পার একটুও বনিবনা ছিল না। আসলে ওই তিন'শ সুপুরি গাছ ছিল আমাদেরই ভাগে। ওটা আমারই প্রাপ্য।

গরুড়ের কথা শেষ না হতেই যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো লক্ষ্মণাচার্য। — এ কেমন ধারা বিচার গুরুদেব? আপনি তো জানেন—নারাণাপ্পা ছিল আমার ভায়রা। আমার আর ওর ব্রাহ্মণী—ছু'জনে সহোদরা। গুরুদেবের গোল মুখখানা রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠলো। হেঁকে উঠে বললেন।

—তোরা তো আচ্ছা অমানুষ! সম্পত্তির স্বত্ব নিয়ে বিরোধ করছিস! জানিস না, বেওয়ারিশ সম্পত্তি দেবোত্র হয়ে যায় — ঠাকুরের সেবায় নিয়োজিত হয়! তাছাড়া ওই বাসি মড়া সংকারের বিধান যদি না দিই—টি কতে পারবি অগ্রহারে গিয়ে?

ওরা ছু'জনেই লুটিয়ে পড়লো গুরুদেবের পায়ের ওপর।—অন্যায় হয়ে গেছে গুরুদেব! ক্ষমা করুন।

ওদের দেখাদেখি অন্যরাও গুরুদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলো। শুধু গুনড়াচার্যকে দেখা গেল না সে দলে। একান্তে শুয়ে পড়েছে সে। সারা গায়ে খুব জ্বর। কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা চলে না! গুরুদেবের বিধান যখন পেয়েছে তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নারাণাপ্পার সংকার করতে হবে। গুনড়াচার্যকে বাদ দিয়েই পথে নেমে পড়লো সকলে।

স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টির পর আর ফিরলেন না আচার্য। একবারও মনে পড়লো না ঘরেতে পড়ে থাকা জিনিসপত্তরের কথা। সোনার জরির কাজ করা খান পনেরো শাল আছে। আছে শ'ছুয়েক কাঁচা টাকা। আর সোনার সুতো দিয়ে গাঁথা জপমালা। দান স্বরূপ পেয়েছিলেন মঠাধ্যক্ষের কাছ থেকে। না, কোনো আকর্ষণই আর নেই। মন শুধু চাইছিল, যেদিকে ছু'চোখ যায়, হাঁটতে। তাই করলেন আচার্য। পুব দিক লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলেন।

তৃতীয় পর্ব

১

আর যেন পারছেন না প্রাণেশাচার্য। তবুও শরীরটাকে কোনো মতে টেনে নিয়ে চলেছেন। ভোরের প্রথম সূর্যালোক গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে মাটিতে পড়ে ঝিলমিল করছে। সেই আলোছায়া মাখামাখি পথে তিনি চলেছেন। কোথায় ? কে জানে! একসময় মনটা বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল সৎকারের পর স্ত্রীর দগ্ধাবশিষ্ট হাড় আর খানিকটা ছাই নদীর জলে ফেলে দিয়ে আসবেন। মনটা তাহলে শান্ত হতো। কে জানে, হয়ত এতক্ষণে শেয়ালকুকুরে দগ্ধাবশেষ অস্থি নিয়ে টানাটানি করছে। সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন।—কিছুই তো সঙ্গে নেওয়া যায় না। তিনিও তাই সঙ্গে নেন নি। সব ফেলে এসেছেন। কর্তব্য বলো, ঋণ বলো—কোনো কিছুই আজ তাঁর নেই। তিনি এখন মুক্ত।

মনে ভাবলেন সঙ্কল্প যেমন করেছিলেন তেমনিই তো চলেছেন! সঙ্কল্প করেছিলেন পথে নেমে মন যেমন ভাবে চলতে চাইবে তেমনি ভাবেই চলবেন। মন একনিষ্ঠ করে সেই ভাবেই চলেছেন। মনে পড়লো অতীতে যখনই মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে—মনে মনে বিষ্ণুস্তোত্র আবৃত্তি করেছেন। হে ঠাকুর! হে অচ্যুত অনন্ত গোবিন্দ মন উচাটন করো না। শান্ত করো, একনিষ্ঠ করো মন। আজও তাই করলেন।

আগে ভাবতেন স্তোত্র আবৃত্তিতে, যোগ সাধনায় অশান্ত মন স্থিতধী হয়। এখন মনে হয় তা ভুল। ভগবানের নামস্তোত্র সরিয়ে রাখ একপাশে। আঁখির আগে মনকে দাঁড় করাও। বোঝবার চেষ্টা করো মন। যদি পারো তো সাদাকালোর নক্সা তোলো মনের পাড়ে। সূর্যের আলোয় গাছের শাখা প্রশাখার ছায়া পড়েছে মাটিতে। মনে হচ্ছে সাদা কালোর নক্সা আঁকা আছে মাটিতে। মনটাকে তেমনি আলো-ঝিলমিল করে তুলতে হবে। সেই ঝিলমিল মনের আকাশ পরিব্যাপ্ত করে একসময় সাতরঙা রামধনু উঠবে। উজ্জ্বল হবে তোমার মন। কামনা বাসনার ছোঁয়া লেগেই

মন কলুষিত হয়। দুঃখ কাতরতা বাড়ে। কিন্তু কামনা বাসনাহীন যে মন —সে মন তো পাল তোলা নাও। কৃপা বাতাস পেয়ে তরতর করে বয়ে চলবে উজানে। তখন চলার পথে-শুধু দেখা, শোনা আর বোঝা! চাওয়া নয়—আকাঙ্ক্ষা নয়—কামনা নয়। ভুল করেও না। তাহলেই মন হয়ে উঠবে শুকনো খোলা। তখন ঈশ্বর ভাবনা নয়—ঈশ্বর ভীতিতে জবুথবু হবে মন। অভ্যাসের দাসত্বে শুধু স্তোত্র আবৃত্তি করা। কিন্তু ঈশ্বর তো কতগুলো নামের সমষ্টি মাত্র নয়! তাঁর নাম করা মানে তো তোতাপাখির মতন মুখস্থ বুলি আওড়ানো নয়! মনে পড়ে গেল শিক্ষাদীক্ষাহীন সেই সন্ন্যাসীর কথা। ঈশ্বর তাঁর কাছে একটা বিস্ময় মাখানো অনুভূতি। গুরুর কাছে এলেন। সেই জিজ্ঞাসারই উত্তর পেতে।—গুরুদেব! বলে দাও, কোথায় তিনি নেই! তিনি তো সর্বত্রই আছেন। জলে, স্থলে, অন্ত-রীক্ষে! সেই অশিক্ষিত সাধুর কাছে ঈশ্বর যেমন এক প্রতীতি, বিস্ময়-মাখানো এক চিরন্তন অস্তিত্বের উপলব্ধি—তেমন তো তাঁর কাছে নয়! আচার্যর মনে হলো এতদিন ধরে তিনি শুধু পণ্ডশ্রমই করেছেন। তোতা-পাখির মতন শেখানো বুলি আওড়েছেন অভ্যাসের বসে। কোনো স্থির প্রতীতি ঈশ্বর সম্বন্ধে হয় নি।

হ্যাঁ, ঈশ্বর তাঁকে ছেড়ে গেছেন। অথবা তিনিই ছেড়েছেন ঈশ্বর। তাই তো পথ খুঁজে নিতে হবে তাঁকেই। ত্যাগ করতে হবে সব। শুধু সুখ ঐশ্বর্য নয়। রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, অভিমান। সব কিছু। ছিন্ন কন্থার মতন। সরে আসতে হবে কোলাহল থেকে। চলতে হবে একা। একলা চল রে! পথ খুঁজে খুঁজে। যতক্ষণ না তুমি ক্লান্ত হচ্ছ। ক্ষুধার্ত হচ্ছ। অকস্মাৎ চিন্তা সূত্র ছিঁড়ে গেল আচার্যর।

কিন্তু এ কি আত্মপ্রবঞ্চনা নয়? আত্মপ্রবঞ্চনা? কিন্তু কেন? প্রশ্ন কর-লেন নিজেকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো—কেন নয়? কোলাহল থেকে সরে আসতে চাইছেন তিনি। কিন্তু সেই পথই বেছে নিলেন যেখানে মানুষের কোলাহল আছে। বনপথ দিয়ে চলতে চলতে রাখাল ছেলের হর্ষ-ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। কানে শুনছেন গাভীর গলায় ঝোলানো ঘণ্টার ঠুন-ঠুন শব্দ। তিনি চলেছেন মানুষের সমাজের তীর ছুঁয়ে। যেখানে জীবন

আছে, কোলাহল আছে। তিনি তো জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নন! তাঁর তো সকলকেই দরকার। আর এই কোলাহলের মধ্যেই ঈশ্বর-অস্তিত্বের সংজ্ঞা পেতে চাইছেন তিনি। ছেলেবেলায় পড়া রূপকথার সেই গৃহী সাধুর গল্প মনে পড়লো। সাধু হতে চেয়েছিল সে। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষুধা মেটাতে গৃহীই রয়ে গেল। সাধু হওয়া ঘটলো না তার। ইঁদুর পাছে জপমালার সুতো কেটে দেয় তাই বেড়াল পুষেছিল। বেড়ালের দুধের যোগান দিতে পুষতে হলো গাই। তার পরিচর্যা করতো এক রমণী। পরে সেই রমণীকেই বিয়ে করে সাধু হয়ে গেল গৃহী।

একটা কাঁঠাল গাছের তলায় ঘন ছায়ায় বসলেন। মনে ভাবলেন আর আত্মপ্রতারণা নয়। এইবার ঠিক পথটি বেছে নিতে হবে তাঁকে। এতদিন শুধু ভাবের ঘরে চুরি করেছেন। কি পেয়েছেন? শুধু নিজেই ঠকেছেন। কোনোরকমে স্ত্রীর শেষকৃত্য সমাধা করে চলে এসেছেন। আর যেন সহ্য হচ্ছিল না পরিবেশ। শব পচা গন্ধে আকাশ বাতাস থিকথিক করছে। তাই কি পালিয়ে এলেন? হয়তো তাই। কিন্তু ব্রাহ্মণরা যে অপেক্ষা করছিল তাঁর নির্দেশের জন্যে? তাদের সঙ্গে দেখা না করেই কেন পালিয়ে এলেন তিনি? পা দুটি ছড়িয়ে দিলেন আচার্য। লক্ষ্য করেন নি। কখন যেন পায়ে পায়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একটা বাছুর। মুখ তুলে তাঁর গলার কাছে নাক নিয়ে এলো বাছুরটা। ঘ্রাণ নিলো। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়লো। চমকে সরে বসলেন আচার্য। মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন বাছুরটার দিকে। ভারি কোমল আর মায়া ধরানো দৃষ্টি বাছুরটার। স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠলো মন। ধীরে ধীরে তার গলায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বাছুরটাও গলা তুলে চোখ বুজে আদর খেতে লাগলো। আরও ঘন হয়ে দাঁড়ালো তাঁর। ধীরে ধীরে বাছুরটার সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। খুশিতে চঞ্চল হলো বাছুরটা। খসখসে জিভ দিয়ে আচার্যর গলা নাক চেটে দিলো। ভালো লাগছিল তাঁরও। উঠে দাঁড়ালেন। ভাবলেন একটু খেলা করবেন বাছুরটার সঙ্গে। আদর করে ডাকলেন। হঠাৎ তিড়িক করে একটা লাফ মারল বাছুরটা। তারপর রোদের মধ্যে ছুটতে ছুটতে চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

হারিয়ে যাওয়া ভাবনাটা আবার পেয়ে বসল তাঁকে। —'কেন আমি ফিরে গেলুম না। ওরা যে আমার অপেক্ষায় বসে ছিল!' কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে পারলেন না। বেশ ক্ষুধার্ত বোধ করছেন। অথচ কোথায় খাবার পাবেন। কাছেপিঠে গ্রাম আছে নিশ্চয়ই। যেখানে খাবার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তার মানে আবার হাঁটা। নিরূপায় হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। শুরু হলো পথ চলা গরুর ক্ষুরের দাগ ধরে ধরে। প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটবার পর একটা মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। গ্রামের চৌহদ্দির বাইরে মন্দির। তার মানে এ অগ্রহার ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত নয়। একটা গাছের তলায় এসে বসলেন।

বেলা ক্রমে বাড়ছে। মার্তণ্ডদেব মাথায় চড়েছেন। গরমও বাড়ছে সঙ্গে সঙ্গে। গাছের ছায়াও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। খিদের সঙ্গে এখন দারুণ তেষ্টা। কিন্তু জল পাবেন কোথায়? গ্রামবাসী কারো দেখা পেলে বেশ হতো। নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের সেবার জন্যে আস্ত ফল আর দুধ আনতো। চোখের পাতার ওপর হাতের আড়াল দিয়ে দূরে তাকাবার চেষ্টা করছিলেন। সামান্য দূরে একটা পুকুরের ধারে একজন কৃষক অনেকগুলো মোষ চান করাচ্ছে। আচার্য তাকে দেখেন নি। কিন্তু লোকটি তাঁকে দেখেছিল। তাড়াতাড়ি কাছে এসে দাঁড়ালো তাঁর। একমুখ পানসুপুরি। অনবরত চিবিয়ে চলেছে—কচরমচর। ইয়া পালোয়ানি গোঁফ। মাথায় জড়ানো চৌখুপ্পি নক্সা—কাপড়ের পাগড়ি। একনজর দেখেই আচার্য বুঝতে পারলেন যে মানুষটি নিশ্চয়ই গ্রামপ্রধান জাতীয় একজন কেউকেটা।

লোকটা তাঁর চেনা না হওয়ায় মনে মনে স্বস্তি পেলেন আচার্য। একমুখ পান নিয়ে লোকটার কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল। কষ বেয়ে যাতে পানের রস গড়িয়ে না পড়ে, সেজন্যে মাঝে মাঝে চিবুকটা উঁচু করছিল লোকটা। সেই অবস্থাতেই দুহাত দিয়ে ইঙ্গিতে জানতে চাইলো কোথা থেকে আগমন হয়েছে তাঁর। একটু যেন অভিমানাহত হলেন প্রাণেশাচার্য। মানুষটা যদি তাঁর সঠিক পরিচয় জানতো তাহলে এমন অশিষ্ট ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করতে সাহস পেত না। তাই-ই হয়। এখন আমি নিছক ব্রাহ্মণ মাত্র। যেহেতু তোমার গৌরবময় পূর্ব পরিচয় অতীতেই ফেলে এসেছি।

চিন্তাটা তাঁকে যেন একটু আনমনা করলো। জবাব না পেয়ে লোকটা উঠে দাঁড়ালো। একপাশে সরে গিয়ে প্যাচ করে খানিকটা পিক ফেললো। তারপর আবার ফিরে এলো নিজের জায়গায়। কাঁধের কাপড় দিয়ে মুখখানা বেশ করে রগড়াল। গোঁফটা মুছে নিলো। তারপর আচার্যর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো।

—বাবাঠাকুর কোন্ দিকে যাবেন স্থির করেছেন ?

প্রাণেশাচার্য মনে মনে খুশি হলেন। তবু ভালো। খানিকটা খাতির করেছে লোকটা। সহবৎ জানে। নইলে হয়তো সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসতো—কোন্‌দিকে যাবেন ?

প্রাণেশাচার্য কিন্তু সোজাসুজি উত্তর দিতে পারলেন না। লক্ষ্যহীন ভাবে হাত নেড়ে বললেন—এই একটু এদিকে।

চাদর দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন। মনে ভাবলেন—ঈশ্বরের অশেষ করুণা! তাই লোকটা তাঁকে চিনে ফেলে নি। লোকটা কৌতূহলী হয়ে আবার বললো।—বাবাঠাকুর কি ওই পাহাড় পেরিয়ে এলেন ?

মিথ্যা ভাষণে অনভ্যস্ত আচার্য বললেন—হুঁ।

—ঠাকুর কি তাহলে পাব্বনী তুলতে যজমান বাড়ি চলেছেন ?

প্রাণেশাচার্য অধোবদন হলেন। লোকটা তাঁকে চালকলা বাঁধা সাধারণ পুরুত ভেবেছে। যজমানবাড়ি চলেছেন ভিক্ষান্ন সংগ্রহে। চেহারাটা বোধ হয় সেই রকমই হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, পাণ্ডিত্য—এসব কোনোটাই তাঁকে লোকটার কাছে বিশিষ্ট করতে পারলো না। ভালোই হলো। একটা নতুন দিকের শিক্ষানবিসি শুরু হলো। বিনয়, নম্রতা—ইত্যাদি দিকগুলো তাঁর চরিত্রের অসম্পূর্ণ দিক। এতকাল যেন অবহেলিত ছিল মনের এই গুণগুলো। মনে মনে বললেন—আরও নিচু হতে হবে তোমাকে। তৃণের চেয়েও অধম হতে হবে। নিচুর কাছে নিচু হতে শিখলি না রে মন!—সব মানুষের কাছেই এই বিনয় শিক্ষা করতে হবে। তবে না সিদ্ধি! তাই লোকটার প্রশ্নে আত্মাভিমান আহত হলেও ধীরে ধীরে বললেন—হুঁ।

অপরিচিত এই মানুষটার কাছে তাঁর চেহারাটা যেমন ধরা পড়েছে

তেমনিই থাকতে চাইলেন তিনি।

গেঁয়ো লোকটা তার বলদের পিঠে হেলান দিয়ে বললো।

—এ গাঁয়ে কিন্তু বামুন ঘর একটাও নেই।

অন্যমনস্ক প্রাণেশাচার্য আবার ছোট্ট করে বললেন—হুঁ।

—প্রায় দশ বারো মাইল হেঁটে গেলে যে অগ্রহার পাবেন, সেখানে অনেক বামুনের বাস।

—না কি!

—গরুর গাড়ির রাস্তায় গেলে আপনাকে হাঁটতে হবে অনেকটা। একটা শুঁড়ি পথ অবিশ্যি আছে—

—বাঃ!

—আমাদের এখানে একটা ইদারা আছে। একটা কলসি দিচ্ছি। আপনি চান সেরে নিন। চাল আর মুসুর ডাল দিয়ে যাচ্ছি। পাক করে নেবেন। তারপর যদি অগ্রহার যেতে চান বলবেন। শেষাপ্পা বলদ গাড়ি এনেছে। ফিরবে খালি গাড়ি নিয়ে। অগ্রহারের কাছেই থাকে। আপনাকে অগ্রহারে পৌঁছে দেবে'খন।

হঠাৎ লোকটা বললো।

—ওখানে যাচ্ছেন যখন তখন বলি। শুনেছেন বোধহয়—একটা বামুনের মড়া পচছে ওখানে। তিন রাত্তির ধরে পচছে। কেউ গা করে নি। মনে হয় লোকটার বোধহয় কেউ নেই। শেষাপ্পা বলছিল মাঝ রাত্তির নাগাদ লোকটার ঝি তার কাছে এসেছিল। মড়াটা দাহ করাতে সাহায্য চাইতে। তা বামুনের মড়া—অমনভাবে বাসি পড়ে থাকবে—এ কেমন কথা! শেষাপ্পা তাই বলছিল—অগ্রহারের সব বাড়ির মাথার ওপর বড় বড় শকুন বসে আছে।

কথা শেষে খানিকটা তামাক পাতা হাতের চেটোয় বেশ করে ডলে নিলো। তারপর মুখে পুরে দিলো।

শেষাপ্পা এখানে আছে শুনে অব্দি অশান্তি ভোগ করছিলেন প্রাণেশাচার্য। এখানে এই অবস্থায় শেষাপ্পার মুখোমুখি হতে চান না তিনি। তাই লোকটার দিকে চেয়ে বললেন।

—বাবা ! আমায় একটু দুধ আর গোটা কয়েক কলা দিতে পার ! ওই খেয়েই আমি ঠিক হাঁটতে পারবো।

— পারবো না কি বলছেন ঠাকুর ! আমি এখুনি সব যোগাড় করে আনছি। আপনি সারাদিন না খেয়ে আছেন তাই ভেবেছিলুম আপনার সেবার ব্যবস্থা করে দিই।

বলতে বলতে চলে গেল লোকটা। নিঃশব্দে ভাবতে লাগলেন প্রাণেশাচার্য। এ যেন কাঁটার ওপর আসন হয়ে থাকা। তাঁকে এ অবস্থায় দেখলে শেষাপ্পা না জানি কি ভাববে। আশেপাশে তাকালেন। একটা আতঙ্কে ছেয়ে আছে মন। কিন্তু কেন এই লোকভয় ? সব অহঙ্কার অভিমানই তো ছেড়ে এসেছেন ! তবুও এই অস্বস্তি কিসের। কিছুতেই যেন নিজেকে স্বাভাবিক করতে পারছিলেন না তিনি।

খানিক পরেই একটা পাত্রে করে একটু ঠাণ্ডা দুধ আর এক ছড়া পাকা কলা নিয়ে এলো লোকটা। তারপর আচার্যর পায়ের সামনে সেগুলো সাজিয়ে রেখে বললো।

—বড় ভালো সময়ে আমাদের গাঁয়ে একজন বামুন মানুষ পায়ের ধুলো দিলেন। ঠাকুর নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ গুণতে পারেন। দেখুন না বাবাঠাকুর হাতটা গুণে। একশো টাকা মূল্য ধরে ছেলের বউ আনলাম—তা ঘরে ঢুকে এস্তক সেই যে কোণ নিয়ে বউ বসলো আর ওঠার নামটি নেই। সারাদিন চুপচাপ বসে থাকে। কি জানি কোন্ অপদেবতার ভর হয়েছে। তা ঠাকুর ! মন্তর টন্তর পড়ে একটা কিছু দাও না—পরিয়ে দিই বউটার হাতে !

অশান্ত মন সংযত করার চেষ্টা করছিলেন প্রাণেশাচার্য। মনকে স্থির করা দরকার। ভবে না ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা ! নতুবা শুধু অভ্যাসের নিয়ম পালনে কি লাভ ! চোরাপথে আচার-বিচার ঢুকে সব মহত্ত্ব যে নষ্ট করে দেবে ! হঠাৎ তাঁর মনে হলো এ তাঁর কিসের পরীক্ষা ! সব ছেড়েছুড়ে এসেও নিস্তার নেই। পিছু পিছু ধাওয়া করে এসেছে সংসারের দাবি। এ দাও —ও দাও। এর থেকে কি মুক্তি নেই তাঁর ! এই সরল মানুষটাকে কেমন করে ঠকাবেন! অনেক আশা করে তাঁর সেবার জন্যে ফলমূল দুধ এনেছে।

মানুষটাকে কেমন করে বলবেন যে আশীর্বাদের অধিকার তিনি হারিয়েছেন। তিনি পাপী। তাই কৃচ্ছ্রসাধনার সুফল পাবার যোগ্যতা তাঁর নেই! তবে কি লোকটাকে সত্য কথাই বলবেন?

ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বিনীতভাবে বললেন। —দেখ বাপু! আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় গত হয়েছেন। দেহ মন তাই অশুদ্ধ। এ অবস্থায় মন্ত্রপাঠ তো সিদ্ধ হবে না বাবা!

লোকটা কি যেন ভাবলো। তারপর বললো।

—এই রাস্তা ধরে মাইল দশ হেঁটে গেলে একটা গাঁ পাবেন। নাম মেলীগে (Melige)। সেখানে রথের মেলা বসেছে আজ থেকে। কাল পরশুও থাকবে। ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে ভালো পাব্বনী পাবেন।

কথা কটা বলে লোকটা বলদগুলো তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। লোকটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে প্রাণেশাচার্য উঠলেন। তারপর পায়ে চলা পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলেন।

মনে একটা দুশ্চিন্তা তাঁর ছিল। শুধু দুশ্চিন্তা নয়। আতঙ্কও। যদি ধরা পড়ে যান! যদি ওরা তাঁকে চিনে ফেলে! কিন্তু কেন আতঙ্ক? কোথায় গেল তাঁর চরিত্রের ভয়হীনতা? তাঁর চরিত্রের পরিপন্থী এই চিত্তদৌর্বল্য কেন? কেন তিনি নির্ভীক মনে অগ্রহারে ফিরে যেতে পারলেন না? ভয় পাপ। এই পাপ তাঁকে স্পর্শ করেছে। তিনি তাই মানুষের সমাজে সকলের দৃষ্টির সামনে যেতে শঙ্কিত হচ্ছেন। হায়! ঠাকুর! কেন এই মিথ্যাচার!

চলতে চলতে চারপাশের অসম্ভব নির্জনতা তাঁকে স্পর্শ করলো। ধীরে ধীরে কলুষমুক্ত হতে লাগলো মন। ধীরভাবে চলেছেন তিনি। যাতে করে তিনি গভীরভাবে জীবনের সমস্যাগুলো ভাবতে পারেন। সমস্যার ভূতটা চুলের গোড়া টেনে ধরেছে। কিছুতেই মুক্তি দিচ্ছে না। প্রথমে সমস্যা ছিল নাস্তিক নারাণাপ্পাকে নিয়ে। কেমন অনায়াসে আচার-বিচারের মুখে লাথি মেরে চলে গেল সে। তখন সমস্যা দেখা দিলো ওর মৃতদেহটাকে নিয়ে। কে দাহ করবে? প্রাণেশাচার্য আশ্রয় খুঁজতে চেয়েছিলেন ধর্মের নির্দেশের মধ্যে। কিন্তু কোথায় নির্দেশ? নির্দেশ কেউ দিলো না। না ধর্ম না অকৈতব ঈশ্বর। পরিবর্তে সেই গহন বনে জীবনের এক পরম ছলনার

মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন।

তাঁর মনে পড়েছিল জীবনের সেই আশ্চর্য মুহূর্তের কথা। জীবনে সেই একবারই এক যৌবনবতীর স্তনযুগল স্পর্শসুখের অনুভূতি পেয়েছিলেন তিনি। থামলেন প্রাণেশাচার্য। হৃদয় উত্তাল হয়ে উঠেছে। যখন মন আত্ম-বিশ্লেষণ করে তখন যেন একটা ঘোর লাগা অবস্থার মধ্যে দিয়ে সে চলে। যেন এক দিবাস্বপ্ন দেখে সে। প্রাণেশাচার্যরও তাই হলো। তিনি ভাবতে লাগলেন।

—তার কোলে মাথা রেখে আমি শুয়েছিলাম। পরম যত্নে একটার পর একটা কলা আমায় খাইয়ে দিচ্ছিল সে। মারুতিদেব আমার প্রশ্নের উত্তর দেন নি। তাই ক্ষুধা ক্লান্তি আর নৈরাশ্যে আমি বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিলাম। তখনই সেই মুহূর্তটি এলো। আগে নয়—পরেও নয়। অবাঞ্ছিত হলেও ঈশ্বরই বোধহয় তা চেয়েছিলেন। নইলে এমন এক মুহূর্ত আমার জীবনে আসবেই বা কেন? খোলা পথে জলোচ্ছ্বাসের মতন অনাস্বাদিত অথচ মধুর সেই অভিজ্ঞতা বয়ে আনলো মুহূর্ত। তারপরই হারিয়ে গেল মহাকালের গর্ভে। এ অভিজ্ঞতার কোনো সুস্পষ্ট চেতনা মনে ছিল না। অবিস্মরণীয় সেই মুহূর্তটি আগে না—পরেও না। মুহূর্তই যেন তাতে প্রাণ আরোপিত করেছিল। তাহলে আমি কেন দায়ী হবো? অথচ ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনোদেশে এক পরিবর্তন ঘটে গেল। আমি বদলে গেলুম। এই বদলটুকুর জন্যে যে আমিই দায়ী! সেই আমার দুঃখু। সেদিনের সেই অভিজ্ঞতা স্মৃতি মাত্র নয়। সেই পুলকের কামনা আবার তীব্র হচ্ছে। মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠছি আমি।

শুধু ব্যাকুল হওয়া নয়। সেই নারীর প্রতিটি অঙ্গ স্পর্শের জন্যে লালায়িত হয়ে উঠলেন তিনি। প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলো। মনে হলো এখুনি ছুটে চলে যান কুন্দপুর। খুঁজে বার করেন চন্দ্রীকে। মনের মধ্যে এক প্রবল আলোড়ন। হৃদয় যেন এক উত্তাল সমুদ্র। মনে হলো এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় যদি চন্দ্রীর কাছে শুধু ভোগের বাসনা নিয়ে যান, লোকে বলবে তিনি কামাচারী। চন্দ্রীর প্রতি কাম-মোহিত হয়ে ছুটে এসেছেন। আগের ঘটনার সঙ্গে জুড়ে দিব্যি বলবে—

এ ছুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নয়। অবশ্য তখন টানাপোড়েনের এই মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে রেহাই তিনি পাবেন। কোনোরকম আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়াই ঈশ্বরের কাছে স্বীকারোক্তি করতে পারবেন। রীতিমত বলিষ্ঠ স্বীকারোক্তি। বলতে পারবেন—না, প্ররোচনা নয়। প্রবৃত্তির বশে চালিত হয়েই এ কাজ করেছি। কিন্তু মনের সে জোর কোথায়? ব্যক্তিত্বই গড়ে ওঠেনি। ভ্রূণ থেকে বেরিয়ে আসা প্রাণ যেমন টলটলে আকারহীন তেমনি হয়ে আছে তাঁর ব্যক্তিত্ব। অথচ তিনি তো ব্যক্তিত্বহীন নন। মনে হলো আত্মসমীক্ষা দরকার। সেদিনের সে অভিজ্ঞতা কোনো ইঙ্গিতবহ ঘটনা নয়। মুহূর্ত আগেও জানতেন না কি ঘটতে চলেছে। শুধু যে মুহূর্তে চন্দ্রীর সুপুষ্ট স্তনযুগল স্পর্শ করলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা সর্বনাশা কামনার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন তিনি। এ তাঁর জীবনের এক চূড়ান্ত মুহূর্ত —যখন তিনি ঠিক পথটি বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু সেই ছায়াছায়া অন্ধকারে তাঁর হাতছুটো তখন লোভীর মতন চন্দ্রীর নারীদেহের সব প্রত্যঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াচ্ছে। পথ বোধহয় বাঁধাই ছিল। চন্দ্রীকে ভোগ করার প্রবল ইচ্ছাবই জয় হলো শেষ পর্যন্ত।

চরম মুহূর্তের যে সিদ্ধান্ত তার সব দায়দায়িত্ব মানুষকে নিতেই হয়! কিন্তু তার সঙ্গে চরিত্র গড়ার কি কোনো সম্পর্ক আছে! নারাণাপ্পা যেমনটি হতে চেয়েছিল তেমনটি হয়েছিল। কিন্তু আমি যা হতে চেয়েছিলাম তা তো হতে পারলাম না! একটা ঝড় এসে আমায় বেসামাল করে দিলো। আমার মতিভ্রম হলো। আমি পথ হারালাম। কিন্তু এই যে ভ্রান্তি এর জন্যে কি আমি দায়ী? কে উত্তর দেবে তাঁকে! এখন যেন ত্রিশঙ্কু অবস্থা ছুটো সত্তার পরস্পর বিরোধ কেটে ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন করছে তাঁর মন। তিনি শুধু অসহায়। অথচ এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তো ছিল না তাঁর!

আচ্ছা! মুনিঋষিদের কি কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বই ছিল না! সেই মহাতপা ঋষির কথাই ধরা যাক। যিনি মৎস্যগন্ধী কন্যাকে গর্ভবতী করেছিলেন। তাঁর কি অনুতাপ হয়েছিল? অনুশোচনা করেছিলেন আচার্যের মতন। বিশ্বামিত্র মুনি তো জপতপ কৃচ্ছ্রসাধন সব বিস্মৃত হয়ে সুন্দরী নারীতে কামাসক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের জীবন যাপনের পথরেখাটির ঠিক হদিশ তিনি পান

না। পাওয়া না পাওয়ার সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছেড়েছুড়ে শুধু একনিষ্ঠ ভগবৎপ্রেম! আত্মেন্দ্রীয় প্রীতি ইচ্ছা—না কৃষ্ণেন্দ্রীয় প্রীতি ইচ্ছা! হদিশ তাঁর মেলে নি। দ্বন্দ্ব যেন লেগেই থাকে মনে।

তেমন গভীরভাবে ভগবান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর কোনোদিনই হয় নি। সে আকাঙ্ক্ষা তীব্র ছিল মহাবলের। ঈশ্বর নামে একটা ক্ষুধা ছিল তার। ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে যেমন অন্ন তেমনি ভাবেই মহাবল ঈশ্বর পেতে চাইতো। তাঁরা একসঙ্গে কাশী গেলেন। অনেক তাড়াতাড়ি জ্ঞানবিদ্যা অধিগত করলো মহাবল। বুদ্ধি জ্ঞান দেহসৌন্দর্য সবই বেশি ছিল মহাবলের। অনেকদূর অব্দি দেখতে পেত সে। ভাবতে পারত অনেকটা। মহাবল সম্পর্কে একধরনের সূক্ষ্ম ঈর্ষা তাঁর ছিল। তবে শুধু ঈর্ষা নয়। আকর্ষণও। ফলে যে গাঢ় বন্ধুত্ব ঘটেছিল ঈর্ষা তাতে চিড় ধরাতে পারে নি। শ্রেণীতেও পৃথক ছিলেন তাঁরা। তিনি মাধ্বী, মহাবল স্মার্ত। তিনি যখন অনুভবের মধ্যে নিমগ্ন, মহাবলের কাছে তখন ঈশ্বরের অভিজ্ঞতাটাই বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার জন্যে তো পথের দরকার? কেন ? মহাবল তর্ক করতো। পথের কি দরকার ? যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখান থেকেই ঈশ্বরের রাজ্যে পৌঁছুতে পার। স্বর্গ কি কোনো শহর না গ্রাম ? ভাবছ কি করে পৌঁছুবে? তোমার আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরকে মিলিয়ে নাও। মহাবল তাই করেছিল। যুক্তিতর্কের চেয়ে হৃদয়ের আবেদনটা ওর কাছে অনেক বেশি ছিল। জ্ঞানবিদ্যার চেয়ে ও গান শুনতে ভালবাসত। যখন ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ গাইত তখন মনে হত বুঝি শ্রীকৃষ্ণের বাগানে পৌঁছে গেছি।

মহাবলের কথা মনে হতেই তাঁর স্বর অবরুদ্ধ হয়ে এলো আবেগে। অমন তীব্র ভগবৎপ্রেম তার মতো আমার ছিল না। শুধু আবেগ দিয়েই ঈশ্বর পেতে চাইতো সে। অত প্রাণাবেগ আমার ছিল না। হয়ও নি। অথচ কোথায় হারিয়ে গেল মহাবল। যখন কাশীতে গিয়েছিলেন তখনই দেখেছিলেন ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে সে। বুঝতে পারতেন না তিনি। অথচ কষ্ট পেতেন মনে। চেহারাটা মনে পড়ছে। লম্বা, ফরসা, ছিপছিপে চেহারা। দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করতো। জানতো বুঝতোও ঢের। কিন্তু কি যেন

হয়ে গেল। বুঝতে পারতেন মহাবল এড়িয়ে যাচ্ছে তাঁকে। তাঁর নিজেরও কিছু ভালো লাগতো না। পড়াশুনো বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। অথচ মহাবলের ওপর কেন এই অন্ধ প্রেম বুঝতে পারতেন না। কখনও এমন হয়েছে, ওর ফরসা ম্লান মুখখানা ভেসে উঠেছে তাঁর মনে। ছুটে গেছেন মহাবলের কাছে। কিন্তু ছল ছুতো করে এড়িয়ে গেছে মহাবল।

এমনি করেই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন সে হারিয়ে গেল। আর ফিরে এলো না। কাশীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন আচার্য। কোথায় সে? মনে মনে শঙ্কিত হলেন। কেউ খুন করলো না তো তাকে? তারপর হঠাৎই একদিন দেখা পেয়ে গেলেন তার। একটা বড় বাড়ির বারান্দায় বসে আছে একা। হাতে থেলো হুঁকো। বসে বসে ধূমপান করছে। কেমন যেন অসহ্য মনে হলো আচার্যর। ছুটে গেলেন। দু'হাতে টেনে তুলতে গেলেন মহাবলকে। কিন্তু একটুও লজ্জা পেল না মহাবল। আচার্যর দিকে ভারি চোখ দুটো তুলে শান্ত নির্বিকার স্বরে বললো।

—নিজের কাজে যাও প্রাণেশ!

কিন্তু ততক্ষণে হেঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন মহাবলকে। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো যেন সে। বললো।

—কি জানতে চাও? কেন সব ছেড়েছুড়ে চলে এসেছি? কিসের টানে? তাই না? এস আমার সঙ্গে। দেখে যাও কি নিয়ে বেঁচে আছি।

মহাবল টানতে টানতে তাঁকে ঘরের ভিতর নিয়ে এলো। খাটের ওপর পুরু তোষক পেতে একটি যুবতী শুয়েছিল। ঘুমোচ্ছিল। মুখে লেগে ছিল তৃপ্তির এক টুকরো হাসি। তার পোশাক-আশাক, সাজসজ্জা, রঙচঙে মুখ দেখেই আচার্য বুঝেছিলেন মেয়েটি পতিতা। মনে মনে শিউরে উঠেছিলেন আচার্য। মহাবল কিন্তু একটুও বিচলিত হয় নি। ধীর শান্ত স্বরে বলেছিল

—দেখলে তো কিসের টান? এখন যাও। আর এসো না বিরক্ত করতে।

কি উত্তর দেবেন আচার্য। হতবাক হয়ে ধীরে ধীরে ফিরে এসেছিলেন সেদিন। সেদিনই মনে মনে কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিছু না পান জীবনে, অন্তত মহাবলের মতন পথভ্রষ্ট হবেন না। বরং পথ খোঁজার সাধনাই করে যাবেন চিরকাল। মহাবলকে দেখেছিলেন। তারপর দেখলেন

নারাণাপ্পাকে। একজনকে মনে করলে আর একজনকে মনে পড়ে যায়। অথচ কত আলাদা ওরা। যেন দুই মেরু।

এখন মাঝে মাঝে আচার্যর মনে হয় মহাবলের সঙ্গে দেখা হলে তাকে জিজ্ঞেস করতেন কেন সে পথ ভুল করলো? কী সে প্রয়োজন? কী সে তাগিদ? এখন বোধহয় দেবার মতন আর কিছু নেই মহাবলের। তিনি শুধু আশ্চর্য হয়ে যান যখন ভাবেন শুধু মাত্র নারী সম্ভোগ মহাবলকে কি জীবনের সব আনন্দ দিতে পেরেছে? অধ্যাত্মানুভূতির যে আনন্দ তা কি সম্ভোগ থেকে পেয়েছে মহাবল?

হঠাৎ যেন বিদ্যুৎচমকের মতন সত্য উদ্ঘাটিত হলো। উঠে দাঁড়ালেন প্রাণেশাচার্য। চলতে চলতে ভাবলেন হতাশার মূল কারণটি ঠিকই খুঁজে পেয়েছেন তিনি। মহাবল সেদিন তাঁকে হতাশ করেছিল। তাই নারাণাপ্পার মধ্যে মহাবলকে ফিরে পেয়ে তাকে আলোর পথের সন্ধান দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এবারেও জয়ী হতে পারেন নি। নারাণাপ্পাও তাঁকে হতাশ করেছে। অথচ অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছেন তিনি পথ পাবার জন্যে। আচার্যর মনে হলো যখনই কোনো সঙ্কল্পের জন্যে তিনি সংগ্রাম করেছেন তখনই যেন জয়পরাজয় জড়াজড়ি করে সঙ্কল্প থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে চেয়েছে।

আচার্য ভাবলেন সব যেন কেমন জড়াজড়ি হয়ে যাচ্ছে। মহাবল, নারাণাপ্পা, অগ্রহারে তাঁর স্তোত্রপাঠের আসর, বেল্লী নামে হরিজন মেয়েটার সেই উদলা পুরুষ্টু বুক—সব মিলেমিশে কেমন যেন এক আচ্ছন্নতাব মধ্যে তাঁকে টেনে নাবাতে চাইছে। হয়ত তাঁর অবচেতন মনে লুকিয়ে চন্দ্রীর সঙ্গে সঙ্গমের সেই নগ্ন দৃশ্যপট আবার ভেসে উঠবে চেতনালোকে। এমনিভাবেই তো লুকিয়ে রাখা কামনাগুলো একসময় না একসময় মনের পরদায় ভেসে ওঠে। আচার্যর মনে হলো হয়ত এটাই সেই মুহূর্ত।

অগ্রহারের সেই ফেলে আসা জীবনের কথা মনে হচ্ছে। কেমন যেন গুলিয়ে উঠছে শরীর। জীবনের একটা অধ্যায় যেন স্তোত্র আর মন্ত্রের মধ্যে আত্মগুপ্ত হয়েছিল। তারপর যখনই কেটে গেল সেই আচ্ছন্নতা—মনে হলো এতবড় ছলনা থেকে মুক্তির পথ একটাই। পলায়ন। কিন্তু কোথায়?

যেখানে হোক। চন্দ্রীর কাছে যেতেই বা আপত্তি কি ? মোটকথা মনের এই অনিশ্চয় দ্বন্দ্ব—এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা থেকে পালানো ছাড়া গতি নেই তাঁর। পরিচিত সব গণ্ডী পেরিয়ে—লোকচক্ষুর আড়ালে নির্বাসন নিতেই হবে তাঁকে। এমন কোথাও-যেখানে কেউ জানবে না কেউ চিনবে না তাঁকে।

আগেই হাঁটতে শুরু করেছিলেন। এবার পথ চলা ত্বরিত হলো। হঠাৎ মনে হলো কেউ তাঁকে পিছন থেকে অনুসরণ করছে। একজোড়া অনুসন্ধিৎসু চোখের দৃষ্টি সেঁটে আছে তাঁর পিঠের সঙ্গে। মনে মনে অস্বস্তি বোধ বেড়ে গেল। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল পিছন ফিরে দেখেন। কিন্তু সাহস হলো না। যদি মানুষটা চেনা হয়! হঠাৎ একটা শব্দ শুনে পিছন ফিরলেন। দেখলেন নেহাতই যুবক বয়সী একজন খুব দ্রুত তাঁর দিকে হেঁটে আসছে। তাঁকে প্রায় ধরে ফেলতে চায়। আচার্যও জোরে হাঁটা শুরু করলেন। যতবারই পিছন ফিরে তাকান মনে হয় ছেলেটাও হাঁটার গতি বাড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও হাঁটার গতি বাড়ালেন। কিন্তু ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবেন কেন ? একসময় পাশেই এসে দাঁড়াল ছোকরাটি। আচার্যর পায়ে বেশ যন্ত্রণা হচ্ছিল। তিনিও বাধ্য হয়েই গতি মন্থর করলেন। একটু অবাক হয়েই তাকালেন ছোকরাটির দিকে। হাঁপাচ্ছিল সে। সেই অবস্থাতেই বললো।

—আমি পুট্টা-ম্যালেরা। যাব মেলীগে। রথ দেখতে। আপনি কদ্দূর যাবেন ?

কথা বলতে ভালো লাগছিল না প্রাণেশাচার্যর। তাছাড়া কী-ই বা বলার আছে! ছেলেটার মুখের দিকে তাকালেন। কালো শুকনো ক্লান্ত মুখ ঘামে জবজবে। নাকখানা খাড়া লম্বা। চোখ দুটি সন্নিবদ্ধ। দৃষ্টি চোখা। সব মিলিয়ে মুখখানার মধ্যে একটা একরোখো জেদের চেহারা আছে। সেইটেই ব্যক্তিত্ব এনেছে ছোকরার চেহারায়। পরনে ধুতি আর শার্ট। দেখলেই মনে হয় শহরের ছেলে।

—আপনাকে পেছন থেকে দেখেই মনে হয়েছিল আপনি মানুষটা ভালো। এখন সামনা-সামনি দেখেও মনে হচ্ছে খুব চেনা আপনি।

ছোকরার আলাপ করার ঢঙটা মনে মনে পছন্দ করলেও তখুনি জবাব দিলেন না প্রাণেশাচার্য। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন।—ওই পাহাড়টা পেরিয়ে আসছি। যাচ্ছি শিষ্য বাড়ি।

—তাই বুঝি! ওদিককার লোকদের আমি চিনি। আমার শ্বশুর ওখানেই থাকে। ঠিক কোন্‌খানে বলুন তো? পাহাড়টার তলায়?

—কুন্দপুর।

—কুন্দপুর! তাহলে শীনাপ্যায়াকে চেনেন নিশ্চয়ই?

—না।

কথা শেষে প্রাণেশাচার্য হাঁটতে শুরু করলেন। পুট্টা সহজে ছাড়লো না তাঁর সঙ্গ। পাশে পাশে চলতে লাগলো।

—শীনাপ্যায়া অবশ্য আমার আত্মীয় নয়। তবে শ্বশুরের বন্ধু তো! ওর সেজো ছেলের সঙ্গে আমার শালীর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল—

অভ্যাসবশে আচার্য বললেন—হুঁ।

বস্তুত আলাপের ইতি করতেই চাইছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি চাইলেও পুট্টা তা হতে দিলো না। বকবক করে চলতে লাগলো পাশাপাশি। তার মনে হচ্ছিল আচার্য বেশ উৎসাহ পাচ্ছেন। একসময় একটা গাছের তলায় বসে পড়লেন আচার্য। ক্লান্তিও বটে। আবার পুট্টাকে এড়িয়ে যাবার একটা অজুহাতও বটে। কিন্তু তাকে বসতে দেখে পুট্টাও খুশি হয়ে পাশে বসে পড়ল। নিশ্বাস ছাড়ল। তারপর পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বার করে আচার্যকে একটা বিড়ি দিতে গেল। আচার্য ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করায় সে নিজে বেশ জুৎ করে একটা বিড়ি ধরাল। তখনই প্রাণেশাচার্য উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হাঁটা শুরু করে দিলেন। পুট্টাও লাফিয়ে উঠে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো। একসময় বললো।

—চলতে চলতে যদি কথাবার্তা বলেন তাহলে পথচলার একঘেয়েমি কেটে যায়। হাঁটতেও ভালো লাগে। আমি তো আবার সঙ্গী ছাড়া পথ চলতেই পারি না।

কথা ক'টা বলে হাসিহাসি মুখে প্রাণেশাচার্যর দিকে তাকিয়ে রইলো পুট্টা।

২

সংকারের কয়েকঘণ্টার মধ্যেই পারিজাতপুরের মানুষরা জানতে পারলো যে আচার্যর পত্নী বিয়োগ হয়েছে। আর সেজন্যেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন তিনি। নারাণাপ্পার অন্ত্যেষ্টির খবরটাও তারা জানলো। শুধু জানলো না যে শেষকৃত্যটুকু সম্পন্ন করেছে একজন যবন। পারিজাতপুরের ছোক-রারা অবশ্য সবই জানতো। কিন্তু মুখ খোলার উপায় তাদের ছিল না। বন্ধু নারাণাপ্পার মড়াটার গতি করতে এসে তারা যে ভয় পেয়েছিল আর তার-পর প্রাণ বাঁচাতে পালিয়েছিল সে কথা তো ঢাক পিটিয়ে বলা যায় না! তাই বুদ্ধিমানের মতন সমস্ত ব্যাপারটাই তারা ঢোঁক গিলে গিয়েছিল।

মঞ্জাইয়া অবশ্য খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। প্রথমে নারাণাপ্পা পরে দাসাচার্য আর শেষবেশ আচার্যর পত্নী—পরপর এতগুলো অসময়োচিত মৃত্যু তাকে বেশ ভাবিয়ে তুললো। তবে কি মহামারী? এ ব্যাপারে অন্য ব্রাহ্মণদের ব্যাখ্যাটা সে হেসেই উড়িয়ে দিলো। ওদের মতে মহামারী, মড়ক এ সব কিছু নয়। আসল কথা হলো ব্রাহ্মণ নারাণাপ্পার মৃতদেহ সংকার করতে যে গাফিলতি হয়েছে তা থেকেই পাপ বর্তেছে। আর সেই পাপেই মৃত্যু হলো অন্য দু'জনেরও। ব্যবসার খাতিরে মঞ্জাইয়াকে শিমোগা শহরে প্রায়ই যেতে হয়। অনেক মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। তার পক্ষে এই আষাঢ়ে ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া সম্ভব হলো না। অভিজ্ঞতা থেকেই সে বুঝে-ছিল মহামারীর আকারে একটা বহুজন-ব্যাপক মৃত্যু তাড়া করে আসছে। সবচেয়ে দুশ্চিন্তা হয়েছিল দাসাচার্যর মরার খবর শুনে।—কি আশ্চর্য! মানুষটা যে দুদিন আগেই আমার এখান থেকে উপ্পিত্তু খেয়ে গেছে!

মনে মনে একটা ভয় ক্রিয়া করছিল তার দাসাচার্যকে ঘরে ঢুকিয়েছিল বলে। ওরা যখন প্রথম এসে নারাণাপ্পার মরার খবর দিলো মঞ্জাইয়া তখনই জেনেছিল যে জ্বরের সঙ্গে নারাণাপ্পার কুঁচকি ফুলেছিল। লক্ষণটা ভালো নয়। তাই সন্দেহটা তখনই জন্মায়। আরও জানতে পারে যে জ্বরের

আগে নারাণাপ্পা শিমোগা গিয়েছিল। সেখান থেকেই জ্বর নিয়ে আসে সে। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বেশ ভয় পেয়ে গেল মঞ্জাইয়া। পরে যখন জানলো যে পালাতে গিয়ে দলে দলে ইঁদুর মরছে আর মরা ইঁদুর খেতে শকুনের দল অগ্রহারে জমা হচ্ছে, তখন অনুমানটা ষোলআনা বিশ্বাসে পরিণত হলো। গতকালই হাতে পেয়েছে তাই-ইনাড়ু সংবাদ পত্রটা। হপ্তাখানেক আগের খবরের কাগজ। প্রথম পাতার একটা কোণের দিকে খবরটা ছিল। শিমোগাতে প্লেগ—এই শিরোনামায় খবরটা ছাপা হয়। খবরটা পড়েই মঞ্জাইয়া বুঝলো যে শিমোগা থেকেই নারাণাপ্পা প্লেগ বয়ে নিয়ে আসে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দাবানলের মতন রোগটা ছড়িয়ে পড়ে সারা অগ্রহারে। হঠাৎ মঞ্জাইয়ার মনে হলো যে সে নির্বোধ। শুধু সে একা নয়। সারা অগ্রহারের সব মানুষগুলোই নির্বোধ। নইলে অন্ধ একটা সংস্কারকে আশ্রয় করে নিজেদের এতবড় সর্বনাশ তারা হতে দিত না। নারাণাপ্পার বাসি মড়া পচে ফুলে পড়ে রইলো একপাশে। আর নির্বোধ মানুষগুলো তখন শুকনো শাস্ত্রবচন ঘেঁটে বিধান খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। একবারও ভেবে দেখলো না সংক্রামক রোগটা কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সারা অগ্রহারে। এ যেন নিজের মাথায় নিজেই ঘা মারা। মঞ্জাইয়া তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো সামনের জমিতে। চেঁচিয়ে বললো—

ওরে! গাড়িতে বলদ দুটো জুড়ে দে। এখুনি আমায় বেরোতে হবে।

মনে ভাবল এক মুহূর্তও দেরি করা চলবে না, তাহলেই সব্বনাশ। কাক কি শকুন ঠোঁটে করে একটা মরা ইঁদুর আনলেই হলো। দেখতে হবে না আর। সংক্রামক রোগটা হু হু করে নদী পেরিয়ে আছড়ে পড়বে এখানে। গাড়িতে ওঠার আগে মঞ্জাইয়া চেঁচিয়ে বললো।

—দেখো বাপু! আমি না ফেরা অব্দি তোমরা কেউ দুর্বাসাপুরের দিকে যাবে না। বুঝলে!

এই সমাজের সে শিরোমণি। একটা দায়িত্ব আছে তার। ইচ্ছে করেই রাক্ষুসে ব্যাধির শঙ্কাটা সে জানালো না। অকারণে মানুষগুলোকে ভয় পাইয়ে লাভ কি!

ততক্ষণে গাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। চড়ে বসল মঞ্জাইয়া। তারপর বালিশে

হেলান দিয়ে হেঁকে বললো।

—তীর্থহল্লী।

ভাবের ঘরের মানুষ নয় মঞ্জাইয়া। এ অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেছে সে। প্রথমে যাবে পৌর আপিসে। কারণ সবার আগে মড়াটা সরানো দরকার। তারপর যাবে ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে। মানুষ-গুলোকে টিকে দেবার ব্যবস্থা করাবে। তারপর পাম্প বসিয়ে ইঁদুরের গর্তগুলোর মধ্যে বিষমেশানো জল ঢেলে দেবার ব্যবস্থা করবে। যাতে ইঁদুরগুলো মাটির ওপর উঠতে না পারে। দরকার পড়লে অগ্রহারের মানুষ-দের অন্যত্র সরিয়ে দেবার ব্যবস্থাও করানো যেতে পারে। অন্তত বেশ কিছুদিনের জন্যে। আপনমনেই বিড়বিড় করতে লাগলো মঞ্জইয়া। গাধা—আস্ত গাধা সব। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে গাড়োয়ানকে বলতে লাগলো—ওরে! বলদ দুটোর ল্যাজ মুড়ে আর একটু তাড়াতাড়ি চালা বাবা! অচিরেই তীর্থহল্লীর বাঁধানো রাস্তায় উঠে পড়লো গো-যান। তারপর দ্রুত চলতে লাগলো।

গরুড়াচার্য, লক্ষ্মণাচার্য আর অন্য সকলে হরিধ্বনি দিতে দিতে মঠ ছেড়ে বেরুলো। হতাশ, বিষণ্ন মন। অগ্রহারে পৌঁছে দেখলো জ্বরগায়ে পড়ে আছে পদ্মনাভাচার্য। অচৈতন্য। জিভ প্রায় ঝুলে পড়েছে। একজন ছুটলো পদ্ম-নাভাচার্যর শ্বশুরবাড়ির গ্রামে ওর ব্রাহ্মণীকে খবর দিতে। একজন ছুটলো শহরে ডাক্তার ডাকতে। সবাই একরকম অসুস্থ। এখানে পদ্মনাভাচার্য, কৈরামাতে দাসাচার্য, মঠের মধ্যে গুণদাচার্য। বলতে গেলে অগ্রহারের সামনে এখন ঘোর বিপদ।

সকলের সামনেই গরুড়কে গালাগালি করছিল লক্ষণ। গরুড় বাধা দেবার জন্যেই নাকি নারাণাপ্পার সংকার হলো না। কিন্তু লক্ষণের কথা মন দিয়ে শোনার মতন মনের অবস্থা কারো ছিল না। দোষারোপ করার সময় এখন নয়, করণীয় যা তাড়াতাড়ি করাই বিধেয়। তারপর না হয় দণ্ড-স্বরূপ নারাণাপ্পার সব সম্পত্তি দেবোত্র করে দেওয়া যাবে'খন। একরকম অনি-চ্ছুক অবস্থাতেই মরণাপন্ন পদ্মনাভাচার্যকে ওই অবস্থায় ফেলে ওরা বেরিয়ে

পড়লো। শুধু হাতজোড় করে গরুড় বললো—যদি পার একজন ডাক্তারকে দিয়ে গুণদাচার্যকেও দেখিয়ে দিও। একটু ওষুধের ব্যবস্থা করো। বেচারা একলা পড়ে আছে মঠে।

সবাই চুপচাপ পথ চলছে। কথা বলার সাহসও যেন নেই ওদের। একটা চাপা বিষণ্ণতা ভর করে আছে ওদের মনে। মনে মনে গরুড় মারুতিদেবকে নিবেদন করলো—ঠাকুর! শাস্তি যা দেবার দিও। মাথা পেতে নেব। শুধু ক্ষমা করো।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে একসময় ওরা সবাই কৈমারাতে পৌছাল। পৌছেই যা শুনলো স্তম্ভিত হয়ে গেল। দাসাচার্যর চিতাভস্ম নিয়ে ফিরেছে সবাই। প্রাণেশাচার্যর ব্রাহ্মণীও স্বর্গগত। সব দেখেশুনে কেমন হতচকিত হলো সবাই। তাদের পরিচিত চেনাজানা পৃথিবীর এ কি দুর্দৈব! যেন অন্ধকারে ভূত দেখছে সবাই। শিশুর মতন আকুল হয়ে দেয়াল ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলো সবাই। শুধু বয়োজ্যেষ্ঠ সুব্বানাচার্যই কাতর হয়ে পড়ে নি। কোনো-রকমে ওদের সান্ত্বনা দিচ্ছিল সে।

থম মেরে অনেকক্ষণ বসে রইলো গরুড়। তারপর নিস্তেজ গলায় বললো—ইদুরগুলো কি এখনো মরছে?

—তার মানে? গরুড়ের দিকে তাকালো সুব্বানাচার্য।

—কিছু না। শকুনগুলো এসে ছাদের ওপর বসছিল কিনা—তাই!

—ওসব কিছু না। শাস্ত্রসম্মতভাবে ক্রিয়া অনুষ্ঠানগুলো ঠিক মতন পালন করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—আমি আর ফিরে যাচ্ছি না ওখানে।

গরুড়ের কথা শুনে বাকি সকলে মিনমিন করে বললো।

—নারাণাপ্পার মড়া তো পচে ঢোল হয়ে গেছে। ক্রিয়া অনুষ্ঠান হবে কি করে? তাছাড়া ক'মন কাঠ লাগবে পোড়াতে তা ছাখো!

কেউ কোনো কথা বলছে না দেখে লক্ষ্মণ বললো।

—চল ওঠা যাক।

গরুড় বললো—আমি ভয়ানক ক্লান্ত। তোমরা এগোও।'

বিরক্তিতে খিঁচিয়ে উঠলো সুব্বানাচার্য।

—তোমরা ভেবেছ কি ? বয়সের তো গাছ-পাথর নেই। কিন্তু কথাবার্তা ব্যবহার তো সব অর্বাচীনের মতন। তোমাদেরই যদি এরকম ব্যাভার হয় তাহলে তোমাদের দেখে শিখবে কি ?

—তা আমি কি করবো ?—বললো গরুড়।

লক্ষ্মণ যেন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল।

—আরে ওঠ ওঠ ! ফিরে যেতেই হবে। কেউ তো নেই সেখানে। অন্তত গাই বলদগুলো দেখা—তাদের খাওয়ানো গোয়ালে ঢোকানো—দুধ দোয়া—এসব করবে কে শুনি !

সবাই মাথা নাড়ল।

—ঠিক। ঠিক। ঠিক বলেছে লক্ষণ।

তারপর হরিনাম করে সবাই হাঁটতে শুরু করলো তাদের অগ্রহারের দিকে। সারা পথ তারা চললো রঘুপতি রাঘবের নাম কীর্তন করতে করতে।

হরিজন বস্তিতে সকলের সম্মতি নিয়েই একটা মোরগ বলি করা হলো। তাছাড়াও সবাই মিলে মানত করলো সামনের অমাবস্যা তিথিতে একটা মেষ বলি দেবে। কিন্তু এত করেও প্রেত পিশাচের কোপ থেকে রেহাই পেল না ওরা। বেল্লীর বাপ-মা দু'জনেই মরলো একই দিনে। বেল্লীর চিৎকার শুনে ছুটে এলো সবাই। অর্ধনগ্ন কালো কালো চেহারা। সবাই মিলে বেল্লীদের তালপাতার কুঁড়েটা ঘিরে চুপ করে বসে শোক করলো। তারপর আধঘণ্টাটাক পরে কুঁড়েটাকে জ্বালিয়ে দিলো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো তালপাতার কুঁড়ে। বেল্লীর বাপ মার মড়া দুটো শুদ্ধ কুঁড়েটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কেমন যেন ভয় পাওয়া চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি বেল্লীর দেখলো সব। তারপর আতঙ্কিত ইদুরগুলোর মতোই দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালালো।

অতীতের পাপের মতন যেন পুট্টা বলে ছোকরাটি প্রাণেশাচার্যর সঙ্গে সেঁটে আছে। আচার্য থামলে থামছে। চললে চলছে। কখনও দ্রুত, আবার কখনও আস্তে। একবারের জন্যও ওঁর সঙ্গ ছাড়ে নি পুট্টা। মনে মনে ধৈর্যচ্যুতি

ঘটছিল প্রাণেশাচার্যর। একলা থাকতে চাইছেন তিনি। একা এবং নির্জন মনে আত্মানুসন্ধান করতে চাইলেন। কিন্তু পুট্টা তাঁকে সে অবকাশ দিচ্ছে না। সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে তাঁর মনের নিমগ্নতা নষ্ট করতে চাইছে। তাকে আমল দিচ্ছেন না। তবুও সে জুড়ে থাকছে তাঁর মনের সঙ্গে। কি ভাবছে তাঁকে ছোকরাটা ? ভিক্ষাবৃত্তিধারী একজন ভবঘুরে বামুন নাকি ! আর সেইভাবে তাঁকে উপদেশও দিচ্ছে। জানে না বেদান্ত দর্শনের একজন অতি পারঙ্গম রত্ন বিশেষ তিনি। যদি জানতো···

পুট্টা হঠাৎ বলে উঠলো।

—অমন খালি পায়ে ঘুরে বেড়ান কেন ? না না। ঠিক নয়।

—তীর্থহল্লীর বাজার থেকে হাতে তৈরি একজোড়া চপ্পল কিনে নিলেই পারেন ! টাকা তিনেক তো দাম।

খানিক চুপ করে উপদেশ দেবার মতন করে বললো।

—শুধু টাকার কথা ভাবলেই চলবে ! শরীরের কথা ভাববেন না ? দেখুন তো আমার চটিজোড়াটা, এক বছর হয়ে গেছে। এখনও এতটুকু টসকায় নি।

বলতে বলতে পা থেকে চটি জোড়াটা খুলে দেখালো।

চলতে চলতে আবার একসময় বললো।

—কি মুখ বুজে চলেছেন। কথা বলুন না ! মুখ বুজে চলতে আমার একদম ভাল্লাগে না। বলুন দেখি এই ধাঁধাটার উত্তর ?

—একটা নদী, একটা নৌকো আর একজন মানুষ। মানুষটার সঙ্গে সঙ্গী হয়ে চলেছে এক আঁটি ঘাস, একটা গাই আর একটা বাঘ। এখন নৌকো করে নদী পেরিয়ে সবাইকে ওপারে নিয়ে যেতে হবে মানুষটাকে। নৌকোতে কিন্তু মানুষ ছাড়া একজন মাত্র উঠবে। বলুন দেখি, লোকটা কি করবে ? কাকে ফেলে কাকে নিয়ে যাবে ?

ধাঁধাটা বলে ফস করে একটা বিড়ি ধরালো পুট্টা। তারপর একটা টান দিয়ে বললো।

—দেখি কেমন বুদ্ধি আপনার !

বুদ্ধির বিচার হচ্ছে প্রাণেশাচার্যর। তাই রাগ হলেও চুপ করে থাকলেন।

পুট্টা অনবরত খুঁচিয়ে যাছে।—কি? পেলেন উত্তর? এখনও হলো না?

প্রাণেশাচার্যর পক্ষে উত্তরটা খুঁজে পাওয়া খুব আয়াসসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু তিনি ইতস্তত করছেন। উত্তরটা বললে খুশি হবে পুট্টা। আরও ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করবে তখন। আবার না বললে ভাববে তিনি বোকা। যথার্থই বিপন্ন বোধ করছিলেন আচার্য। একবার ভাবলেন—না হয় বোকাই থাকলেন পুট্টার কাছে। পুট্টা তখনই জিজ্ঞেস করে বসলো—পেলেন উত্তর?

প্রাণেশাচার্য মাথা নাড়লেন। হোহো করে মজার হাসি হেসে উঠলো পুট্টা। তারপর খুশি মনে নিজেই বললো উত্তরটা।

সত্যিই খুশি হয়েছে পুট্টা। প্রভূত খুশি। মনে মনে ভাবলো—আহা! মানুষটা ভালো, কিন্তু বোকা। বেশ মজা লাগছিল তার, তাই বললো—তাহলে আর একটা ধাঁধা বলি?

—না না। যেন আঁতকে উঠলেন প্রাণেশাচার্য।

—তাহলে আপনি বলুন! হারান আমায়! বেশ হবে তখন।

—আমি কোনো ধাঁধা জানি না।

গম্ভীর মুখে বললেন প্রাণেশাচার্য।

পুট্টার মনে ভারি কষ্ট হলো। ভাবল—আহা! মানুষটা কত সরল ছাখ তো! কথা বলার জন্যে তার জিভ সুড়সুড় করছিল। নতুন একটা প্রসঙ্গ ধরলো এবার।

—আচ্ছা আচার্য! আপনি কুন্দপুরার যাত্রাদলের শ্যামকে চেনেন?

—শ্যাম মরে গেছে জানেন? মানুষটা বড় ভালো ছিল।

—আহা! তাই নাকি! আমি তো জানি না!

—তার মানে, কুন্দপুর আপনি আগে ছেড়েছেন।

বললো পুট্টা।

কথা বলতে বলতে ওরা রাস্তার মাথায় এসে পৌছাল। মাথা থেকে দু'মুখো হয়ে গেছে রাস্তাটা। আচার্য মনে মনে খুশি হলেন। ভাবলেন এবার বোধহয় ছেলেটার হাত থেকে রেহাই পাবেন। মোড়ে দাঁড়ালেন আচার্য। পুট্টার দিকে চেয়ে বললেন।

—কোন্‌দিকে যাবে তুমি ?

—কেন, এই দিকে ?

বলে একদিকে হাত দেখালো পুট্টা। সঙ্গে সঙ্গে আচার্য উল্টো দিকের রাস্তায় হাত দেখিয়ে বললেন।

— আমি এইদিকে যাব।

—দুটো রাস্তাই মেল্লীগে যায় তবে এটা ঘুরপথ। ঠিক আছে। আমার তো কোনো কাজ নেই এখন, আমিও না হয় ঘুরপথে আপনার সঙ্গেই যাব।

কথা শেষে থলি থেকে এক দলা গুড় আর খানিকটা নারকেল বার করলো। অর্ধেকটা আচার্যকে দিলো। বাকিটা নিজে খেতে লাগলো। মনে মনে কৃতজ্ঞ হলেন আচার্য। সত্যিই বেশ খিদে পেয়েছিল তাঁর। এইভাবে দু'জনেই খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে রইলো। আচার্য যেখানে গেলেন যা করলেন—সব ব্যাপারেই তাঁর ভাগ্যের সঙ্গে জুড়ে রইল পুট্টা। একজন মানুষ।

স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছিল পুট্টা। নারকেলের সঙ্গে গুড় চিবোতে চিবোতে সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো।

—আপনি বিয়ে করেছেন ?

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই যেন উত্তরটা দিলো।

—কে বিয়ে করে নি ! আচ্ছা হাঁদার মতন প্রশ্ন করলাম তো ! নাকি বলুন ?

আচার্য চুপচাপ। পুট্টা আবার জিজ্ঞেস করলো।

—তা কটি ছেলেমেয়ে ? একটাও না ? সেকি ? আমার তো দুটি বাচ্চা। জানেন তো ! আমার বউও কুন্দপুরের মেয়ে। তা, এখনও বড় ছেলেমানুষ, আর তেমনি টান বাপ মার ওপর, মাসে একবার করে বাপের বাড়ি নিয়ে যেতেই হবে ওকে। তা এই বাজারে প্রতি ক্ষেপে দুটি দুটি করে টাকা খরচা করা কি আমার সাজে ! বলুন ? দুটো বাচ্চার মা কিন্তু ভারি অবুঝ। বুঝবে না কিছুতে। অবশ্য স্বাস্থ্যটাস্থ্য খুব ভালো।

খানিক চুপ করে পুট্টা আবার বললো।

—আমার শাশুড়ীর মনটা ভারি ছোট। শ্বশুর অবশ্য তেমন নয়, পুরুষ

মানুষ তো! বাইরের জগতে মেলামেশা আছে। মনটাও অনেক উদার। শাশুড়ী মাঝে মাঝে চেঁচায়। আমার মেয়ের গায়ে হাত তোলার কি অধিকার জামাইয়ের আছে, শুনি! শ্বশুর অবশ্য কিছু বলে না।

—কিন্তু দেখুন, এত মারধোর করি তবু আমার বৌয়ের শিক্ষা হলো না। প্রায়ই রাগারাগি করে। কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে শাসায়। কি যে করি ওকে নিয়ে! জানেন আচার্য! আর সব ব্যাপারে ও কিন্তু বড় ভালো। যেমন রান্নার হাত তেমনি গেরস্থালির কাজকম্ম। কাপড় কাচা, বাসন মাজা ঘর-দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। কিন্তু ওই এক দোষ। বাপের বাড়ি যাবার গোঁ ধরলে আর রক্ষে নেই। এর কি প্রতিকার বলুন তো?

হেসে উঠলেন প্রাণেশাচার্য। কী বলবেন পুট্টাকে। তাঁর দেখাদেখি পুট্টাও হাসলো। তারপর বললো।

—মেয়েছেলের মন জানা—যেন জলের বুকে মাছের গতির হদিস করা। পণ্ডিত মানুষেরা তো তাই বলে থাকেন, না?

প্রাণেশাচার্য বললেন।

—ঠিক কথা। ভারি খাঁটি কথা। স্ত্রীলোকের মন দেবা ন জানন্তি···

একসময় পুট্টার বাক্যস্রোত বন্ধ হলো। প্রাণেশাচার্য ভাবলেন ছেলেটা হয়ত ভাষাতীত কোনো উপলব্ধির রাজ্যে বসে ওর বউয়ের মন বোঝবার চেষ্টা করছে। আচার্যর হঠাৎ মনে হলো—আমারও তো জীবনে একটা ছোট্ট মোচড় আছে। উদার পক্ষপাতহীন দৃষ্টি দিয়ে আমি তো কই হেঁয়ালির সেই মোচড়টির কথা বুঝতে চেষ্টা করি নি! আমার জীবনের চরম যা জিজ্ঞাসা তার জন্ম হলো আমি না চাইতেই। জড়িয়ে গেল অনেকগুলো মানুষের সম্পর্ক তার সঙ্গে। নারাণাপ্পা, মহাবল, আমার পত্নী, আমার ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু এগুলো কি শুধু আমারই ব্যক্তিগত সমস্যা? তা তো নয়! এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমস্ত সমাজ।

সমস্যার মূল তো সেখানেই। দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, ধর্মনির্দেশ—কোনোটাই আমার একার নয়। 'নারাণাপ্পার অন্ত্যেষ্টি নিয়ে সংকট দেখা দিলো। আমি ছুটে গেলুম ঠাকুরের নির্দেশ চাইতে। খুঁজতে লাগলুম শাস্ত্রব্যাখ্যা। শাস্ত্র

তো সেইজন্যেই তৈরি হয়েছে! সমাজের সঙ্গে আমাদের প্রতিটি কাজের সম্পর্ক অত্যন্ত গূঢ়। তাই তো আমাদের প্রতিটি চিন্তাভাবনা আর কাজের সঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে দিই শাস্ত্রকারদের। আমাদের পূর্ব-পুরুষ আর গুরুদের চিহ্নিত পথে চলবার চেষ্টা করি। সমর্থন খুঁজি শাস্ত্র-ব্যাখ্যার মধ্যে। তাই কি? তাহলে কই চন্দ্রীর সঙ্গে সহবাসের সময় তো শাস্ত্রনির্দেশ খুঁজি নি? ওই ঘটনাটাই কুঁদে কুঁদে বার করে এনেছে আমায় —আমার নিজস্ব জগৎ থেকে। আমার একান্ত পারিবারিক ধর্মবিশ্বাস থেকে। ফল কি হয়েছে? যেন একখণ্ড সুতোর আগায়৷বাতাসের দোলায় আমি দুলছি, ঝুলছি। আমার মুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না।

—আচার্যদেব?

—উঁ!

—আপনাকে আর একটু নারকেল আর খেজুর গুড় দেবো?

—দাও।

পুট্টা তাঁকে এক টুকরো নারকেল আর খেজুর গুড় দিলো। তারপর বললো।

—চুপচাপ পথ চলা ভারি বিরক্তিকর। তার চেয়ে ধাঁধা বলি। বলুন তো কী এর জবাব। একজন খেলছে, একজন ছুটছে, আর একজন শুধু দাঁড়িয়ে দেখছে। বলুন তো কী?

ধাঁধা বলে পুট্টা আর একটা বিড়ি ধরালো।

—কেন আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না? কেন এই অনিশ্চয়তা? কেন এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা? এর মূলে কি চন্দ্রীর সঙ্গে সহবাস? তাহলে কি আত্ম-চিন্তা ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ জাগ্রত প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আমার ভবিষ্যৎ কর্মপথ নিয়ন্ত্রণ করবো? তবেই কি আমার মুক্তি? অথবা অপরের ইচ্ছা-ধীন বায়ুচালিত এক টুকরো সুতোর মতন শুধুই কি দোলা খাব? না। তা নয়। আমাকে যথার্থ মানুষ হতে হবে। দায়িত্বসম্পন্ন। ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন স্বাধীন মনের মানুষ। অপরের ইচ্ছামত আর চলা নয়। পা দুটো যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেখানেই যাওয়া নয়, আর নয় এ খেলা। তার বদলে বাস ধরে কুন্দপুর চলে যাব। চন্দ্রীকে নিয়ে থাকব। উদ্দেশ্যসম্পন্ন জীবনযাত্রা—যাকে বাঁচা বলে, তেমনি ভাবে বাঁচব।

কী, ধাঁধার উত্তর পেলেন ?

—পুট্টার কথায় ঘোর কেটে গেল প্রাণেশাচার্যর। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পুট্টার দিকে তাকিয়ে বললেন।

—যে খেলছে সে মাছ। যে ছুটছে সে জল। আর যে দাঁড়িয়ে দেখছে সে পাথর।

—বাঃ! আপনি জিতে গেছেন।

হাততালি দিয়ে নেচে উঠলো পুট্টা।

—জানেন! বাড়িতে সবাই আমায় কি বলে ডাকে ? ধাঁধা-মাস্টার। অনেক মজার মজার ধাঁধা জানি আমি। আমার সঙ্গে যদি এক'শ মাইল হাঁটেন তাহলে প্রত্যেক মাইলে আপনাকে আমি একটা করে নতুন ধাঁধা শেখাবো।

কথা শেষে মুখ থেকে নেভা বিড়িটা বার করে দূরে ছুঁড়ে দিলো পুট্টা।

সারাটা দিন রোদে পুড়ে গরুড়, লক্ষ্মণ আর অন্যরা যখন দুর্বাসাপুর অগ্রহারে পৌঁছাল তখন সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। অগ্রহারে ঢুকতে একটু দ্বিধা হচ্ছিল। কিন্তু কোনো বাড়ির ছাতে শকুন দেখতে না পেয়ে ওরা যেন আশ্বস্ত হলো। লক্ষ্মণাচার্য মৃদুস্বরে বললো – তোমরা এগোও হে! আমি দেখি গরুবাছুরগুলো কি অবস্থায় আছে।

গরুড় হঠাৎ রেগে উঠলো।

—আগে অন্ত্যেষ্টির কাজকম্মগুলো সেরে নিলে হতো না! পরে না হয় ঘর গেরস্থালি দেখতে।

লক্ষ্মণ প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না। গুটি গুটি সবাই মিলে এসে জড়ো হলো প্রাণেশাচার্যর বাড়ি।

সবাই ভাবছে—আহা! আচার্য কি মানসিক অবস্থায় আছেন কে জানে! সবাই মনে মনে ভাবলো মানুষটাকে সান্ত্বনা জানানো দরকার। কিন্তু ব্যাপার কি ? এত হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি—কেউ তো বেরিয়ে এলো না! বরং সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দেখলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে মরে পড়ে থাকা কতকগুলো ইঁদুর। এরপর আর ভেতরে ঢোকার সাহস হলো না তাদের।

প্রায় ভয়তাড়িত হয়েই রাস্তা অব্দি তারা দৌড়ে এলো। সবাই কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেছে। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে আতঙ্ক। এখন কর্তব্য কি ? একজন বলবার চেষ্টা করলো।—তাহলে নারাণাপ্পার শব দাহর কি ব্যবস্থা হবে ? কিন্তু কেউ বলতে পারল না কি উপায় হবে। নারাণাপ্পার বাড়ি যাবার সাহস কারো নেই। পচে ফুলে ওঠা মড়াটা এতক্ষণে হয়ত বীভৎস হয়ে উঠেছে। গরুড়াচার্য ঢোঁক গিলে বলবার চেষ্টা করলো।

—হয়ত আচার্য নদীতে গেছেন। ফিরে আসবেন এখুনি। একটু বরং অপেক্ষা করি আমরা।

লক্ষ্মণাচার্য বললো।

—না। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। দাহ করার বন্দোবস্ত এগিয়ে রাখা যাক।

—কিন্তু কাঠ ?

—কেন, ওই আমগাছটা কাটলেই কাঠ পাওয়া যাবে।

—ওই পচা বাসি মড়া কাঁচা কাঠে জ্বলবে ভেবেছ ?

—তাহলে ?

লক্ষ্মণাচার্য বললো।

—অত ভাবাভাবির কি আছে। নারাণাপ্পার বাড়ির কাঠকুটো দিয়েই দাহ করা হবে।

গরুড় ঠাট্টা করে বললো।

—অত দুশ্চিন্তা করো না লক্ষ্মণ। তোমার বাড়ি থেকে কাঠ আনতে বলা হবে না।

ওরা শেষ পর্যন্ত নারাণাপ্পার পিছনের বাগানে গেল। কিন্তু সেখানেও যথেষ্ট জ্বালানি কাঠের সন্ধান মিললো না। তখন সবাই মিলে চন্দ্রীকে ডাকাডাকি শুরু করলো। কিন্তু কোথায় চন্দ্রী ?

—ও আপদ কি এখনো আছে ? গ্রাম শ্মশান করে মাগী হয়ত কুন্দপুরে পালিয়েছে ! তাহলে এখন কি করি ?

গরুড়াচার্য পরামর্শ দিলো। সকলকে বললো।

—সবাই নিজের নিজের বাড়ি থেকে এক বাণ্ডিল করে জ্বালানি শ্মশানে

রেখে এসো।

সকলেরই বেশ মনঃপূত হলো পরামর্শটা। মাথায় করে কাঠ ব'য়ে দু মাইল দূরে শ্মশানে রেখে ফিরে এলো সবাই।

—তারপর ?

—অপেক্ষা করো। যতক্ষণ না আচার্য ফিরে আসেন।

গরুড়ের এ পরামর্শটাও মেনে নিল লক্ষ্মণ। কারণ তখনও প্রাণেশাচার্য ফিরে আসেন নি।

সবাই একটু একটু করে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। গরুড়াচার্য বললো —ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে আমাদের। আচার্যর পরামর্শ ছাড়া কিছুই করা ঠিক হবে না।

—সে কথা ঠিক। ততক্ষণে বরং আমরা গুছিয়ে গাছিয়ে কাজটা এগিয়ে রাখি।

সবাই মিলে চেষ্টা করে তখন একটা মাটির গামলায় আগুন জ্বালিয়ে সেটা নারাণাপ্পার বাড়ির বাইরে রেখে এলো। এদিক ওদিক থেকে কিছু বাঁশ জোগাড় করে আনলো। বাঁশগুলো ছোট ছোট করে কেটে মড়া বইবার একটা খাটিয়া বানালো। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলো প্রাণেশাচার্যর জন্যে।

বেলা প্রায় তিনটে। পুট্টার সংগে প্রাণেশাচার্য এসে পেঁৗছলেন মেল্লীগে পুকুরের ধারে। এসেছেন মেঠো পথ ধরে, রাস্তার লাল ধূলোয় সারা শরীর আচ্ছন্ন। প্রাণেশাচার্যই আগে নাবলেন পুকুরে। যখন পা ধুচ্ছিলেন তখনই পুট্টা প্রশ্নটা করলো।

—আচ্ছা! আপনার সংগে তো কত কথা বললাম। কিন্তু আমার নিজের কথা একটাও বলি নি। আপনার আশ্চর্য লাগে নি ?

জলে নেবে পুট্টাও তখন হাত পা ধুচ্ছিল। তাকে দেখে হঠাৎই একটা ভয় পেয়ে বসলো প্রাণেশাচার্যকে। মেল্লীগের মানুষেরা তাঁকে চিনে ফেলবে না তো ? পরক্ষণেই মনে হলো এমন আশঙ্কা অমূলক। এখানকার ব্রাহ্মণর স্মার্ত শ্রেণীভুক্ত। তাঁর অপরিচিত। তাছাড়া উৎসবের হৈ হৈ এর মধ্যে

তাঁর দিকে চোখ রেখে কেউ বসে থাকবে না। ভয়টা তো সেরেফ মানসিক দুর্বলতা। তবুও মানুষ ভয় পায়, যেমন তিনি পাচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। কেন এই ভয়? কোথায় এর মূল? ইচ্ছে করলেই তো মূলটাকে টেনে তুলতে পারেন। ফিরিয়ে আনতে পারেন আত্ম-বিশ্বাস। যেমন নারাণাপ্পা পেরেছিল! সকলের নাকের ওপরেই সে চন্দ্রীকে নিয়ে ঘর করতো। প্রাণেশাচার্য জানেন তেমন সাহস, আত্মবিশ্বাস তাঁর নেই। ওইরকম কিছু ঘটে গেলে তাঁকে মুখ লুকিয়েই থাকতে হবে। একটা ঘেন্না দলা পাকিয়ে উঠলো গলার মধ্যে। থু করে থুথু ফেলে তিনি যেন নিজের প্রতি ধিক্কার জানালেন।

মুখ মুছুতে মুছতে পুট্টা বললো।

—আমি জানি আপনি খুব আশ্চর্য হচ্ছেন। আমার সম্বন্ধে কত কী না ভাবছেন। কে একটা গায়ে পড়া ছেলে সারাক্ষণই জোঁকের মতন লেগে আছে। আপনাকে সব কথা আমি বলবো।

খানিক থেমে পুট্টা আবার বললো।

—আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে মনে আপনার একটা ব্যথা আছে। কষ্ট আছে। তাই এমন মনমরা। আপনার দরকার মানুষের সংগ। ঠিক কি না বলুন? ভাবছেন, কি করে জানলাম? মানুষের মুখ দেখে আমি বুঝতে পারি কোথায় কার ব্যথা। বিশ্বাস করুন, আমার নিজের কথা কিছু লুকোব না। কেন লুকোব? নিশ্চয়ই আমাকে অচ্ছুৎ ভাবছেন, না?

পুট্টা বলে চললো।

—আপনাকে আগেই বলেছিলাম আমি একজন অচ্ছুৎ, ম্যালেরা। তবে আমার বাবা ছিলেন ব্রাহ্মণ, তাঁর বিয়ে করা বউ ছিল। তবে বাবা ভাল-বাসতেন আমার মা-কে। আমি শূদ্রাণীর গর্ভজাত হলেও আমার বাবা ব্রাহ্মণ। সেই সূত্রে আমিও ব্রাহ্মণ। আমার বাবা আমার পৈতে দিয়ে-ছিলেন এই দেখুন।

সার্টের তলা থেকে পুট্টা পৈতা তুলে দেখালো। তারপর হাসতে হাসতে বললো।—যে যেমন তার কাছে আমি তেমনি। আমার অনেক নাম। কেউ বলে বাক্যবাগিশ বক্তিয়ার। কেউ বলে ধাঁধাঁ মাস্টার। তবে যে যাই

বলুক—সব্বাইকে আমার ভালো লাগে।

উৎসবের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে মেল্লীগে। নগরের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে আছে বিশাল রথটা। রথের মাথায় শোভা পাচ্ছে রাশিচক্রের অধিপতিরা। বৃশ্চিক, কন্যা, মিথুন···। সারা রাস্তাটা জুড়ে পড়ে আছে দুটো মোটা রশি। ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে রশি দুটো। ভক্তরা ইতিমধ্যেই অর্ধপথ টেনে এনেছে রথটাকে। বাকি পথ পরিক্রমা পরে হবে। পুরোহিত ঠাকুর বসে আছেন রথের মাথায়। একজন যুবক ভক্তদের কাছ থেকে পূজার ডালি নিচ্ছে। যেমন নারকেল, মিষ্টি ইত্যাদি, আর পুরোহিত মশাইকে দিয়ে আসছে। যুবকটি খুব ব্যস্ত। রথটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেক ভক্ত মানুষ।

অগণিত মানুষ। এত মানুষ যে মুঠো করে তিল ছুঁড়ে দিলে তার এক দানাও মাটিতে পড়বে না। প্রাণেশাচার্যর ভয় হচ্ছিল পাছে কেউ তাঁকে চিনে ফেলে। এত ভিড়ের মধ্যেও পুট্টা তাঁকে ঠিক পথ করে একটা দোকানের সামনে নিয়ে এলো। পূজার জন্য নারকেল আর কলা কিনলো। তারপর বললো।

—ভিড়টা একটু পাতলা হোক। তখন পূজো দেবো আমরা। এখন চলুন ঘুরে আসি একটু।

ভিড় থেকে সরে বাইরে এসে দাঁড়ালো ওরা। সকলের মুখে রথের ভেঁপু। অল্প দামে কেনা তালপাতার বাঁশি। বাপ মা'র কাছ থেকে অনেক কাঁদুনি গেয়ে জোগাড় করেছে। বাঁশির বিচিত্র স্বরের সমন্বয় আছে অনেক মানুষের কলরবের সংগে—সারা মেলা প্রাঙ্গণ জুড়ে তারই ঐকতান সঙ্গীত। বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে ধুনো কর্পূর আর সস্তা কেনা পোষাকের মাড়ের গন্ধে। ভিড়ের এক কোণে কাঠের বাক্স আর চোঙা নিয়ে বসে গেছে সিনেমাওয়ালা। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে সে নাচছে আর ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে।

—দেখো দেখো দিল্লী দেখো। বাংগালোর দেখো। তিরুপতি কা মন্দির দেখো। মৈশোর কী দরবার দেখো। বোম্বাই কা ছুকড়ি দেখো।

হঠাৎ ঘুঙুরের বোল থেমে গেল। লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো।

—দেখো দেখো তসবির দেখো। বোম্বাই কা তামাসা দেখো। নাম মাত্র

মূল্য। লোকে আছড়ে পড়ছে চলন্ত ছবি দেখতে। পুট্টাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল তামাশাওয়ালার পাশে, আশেপাশে এত মজা এখানে যে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। প্রাণেশাচার্যর দিকে তাকিয়ে পুট্টা বললো।

—আমিও দেখবো।

—দেখ।

—আমায় ফেলে পালিয়ে যাবেন না তো ? দাঁড়িয়ে থাকবেন তো ?

প্রাণেশাচার্যকে চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিশ্চিন্ত হলো পুট্টা। তারপর কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে বাক্সর গায়ের ছেঁদায় চোখ রাখলো।

প্রাণেশাচার্য সত্যিই ভাবছিলেন ছেলেটাকে ফেলে এগিয়ে যাবেন কি না। কিন্তু মনে তেমন সমর্থন পাচ্ছিলেন না। আহা ! ছেলেটা বড় সরল। কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে ছেলেটার ওপর। অথচ ওর সঙ্গও তেমন ভালো লাগছে না। মন চাইছে একা থাকতে। এইসব ভাবতে ভাবতেই একা একা আপন মনে হাঁটতে শুরু করলেন প্রাণেশাচার্য।

কিছুদূর গেছেন। হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পুট্টা ডাকছে। কাছে এসে বললো।

—বারে ! আমায় একলা ফেলে চলে যাচ্ছিলেন ? আমি ঠিক ভেবেছি আমায় ফেলে চলে যাবেন ! শেষে ওই তামাশাওয়ালা দেখিয়ে দিলো কোন্ দিকে গেছেন আপনি। নিন চলুন।

পুট্টা তাঁর হাত ধরলো। ক্লান্তিতে অবশ বিষণ্ণ হয়ে গেছেন প্রাণেশাচার্য। একবার ভাবলেন ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দেন ছোঁড়াটাকে। কিন্তু পারলেন না। নিঃসঙ্কোচে বন্ধুর মতন যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাকে অস্বীকার করা যায় না। মন বললো—থাকুক না। ক্ষতি কি !

খানিক দূরে বেদেদের আসর বসেছে। জমাট খেলা চলছে সেখানে। হাত তুলে পুট্টা দেখালো। ওই দেখুন ! প্রাণেশাচার্য তাকালেন। দুরন্ত যৌবনা কালো একটা মেয়ে। সাপের মতন শরীরটা হেলিয়ে দুলিয়ে খেলা দেখাচ্ছে। ঠিক যেন কালনাগিনী। কটিদেশ থেকে বুক পর্যন্ত অনেকটা অংশ অনাবৃত। একটা বাঁশের আগায় নগ্ন কটিদেশ রেখে বেঁকে দুমড়ে

পাক খাচ্ছে মেয়েটা। শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে সেই পাকে। অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে খেলা দেখতে। পুরুষ বেদেটা মাটিতে বসে ঢোল পিটোচ্ছে। পরক্ষণেই মেয়েটা বাঁশের আগা থেকে পিছলে নেবে পড়লো মাটিতে। হৈ হৈ করে উঠলো সবাই। ঝপাঝপ পয়সা পড়লো মেয়েটার পায়ের কাছে। পুট্টাও পয়সা ছুঁড়লো।

পায়ে পায়ে তারা এসে দাঁড়ালো মন্দিরের কাছে। তু'পাশে সারি দিয়ে বসে আছে ভিখারির দল। সবাই প্রতিবন্ধী। কারো চোখ নেই। নাকের বদলে কারো সেখানে তুটো বিরাট গর্ত। কারো হাত নেই। কেউ বা খঞ্জ। দেখেশুনে একজনের দিকে পয়সা ছুঁড়ে দিলো পুট্টা। আরও খানিক হাঁট-বার পর তারা এসে দাঁড়ালো একটা চাকাওলা মনোহারি দোকানের সামনে। লম্বা লম্বা কাঠের দণ্ডের সঙ্গে ঝুলছে রঙবেরঙের ফিতে। পুট্টা তার বউয়ের জন্যে একগজ ফিতে কিনলো। ছেলেমেয়ের জন্যে কিনলো এক জোড়া বাঁশি। বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে বাজালো। তারপর বললো—চলুন।

বস্তুত মেলার এই তীব্র সোরগোল আর কোলাহলের মধ্যে দিশেহারা বোধ করছিলেন প্রাণেশাচার্য। যেন এক ছিন্নমূল শাখা। আঘাত-বিধ্বস্ত হয়ে এদিক থেকে ওদিক ছিটকে বেড়াচ্ছেন। হাঁটতে হাঁটতে ওরা তখন একটা ঠাণ্ডা পানীয়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পুট্টা ডাকলো।

—আসুন! একটা লেমনেড খাই।

দৃঢ় আপত্তি করলেন প্রাণেশাচার্য। ঘাড় নেড়ে বললেন—না। এসব আমি খাই না।

চারপাশে দরমা ঘেরা। মাথায় খড়ের চালা। সোডা-লেমনেডের দোকানে তখন উপচে পড়ছে ভিড়। গেঁয়ো মানুষই বেশি। পুরুষদের তেল চুকচুকে চুলে লম্বা টেরি। মেয়েদের খোঁপায় ফুল। পরনে নতুন কেনা শাড়ি। পুরুষদের গায়ে নতুন শার্ট। এরা সবাই ক্ষেতখামার করে। সবার হাতে মিষ্টি পানায়ের বোতল। কাঠের গোঁজ দিয়ে শব্দ করে বোতলের ছিপি খুলছে। ওদের হাতে দিচ্ছে। আর ঢকঢক করে ওরা বোতলের ঠাণ্ডা নিঃশেষ করছে। বোতল খালি হলে খুশিখুশি মুখে শব্দ করে ঢেঁকুর তুলছে। মুখচোখে ফুটে উঠছে পরিতৃপ্তি। মেলায় আসার অনেক আগে

থেকেই ওরা পয়সা জমিয়েছে এই পানীয়টি খাবার জন্যে। আজ তাদের সেই পরম প্রাপ্তির দিন। অকৃপণ ভাবে পয়সা খরচ করে তারা আনন্দ পাচ্ছে। পুট্টার হাতেও রঙিন পানীয়ের বোতল। এক চুমুকে বোতল শেষ করলো পুট্টা। এই সহজ অনাড়ম্বর আনন্দের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রাণেশাচার্য। দেখছিলেন আনন্দোচ্ছল মানুষগুলোকে। একটা ঢেঁকুর তুললো পুট্টা। তার সারা মুখখানা খুশিতে ঝলমল করছিল। প্রাণেশাচার্যর দিকে চেয়ে অভিমান করে বললো।

—আপনি কিন্তু খেলেন না। এত করে বললুম—

তারপর বললো।

—চলুন।

মানুষের ব্যস্ততা, হুড়োহুড়ি, চিৎকার, মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি, বাঁশির আও-য়াজ, কাঁচের চুড়ির বিচিত্র শব্দ—সব মিলিয়ে মেলার বাতাস মথিত হচ্ছিল। উৎকণ্ঠা চেপে সবাই এই আনন্দের অংশভাগী। ব্যতিক্রম শুধু প্রাণেশাচার্য। তাঁর কোনো ঔৎসুক্য নেই। কোনো আগ্রহ নেই। নিরুৎ-সুক মনে একজন বাইরের মানুষের মতন তিনি শুধু দেখছেন। এই বিরাট আনন্দযজ্ঞের সঙ্গে তিনি যেন কিছুতেই নিজেকে জড়াতে পারছেন না।

পুট্টা ঠিকই বলেছিল—ওর সঙ্গে আমার এই দেখা হওয়াটা যেন অলক্ষ্য কারও নির্দেশেই হয়েছে। যেন আমার ইচ্ছা পূরণ করতেই। ভাবলেন আচার্য। আরও ভাবলেন—কিন্তু কেন? ওর জীবন যাত্রার আদলে নিজেকে গড়ে নেব বলে! কিন্তু পুট্টার জীবনধারণের সবটাই বহিরঙ্গের। যেমন চন্দ্রীর। আমি যেন ঘরেও নই পারেও নই। তুই বৈপরীত্যের টানাপোড়েনের মধ্যে দোদুল্যমান। যখন গুটিয়ে যাচ্ছি আমি নিজের মধ্যে তখন খোলস ভেঙে ওরা বেরিয়ে পড়ছে বহির্বিশ্বে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে পৌঁছাল একটা কফির দোকানের সামনে। গরম গরম ভাজা হচ্ছে মসলা ধোসা। ধোসা আর কফির গন্ধে জায়গাটা ম ম করছে। নাকে লাগতেই পুট্টার মনটা উল্লসিত হয়ে উঠলো। দাঁড়িয়ে পড়লো পুট্টা। দেখাদেখি প্রাণেশার্যও দাঁড়ালেন।

—আসুন না! কফি খাই।

—তুমি খাও।

—আপনি নয় কেন ? পুট্টা রীতিমত ক্ষুব্ধ।

—আপনি হয়তো জানেন না এখানে বামুনদের খাবার আলাদা ব্যবস্থা আছে। সেই তীর্থহল্লী থেকে এরা খাবার-দাবার আনিয়েছে। এখানে কফি খেলে আপনার জাত যাবে না।

—না কফি আমি খাব না।

—খেতেই হবে। আপনাকে আমি কফি খাওয়াবই। আসুন। প্রায় টানতে টানতেই কফিখানার ভেতরে প্রাণেশাচার্যকে নিয়ে এলো পুট্টা। একটা নিচু বেঞ্চির ওপর প্রায় সিঁটিয়ে বসলেন আচার্য। প্রতি মুহূর্তেই তাঁর ভয়—এই বুঝি কেউ চিনে ফেলে। চিনে ফেলে বেদান্ত দর্শনের মহামান্য পণ্ডিত প্রাণেশাচার্যকে। এইরকম একটা অশুচি পরিবেশে তাঁকে কফি খেতে দেখলে লোকে না জানি কি ভাববে। হয়ত আঁতকে উঠবে। হঠাৎ তাঁর মনে হলো কেন এই লোকলজ্জা! থুঃ! এই কি জীবন! জোর করেই মন থেকে সরিয়ে দিলেন ভয়।

একটু দূরে ছোঁয়া বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুট্টা। যে লোকটা কফি পরিবেশন করছিল তাকে পুট্টা বললো—আমাদের জন্যে দু পেয়ালা স্পেশ্যাল কফি দাও। লোকটাকে দু আনা পয়সা দিলো পুট্টা। তারপর কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়েই মুখ ভেঙচে উঠলো।—একেবারে অখাদ্য। ছি! ছি! এর নাম কফি! যত সব গেঁয়ো ব্যাপার!

প্রাণেশাচার্যর কিন্তু ভালোই লাগলো গরম গরম কফি খেতে।

অনেকক্ষণ ধরেই কেমন যেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছিলেন তিনি। কফি খেয়ে মনে যেন নতুন উদ্যম পেলেন।

ওরা আবার রাস্তায় পড়লো। পথ চলার নতুন উৎসাহ পেয়েছেন প্রাণেশাচার্য। চলতে চলতে পুট্টা বললো।

—আচার্যদেব! আপনি তো ইচ্ছে করলে মন্দিরের ভোগ খেতে পারেন। ব্রাহ্মণদের পাত পেড়ে ভোগ খাওয়ায় ওরা—সেই সন্ধ্যে ছ'টা অব্দি লোক খাবে।

পুট্টার কথা শুনে প্রাণেশাচার্যর জঠরাগ্নি যেন নতুন করে জ্বলে উঠলে।

কত দিন হলো পেটে এক দানা ভাতও পড়ে নি। ভাত আর সারু। মনে মনে উল্লসিত হলেন তিনি। পরক্ষণেই নিজেকে তিনি ধিক্কার দিলেন। ছি! ছি! এ তিনি কি ভাবছেন! পত্নীর মৃত্যুর অশৌচকাল যে এখনো কাটে নি! এখনো যে তিনি অশুদ্ধ! এ অবস্থায় ঠাকুরের পংক্তিভোজে বসে সকলের সঙ্গে খাবেন! অশৌচকালে মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ—এ কি তিনি জানেন না! জেনেশুনে এ পাপ করবেন তিনি? মন্দির অপবিত্র করবেন? রথের চাকা আটকে যাবে না?

কিন্তু এত আচারবিচার নারাণাপ্পা মানত না। গণপতি মন্দির-সংলগ্ন পুকুর থেকে মাছ তুলে মহানন্দে ভোজ দিয়েছিল সে। কোনো অনুশোচনা তার হয় নি। আচারভ্রষ্ট হবেন—এত দুঃসাহস প্রাণেশাচার্যর নেই। ভ্রষ্টই বা কেন? মন তাঁকে ধিক্কার দিলো। চন্দ্রীর সঙ্গে সহবাসের গোপন কামনা তাঁর। সে আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে অহর্নিশ। ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছেন না। অথচ মেনে নেবার মতো মনোবলও তাঁর নেই। তাই এই বৈপরীত্য। তাই এই টানা-পোড়েন। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে দুঃসাহসী হতে হবে। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়। মহাবলের কথা মনে পড়লো। যা কামনা করেছিল তাই সে করেছিল।

চলতে চলতে ভাবছিলেন আচার্য। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো পুট্টা।

—ওই দেখুন আচার্য! টিলার মাথার দিকে তাকান।

আচার্য তাকালেন। অদূরে একটা টিলা। টিলার মাথায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত অন্ত্যজ শ্রেণীর নারী-পুরুষ। কেমন যেন তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। পুট্টা উৎসাহের সঙ্গে বললো।

—নিশ্চয়ই মুরগি লড়াই হচ্ছে ওখানে। চলুন দেখে আসি।

একটু যেন থমকালেন। তবুও চললেন পুট্টার সঙ্গে। ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন নিজেকে। জটলা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একটু দূরে দাঁড়ালেন প্রাণেশাচার্য। সস্তা তাড়ির উগ্র গন্ধ নাকে লাগলো। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো যেন। প্রাণেশাচার্য রীতিমত বিস্মিত। দুটো মোরগ রাগে গোঁ গোঁ করছে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে। তাদের পায়ে বাঁধা দুটো ভীষণফলা ছুরি। ডানা আছড়াচ্ছে উত্তেজনায়। লোকগুলো নিশ্বাস বন্ধ করে খাড়া হয়ে

দেখছে।

অগুন্তি মানুষ। উবু হয়ে বসে। উত্তেজনায় হাঁ হয়ে গেছে ওদের মুখ। চোখের দৃষ্টি শাণিত। নিষ্ঠুর। মানুষের চোখে এত নিষ্ঠুর দৃষ্টি কখনও দেখেন নি আচার্য। পঞ্চেন্দ্রিয়র সব অনুভূতি শুধু দৃষ্টির মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। যুযুধান দুটো মোরগ। কক্ কক্ শব্দে চক্রাকারে ঘুরছে। ডানা আছড়াচ্ছে। লালঝুঁটি ঝলসে উঠছে সূর্যের আলোয়। ঝকঝক করছে পায়ে বাঁধা ভীষণফলা ছুরি। চল্লিশ পঞ্চাশ জোড়া চোখের উদগ্র দৃষ্টি সর্বগ্রাসী ক্ষুধা দিয়ে দেখছে ওদের। হঠাৎ যেন একটা মোরগ ঝাঁপিয়ে পড়লো আর এক-টার ওপর। রোদের ঝলকানিতে ঝলসে উঠলো ছুরির ফলা। একটার ওপর চড়ে বসেছে আর একটা। ক্রমাগত নিষ্ঠুর আঘাত করে চলেছে। প্রাণেশাচার্য কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হলো অকস্মাৎ যেন শয়তানের রাজত্বে তাঁর পদস্খলন হয়েছে। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বসে পড়লেন তিনি। চারদিকে এখন শুধু নীরন্ধ্র অন্ধকার। প্রেতপুরীর সেই অন্ধকার গহ্বরে নিসপিস করছে সুপ্ত কামনা-বাসনাগুলো। আর সেই প্রেতনগরীতে চন্দ্রীর সঙ্গে মৈথুনাসক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটলো যেন এতগুলো অন্ত্যজ মানুষের আসক্ত দৃষ্টির মধ্যে। ব্রাহ্মণ প্রাণে-শাচার্য—তাঁর মনের এই অন্ধকার অস্তিত্ব থেকে রেহাই পেলেন না।

মোরগ দুটোর মালিকরা মুখ দিয়ে মোরগের মতন ডাকছিল। কেমন যেন অবাক হলেন প্রাণেশাচার্য। মানুষ কেমন করে এমনভাবে মোরগের ডাক অনুকরণ করে? এ যেন এক সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ। এখানে তাঁর প্রবেশা-ধিকার নেই। নিষ্ঠুর, নৃশংস, লোভী এদের বোধ। লালসার দুই দিক। এক পিঠে সতর্কতা। অন্য পিঠে তামসিক লোভ। প্রাণেশাচার্যর মনে ফিরে এলো সেই সতর্ক কাপুরুষতা। যেদিন নারাণাপ্পা তাঁকে অস্বীকার করেছিল সেদিনও তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব নারাণাপ্পার দুর্জয় লোভ আর অহ-ঙ্কারের সামনে এমনি করে গুটিয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে মালিকরা তাদের নিজের নিজের মোরগ দুটি কোলের কাছে টেনে নিয়েছে। ক্ষতস্থান থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছিল। ক্ষতস্থান সেলাই করে আবার ছেড়ে দিলো ওরা। মোরগ দুটো আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো

পরস্পরের দিকে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো পুট্টা। অপরিচিত একটা মানুষের দিকে চেয়ে বললো।

—ওই মোরগটা জিতলে দু আনা বাজি।

অচেনা লোকটা বললো।

—যদি আমারটা জেতে তো চার আনা বাজি।

পুট্টা বললো।

—তাহলে আট আনা ধরলুম।

—দশ আনা।

—বারো আনা।

লোকটা তাকালো পুট্টার দিকে।

—ঠিক আছে। দেখা যাক শেষবেশ।

উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রাণেশাচার্য অপেক্ষা করছিলেন। কী হয় কী হয় খেলা! অনভিজ্ঞ ছেলেটা বাজিতে সব টাকা যদি খুইয়ে ফেলে! কিন্তু তাঁকে অবাক করে বাজিটা জিতে নিলো পুট্টা। তারপর উঠে দাঁড়ালো। হেরে যাওয়া লোকটা সরোষে তাকিয়েছিল পুট্টার দিকে। তাকে উঠতে দেখে বললো।

—আর একটা বাজি ধরো।

—না।

লোকটা মদ খেয়েছে। হঠাৎ ধাঁ করে উঠে মারতে গেল পুট্টাকে, প্রাণেশাচার্য তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে আটকে দিলেন লোকটাকে। সামনে একজন ব্রাহ্মণকে দেখে লোকটা গুটিয়ে নিলো নিজেকে। অন্য অনেকগুলো লোক চেঁচামেচি করে এগিয়ে এলো।

কি হলো ওখানে? কি হলো?

ততক্ষণে পুট্টাকেও জটলা থেকে বার করে এনেছেন প্রাণেশাচার্য। পুট্টার মনে কিন্তু একটুও আপসোস নেই। বারো আনা পয়সা জেতার খুশিতে চকচক করছে তার মুখ। হঠাৎ পিতৃস্নেহে আকুল হলেন প্রাণেশাচার্য। মনে মনে ভাবলেন।

—এমন একটি নিটোল ছেলে যদি তাঁর থাকত! কত ভালবাসা দিয়ে

মানুষ করতেন তাকে।

অবশ্য সে ভাব গোপন করে বললেন।

—এবার তো আমায় যেতে হচ্ছে বাবা!

পুট্টার মুখখানা করুণ হলো।

—কোন্‌দিকে যাবেন?

সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন আচার্য। তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলেন তার মুখের দিকে চেয়ে। কি চায় ছেলেটা? এমন করে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কেন? মুখে বললেন।

—তেমন কিছু ঠিক করি নি। কোথাও যাব নিশ্চয়ই।

—তাহলে চলুন। খানিকটা পথ একসঙ্গেই যাই। তাছাড়া মন্দিরের ভোগ খেয়ে যাবেন তো?

মনে মনে বিরক্ত হলেন প্রাণেশাচার্য। ব্যাপারটা যেন উৎপাতের মতন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

—আমায় একবার স্যাকরার দোকানে যেতে হবে।

—স্যাকরা? কেন?

—একটু সোনা আছে সঙ্গে। সেটা বেচবো?

—সোনা বেচবেন? কি দরকার বেচার? আমার কাছে বারো আনা পয়সা আছে। নিন না! যখন খুশি ফেরত দেবেন।

ছেলেটার হাত থেকে কেমন করে রেহাই পাওয়া যায় ভাবছিলেন তিনি। পায়ে পায়ে লতার মতন জড়িয়ে যাচ্ছে। তাই এত পিছুটান। বললেন।

—না বাবা। অত কম পয়সায় আমার হবে না। এখান থেকে আমায় কুন্দপুরের বাস ধরতে হবে। তাছাড়া রাস্তায় অন্য খরচও আছে।

—তাই বুঝি। তাহলে আসুন আমার সঙ্গে। আমার জানাশোনা এক স্যাকরা আছে। কি বেচবেন?

—পৈতেতে লাগানো এই সোনার আংটিটা।

—দেখি দেখি।

হাত বাড়িয়ে দিলো পুট্টা।

অগত্যা উপবীত থেকে আংটিটা খুলে পুট্টার হাতে দিলেন প্রাণেশাচার্য।

অনেকক্ষণ থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আংটিটা দেখলো পুট্রা। তারপর বললো।
—পনেরো টাকার কমে কিন্তু ছাড়বেন না।
ওরা বাজারের (Keri) মধ্যে ঢুকে একজন স্যাকরার দোকানে গেল। একটা কাঠের বাক্সের পেছনে বসে লোকটা উখো দিয়ে একটা আংটি ঘষছিল। রুপোর ফ্রেমের চশমা পরা লোকটা এবার ওদের দেখলো।
—কি চাই ?
তারপরই যেন পুট্রাকে চিনতে পারলো সে। মামুলি সৌজন্য দেখিয়ে বললো।
—আরে আরে পুট্রাসাহেব যে! কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! আমার দোকানে আজ পুট্রাসাহেবের পায়ের ধুলো পড়লো।
আংটিটা হাত বাড়িয়ে নিলো লোকটা। কুঁচফল দিয়ে ওজন করলো। তারপর কষ্টিপাথরে ঘষে বললো।
—দশটা টাকা দিতে পারি।
—পনেরো টাকার কমে কোনো কথাই বলবো না।
হাত বাড়িরে দিলো পুট্রা। যেন আংটিটা ফেরত নেবে।
এ ধরনের বিষয়ী কথাবার্তা প্রাণেশাচার্যর একদম ভালো লাগছিল না।
স্যাকরাটা আবার বললো।
—সোনার দাম অনেক নেবে গ্যাছে যে!
—ওসব বুঝি না। পনেরো টাকা দিতে পারবেন কিনা বলুন।
পরক্ষণেই আচার্যর দিকে ভুরু তুলে তাকালো। ভাবখানা—কেমন দরদাম করছি দেখছেন তো!,
কিন্তু অত দরাদরি ভালো লাগছিল না প্রাণেশাচার্যর। বললেন—ঠিক আছে। দশ টাকাই দিন। ওতেই উপস্থিত চলে যাবে আমার।
একটু যেন আহত হলো পুট্রা। কিন্তু স্যাকরার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি দশটা টাকা গুণে প্রাণেশাচার্যর হাতে দিলো। হাতজোড় করে নমস্কার করলো। হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিতে নিতে প্রাণেশাচার্য বললেন।
—ভারি উপকার হলো আমার।
তারপর বেরিয়ে এলেন দোকান থেকে।
দোকান থেকে বেরোতেই বিয়ে করা বউয়ের মতন ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করে

দিলো পুট্টা।

—আপনি তো আচ্ছা মানুষ! আপনার ভালোর জন্যেই দর করতে গেলাম আর তার সামনেই আমায় অপমান করলেন? লোকটা আর কোনদিনও আমার কথার দাম দেবে না। অবশ্য টাকা আপনার। নর্দমার জলে ফেলে দিলেও আমার বলবার কিছু নেই। তবে কলিকাল তো! অত ভালোমানুষির জায়গা এটা নয়। শেষ পর্যন্ত বাঁচাই মুশকিল হবে আপনার। তাছাড়া উপকারটা কার করলেন? স্যাকরারা সোনার ব্যাপারে যে নিজের মার পেটের বোনকেও ঠকায় তা কি জানেন না আপনি?

—তা নয় পুট্টা। টাকাটার খুব দরকার ছিল তাই একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম। আমায় ক্ষমা করো বাবা।

অত্যন্ত নিরীহভাবে কথাগুলো বললেন প্রাণেশাচার্য। যাতে একটুও আহত না হয় ছেলেটা।

সঙ্গে সঙ্গে পুট্টা বলে উঠলো।

--আমি কি তা জানি না! আপনার সঙ্গে যখনই দেখা তখনই বুঝেছি আপনি মানুষটা ভারি সরল। তাই তো আপনার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছি। আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে তবে আমার ছুটি। এখন যা বলি শুনুন। একজনের সঙ্গে আমায় দেখা করতে যেতে হবে। আপনিও আসুন আমার সঙ্গে। পরে না হয় মন্দিরে এসে ভোগ খেয়ে নেবেন। ওরা সন্ধ্যে অব্দি ভোগ বিতরণ করে। রাত্তিরটা এখানেই কোথাও শুয়ে পড়বেন। ভোরবেলা হাঁটা পথে আমরা তীর্থহল্লী যাব। হাঁটা পথে মাত্র পাঁচ মাইল। সেখান থেকে আগুম্বী যাবার বাস ছাড়ে। আর আপনি যদি সোজা ট্যাক্সিতে যান—পাহাড়ের পাশের রাস্তা দিয়ে—তাহলে কুন্দপুরের বাস ধরতে পারবেন।

প্রাণেশাচার্য মন দিয়ে সব শুনলেন। বললেন—বেশ। তারপর আংটি বেচা বাবদ।

পুট্টা হুঁশিয়ার করে দিলো আচার্যকে। বললো।

—সাবধান। এ হলো টাকাপয়সা।

আচার্য ভাবলেন পংক্তিভোজে অনুমতি পাওয়াটা পুট্টার পক্ষে খুব একটা

কঠিন কাজ হবে না। আশ্চর্য ! ছেলেটা যেন কি রকমভাবে মিশে গেছে তাঁর জীবনের সঙ্গে। কে জানে কোন্ পূর্ব জন্মের কোন্ দেনা এভাবে শোধ হচ্ছে ? তাঁর পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে লতার মতন। কোনোভাবেই নিস্তার নেই যেন ! আচার্য ভাবলেন যে একজনের জীবন শুধু যে তার নিজস্ব নির্দেশেই চলবে এ কথা সাহস করে কেউ বলতে পারে না।

—এ দিকে আসুন।

বলে পুট্টা তাঁকে মন্দিরের সামনের রাস্তার অগুন্তি মানুষের ভিড় এড়িয়ে একটা সরু গলিপথে নিয়ে এলো। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা এসে পৌছলেন একটা নির্জন জায়গায়। পাশেই শীর্ণ এক নদী। নদীর ওপর বাঁশের সাঁকো। সাঁকো পেরিয়ে ওঁরা এসে পৌছলেন ভেজা চাষজমিতে। জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রাণেশাচার্যর চোখের ওপর সেই মোরগ লড়াইয়ের ছবিটা ভেসে উঠলো। একটার ওপর আর একটা উত্তেজনা আর হিংসা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। তারপর যে প্রতিপক্ষ দুর্বল তাকে ঠুকরে কামড়ে অবসন্ন করে দেবার কি মর্মান্তিক চেষ্টা ! সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছিল ছুরিগুলো। লাল ক্রূর চোখ। চারপাশে তাড়ির গন্ধ। এমন কি ক্ষতস্থান সেলাই করে জুড়ে দেবার জন্যে যখন তাদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছিল তখনও তাদের চোখেমুখে কী জিঘাংসা ! যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে তখনই। কাম ক্রোধ লোভ লালসার সে এক বীভৎস শয়তানের রাজত্ব যেন।

ভীত ত্রস্ত আচার্য যেন ভূতে পাওয়া মানুষের মতন গিয়ে পড়েছিলেন সেখানে। হ্যাঁ তাই। ভাবছিলেন তিনি।—আমার মনে হয়েছিল ওদের ওই জগতটার মধ্যে ঢুকে পড়ি। বাঁশের আগায় ছিপছিপে শরীরটাকে রেখে খেলা দেখাচ্ছে কামনাময়ী বেদেনীটা। তার আঁটসাঁট জামার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে উগ্র যৌবন। এক সময় সে সরসর করে নেমে এলো বাঁশ ধরে। নাচতে শুরু করলো। একটা উদ্দাম উন্মত্ত জীবনের আঁচ গায়ে লাগছিল আমার। সোডার বোতলের মুখ থেকে কাঁচের গুলি ছিটকে উঠছে আকাশে। ঝলমল করছে বোতলের ভেতরের রঙিন পানীয়। কেউ যেন হঠাৎ ঢেকুর তুললো। কারও চোখ ঝকমক করে উঠলো কামনায়।

জগতটা যেন শুধু চাওয়া পাওয়ার জগৎ। সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ রথের মাথা। চারপাশে ঝলমল করছে বেলুন আর রঙবেরঙের ফিতে। মানুষজন আগ্রহ নিয়ে, কামনা নিয়ে চাইছে ইতিউতি। তাকিয়ে আছে যুযুধান ওই মোরগ দুটির দিকে। ওদের ডানা, ঠোঁট, ছুরির ফলা, আর নখাগ্রের দিকে। সবাই নিমগ্ন। সবাই চাইছে। সকলের চাওয়ার বস্তু এক-টাই। তফাৎ শুধু রুচির। আমি ভয় পেয়েছিলুম। আমার মনে হচ্ছিল সত্যিই আমি যেন শয়তানের রাজত্বের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি।

ফস করে আগুন জ্বালিয়ে একটা বিড়ি ধরালো পুট্টা। তারপর আচার্যর দিকে দুষ্টুমি করে চেয়ে হেসে বললো।

—আমরা কোথায় যাচ্ছি জানেন?

প্রাণেশাচার্য মাথা নেড়ে বললেন—না।

—আপনি সবেতেই উদাসীন। কোথায় যাচ্ছেন কেন যাচ্ছেন কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আমিও ঠিক আপনারই মতো উদাসীন। একবার এক বন্ধুর সঙ্গে শিমোগা চলে গিয়েছিলুম। আমার শ্বশুর তো রেগেই অস্থির! পুট্টা যেখানে যায় সেখান থেকে পেছন ফিরে তাকায় না। বলেছিলেন—ওকে তোমরা ছেড়ে দিও না। তাহলে আর ফিরে পাবে না। বরং ধরে রাখ ওকে। তাহলেই থাকবে।

প্রাণেশচার্য মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন পুট্টাকে।

—কোথায় যেন আমাদের যাবার কথা বল্ছিলে না? কার সঙ্গে যেন দেখা করবে?

—দোহাই আচার্য! অমন বহুবচনে কথা বলবেন না। বয়োজ্যেষ্ঠরা যদি অমন বহুবচনে কথা বলেন তাহলে ভয় হয় বুঝি বেশিদিন আর বাঁচবো না।

—নাকি? বেশ বলবো না।

—শুনুন। কাছেই খুবই কাছে আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া থাকেন। একটা ছোট্ট বাড়ি নিয়ে আছেন। দরকার পড়লে ভাড়া-টাড়াও দেন। একলাই থাকেন। বেশ সাহসী মেয়েছেলে। আর দেখতেও খুব সুন্দরী।

এ্যাত সুন্দর যে মনে হবে হাত না ধুয়ে বুঝি ছোঁয়া যাবে না তাকে। বেশ একটা পবিত্র পবিত্র ভাব আছে। আপনাদের মতো গোঁড়া যারা তাদের খুব খাতির টাতিরও করে। মিনিট খানেকের জন্যে তার সঙ্গে দেখা করেই আমরা ফিরে আসব। ঠিকই শুনতে পাবে যে আমি এসেছিলুম। তখন মনে কষ্ট পাবে—যদি দেখা না করি। বলবে—পুট্রা ভাই! মুখখানাও একবার দেখিয়ে গেলে না! বাঁচলুম কি মরলুম—সে খবরও নিলে না। এমনই ব্যস্ত তোমরা! তা দেখুন, আমি আবার কাউকে কষ্টফষ্ট দিতে চাই না। আর কেনই বা কষ্ট দেবো বলুন! এই মুহূর্তে এখানে পর মুহূর্তেই কোথায় চলে যাব, কে জানে! সেইজন্যে কখনও কাউকে না বলতে পারি না। আমার বউয়ের কথা তো বলেছি। প্রত্যেক মাসে তার বাপের বাড়ি যাওয়া চাইই চাই। প্রথম প্রথম হ্যাঁ বলতুম। পরে না বলতে লাগলুম। এমন কি দরকার পড়লে দু ঘা দিয়েও দিয়েছি। পরে অবশ্য মন খারাপ হয়েছে। গ্রামের সেই গানটা জানেন তো? মন দিয়ে শুনছিলেন আচার্য। মাথা নেড়ে বললেন—না তো!

—সেই গানটা। বউ ঠেঙিয়ে মন খারাপ হলে আবার এসে পায়ে পড়তো মন পাবার জন্যে। বলতো কে বেশি মিষ্টি। আমি না তোমার বাপের বাড়ি। তো, আমিও ঠিক ওমনি ধারা মানুষ।

কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেল ওরা। ছোট্ট একটা বাগান। বাগানের মধ্যে মধ্যে টালি ছাওয়া ছোট্ট একটা বাড়ি।

—আছে তো বাড়িতে? নাকি মেলা দেখতে বেরিয়েছে?

নিজের মনে কথাগুলো বলতে বলতে পুট্রা চেঁচালো।—পদ্মাবতী!

প্রাণেশাচার্য ক্লান্ত হয়ে একটা মাদুরের ওপর বসে পড়েছিলেন। শুনলেন ভারি মিষ্টি একটা নারী কণ্ঠ ভেতর থেকে বলে উঠলো—আসছি।

শোনা মাত্রই ধক করে উঠলো বুকখানা। কণ্ঠস্বর যে শুধু মিষ্টি তাই নয়। যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। কে এই মেয়েটি? কেনই বা পুট্রা আমায় নিয়ে এলো এখানে?

—ও তুমি! তুমি এসেছ? প্রায় নাচতে নাচতে এসে দাঁড়ালো পদ্মাবতী। সবে চৌকাট পেরিয়েছে। একটা হাত থামের গায়ে আলতো করে রাখা।

প্রাণেশাচার্য তাকালেন। হাত দিয়ে বুকের কাপড় টেনে পদ্মাবতীও তাকালো।—কাকে এনেছি জানো ? ইনি একজন আচার্য।
বললো পুট্টা।
পদ্মাবতী সপ্রতিভা। আচার্যর দিকে চেয়ে বললো।
—ওমা! তাই বুঝি! এ্যাদ্দুর টেনে এনেছ ওঁকে ? আমি এখুনি গঙ্গা জল এনে দিচ্ছি। হাত পা ধুয়ে নিন। তারপর দুধ আর একটু ফল খান।
প্রাণেশাচার্য ঘামছিলেন। অনেকটা পথ। তায় পথচলার ক্লান্তি। বেশ অবসন্ন দেখাচ্ছিল ওঁকে। তাহলেও ম্যালেরা শ্রেণীর এই মেয়েটা অচ্ছ্যুত। হয়তো জাতগোত্রহীন ব্রাত্য। একা থাকে। কেন তবে পুট্টা তাঁকে নিয়ে এলো এখানে ? আশ্চর্য। পুট্টা কিন্তু স্তব্ধ হয়ে গেছে। একটাও কথা বলছে না।
আচার্যর হঠাৎ মনে হলো মেয়েটির দুই চোখের অপলক চাহনি সেঁটে আছে তাঁর পিঠের সঙ্গে। তায় চেয়ে দেখছে সে তাঁকে। আর ওর চোখের দৃষ্টির সামনে নগ্ন হয়ে গেছেন তিনি। অদম্য ইচ্ছে হচ্ছিল ঘুরে তাকাতে। কিন্তু ভয় হচ্ছিল চোখে চোখ পড়লে পাছে কিছু ঘটে যায়। হয়তো তখন নিরাকার কোনো কামনা আকার পেয়ে বসবে। বড় বড় কালো দুটি চোখ। বিনুনিটা কৃষ্ণবর্ণ সাপের মতন কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে একদিকের স্তনের ওপর। সেই বেদেনীর শরীরটা দুলছিল না বাঁশের আগায়! ডানার ঝট-পটানি—ঝকঝকে ছুরির ফলা! চতুর্দিকে ছড়ানো পালক ! হঠাৎ মনে পড়লো ঘন বনের মধ্যে চন্দ্রীর দুটি সুপুষ্ট স্তনের স্পর্শ। মনে পড়ে গেল বেল্লার মেটে রঙের স্তনের কথা।
মেয়েটির অপলক দৃষ্টির সামনে ধরা পড়ে গেছেন তিনি। সম্মোহিত পাখির মতন ধীরে ধীরে অবশ হয়ে যাচ্ছেন। কৃষ্ণবর্ণ সাপটার দুটি আগ্রাসী দৃষ্টির সামনে কেমন যেন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ ঘুরে তাকালেন। যা আশা করেছিলেন ঠিক তাই। মেয়েটা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে। একহাতে বিনুনি ধরা। চোখদুটো দরজার দু পাল্লার ফাঁকে লাগানো। আচার্য তাকাতেই সরে গেল মেয়েটা। চুড়ির রিনিঝিনি শোনা গেল। পরমুহূর্তেই এসে দাঁড়ালো সামনে। চাহনিতে আর সেই ছটফটানি নেই। কামনা যেন স্থির মূর্তি

পেয়েছে শরীরের মধ্যে। বিনুনির গিঁট খুলতেই যেন নিচু হতে হলো তাকে। পরিপূর্ণ দুটো পয়োধর যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল ব্লাউজের বন্ধনী ভেদ করে। চোখের আয়ত দৃষ্টি গভীর হলো। আচার্যর মনে আগুন জ্বলে উঠলো। ভুলে গেলেন পারিপার্শ্ব। ভুলে গেলেন নিজের পরিচয়। ভুলে গেলেন যে পরিপূর্ণ ভাবে তিনি ধরা পড়ে গেছেন মেয়েটির কাছে। নিষ্পলক চেয়ে রইলেন পদ্মাবতীর দিকে। তাঁর মনের কামনা ফুটে উঠলো দৃষ্টির মধ্যে।

—কোত্থেকে যেন আসছেন উনি?

পুট্টার দিকে চেয়ে বললো পদ্মাবতী।

—উনি আসছেন কুন্দপুর থেকে।

তারপর একটু মিথ্যে জুড়ে দিয়ে বললো।

—উনি শিনাপ্পাকে চেনেন। মন্দির দেখাশোনার দায়িত্ব ওঁরই ওপর। এখানে এসেছেন প্রণামীর টাকা তুলতে!

ভালোমন্দ সত্য মিথ্যায় মেশানো পুট্টার বর্ণনা আচার্যকে এক শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিত্ব করে তুললো পদ্মাবতীর কাছে। ভিনদেশীয় মানুষের চোখে এক এক-জনের এক একরকম রূপ। প্রাণেশাচার্য নিজেও যেন নিজের যথার্থ পরিচয় হারিয়ে ফেলেছেন।—এই কি আমি? একদিনের মধ্যেই কত রকমের মানুষ হলাম। যাক, হচ্ছে যা তা হোক। দেখা যাক কোথায় গিয়ে এর শেষ হয়। মনে পড়ছিল টুকরো টুকরো নানা ঘটনা। মোরগগুলোর সেই সর্ব-নাশী রূপ। ভগীরথীর শেষ করুণ বিলাপ। উঃ! কী করুণ সেই বিলাপ ধ্বনি! তারপরেই স্থির হয়ে গেল তার শরীরটা। শ্মশানে পোড়ানো হলো তাকে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল পঞ্চভূতের দেহখানা। ভগীরথী চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন চলে গেল আমারও আত্মা। এসে পড়লাম রৌরব উপকণ্ঠে এখন কি আবার আমার উত্তরণ হবে? উঠে আসতে পারবো আচ্ছন্ন পরি-বেশ থেকে? হয়তো।

আচার্যকে সোজাসুজি দেখবে বলেই যেন পদ্মাবতী সরে দরজার গোড়ায় বসলো। তারপর তাকিয়ে রইলো আচার্যর দিকে। মনে মনে দুর্বল হয়ে পড়-ছিলেন আচার্য। এক সময় যথেষ্ট সাহস নিয়ে ঘুরে তাকালেন। চোখা-

চোখি হলো পদ্মাবতীর সঙ্গে। বুকের মধ্যে যেন ঢাক পেটাপেটি শুরু হয়ে গেল। পদ্মাবতী উঠলো। ঘরের ভেতর থেকে বারকোষের ওপর পান সুপুরি সাজিয়ে আনলো। পানের গায়ে চুন লেপে মুখে পুরতে পুরতে পুট্টা কিছু একটা বলতে গেল। পদ্মাবতী সরে গিয়ে বসলো দরজার গোড়ায়। এক-টুকরো সুপুরি মুখে ফেলে পুট্টা বললো।

আচার্যের সঙ্গে আমার রাস্তায় দেখা। গল্প করতে করতে আমরা এলুম এতটা পথ, উনি যাবেন কুন্দপুর। তা আমি বললুম আজকের রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল তীর্থহল্লী থেকে বাস ধরে কুন্দপুর যাবেন। কেমন, ভালো বলি নি ?

পদ্মাবতী একটু যেন থমকাল। তারপরই সহজ হয়ে বললো।

—ঠিকই তো। আজকের রাতটা এখানেই বিশ্রাম নিন না ! কাল ভোরেই যাবেন'খন।

প্রাণেশাচার্য মনে মনে দুর্বল বোধ করতে লাগলেন। কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছে। হাতের চেটো ঘামে চটচটে। চিৎকার করে মন বলতে চাইছে। না। না। আজ কিছুতেই নয়। এখনো তাঁর অশৌচ কাটে নি। স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি শেষ করেই বেরিয়ে পড়েছেন পথে। এখনও চান করে শুদ্ধ হন নি। নারাণাপ্পার বাসি মড়া পড়ে আছে। তার সৎকারের কোনো ব্যবস্থা না করেই চলে এসেছেন। এ কথাগুলো তাঁর বলা দরকার। এখান থেকে যত দূর সম্ভব চলে যাওয়া দরকার।

কিন্তু বলি বলি করলেও মুখে কিছুই বলতে পারলেন না তিনি। স্থির অনড় একখণ্ড পাথরের মতো বসে রইলেন আচার্য ! পদ্মাবতীর পরিপূর্ণ দৃষ্টির সামনে।

পুট্টা বললো —এখনও কিছু খান নি আচার্য। আমরা তাই মন্দিরে যাচ্ছি। ঠাকুরের ভোগ বিতরণ হচ্ছে। ঠাকুর দর্শন করে ভোগ খেয়ে আবার আসবো। আচ্ছা ! ধর্মস্থলীর দল এসেছে না গাওনা গাইতে ! শুনতে যাবে না ?

পদ্মাবতী মাথা নাড়লো। বললো।

—না। ঠাকুর দর্শন করতে মন্দিরে যাব বিকেলে। তোমাদের জন্যে আমি অপেক্ষা করবো কিন্তু ! পদ্মাবতী আর পুট্টার মধ্যে নিশ্চল হয়ে বসেছিলেন

আচার্য। কোনো সাড়াশব্দ ছিল না শরীরে। হঠাৎ পুট্টা উঠে দাঁড়ালো। বললো—চলুন যাই!

আচার্যও উঠে দাঁড়ালেন। পদ্মাবতীর চোখের দিকে তাকালেন। কামনার ধিকিধিকি আগুনে পুড়ছে মেয়েটা। রুক্ষ চান করেছে। মাথায় তেল দেয় নি। লম্বা চুল রুক্ষ। গড়ন পেটন ভারি গোছের আর লম্বা। মাংসল উরু-দেশ। ভরাট বুক। গুরু নিতম্ব। মনে হয় ঋতুমতি হয়েছিল সম্প্রতি। ঋতু-কাল সদ্য শেষ হয়েছে। উদ্ধত বুক ওঠানামা করছে নিশ্বাসের সঙ্গে। হস্তাবলেপনের আকাঙ্ক্ষায় স্তনবৃন্ত উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে কখন কঠিন হবে।

সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর ভেসে উঠলো আর একটা ছবি। শ্মশানে অগ্নির লকলকে জিভের ছোঁয়ায় দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে জ্বালানি কাঠ। অনলের লেলিহান আগ্রাসী শিখা স্পর্শ করছে হাত পা পেট। শব্দ উঠছে হিসহিস। ফট করে ফাটছে মাথার খুলি। বুকের ওপর আগুনের শিখা ধেয়ে উঠে নৃত্য করছে যেন।

আগুন। নারাণাপ্পার শবটা এখনো ছোঁয়া পেল না আগুনের পরশমণির। বাঁশের খাটিয়ার ওপর দুলতে দুলতে চলেছে ভগীরথীর শব! বৈদিক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—ভালবাসো! কিন্তু কাকে ভালবাসা? নিজের পত্নী না ঈশ্বর! দুইয়ে অনেক তফাৎ। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম। প্রাণেশাচার্য ভাবলেন প্রেমের উৎস কোথায়—তিনি খুঁজে দেখবেন। মনে পড়ল ঋষি ব্যাসদেবের কথা। ব্যাস-দেব তো কৃচ্ছ্রসাধক এবং মুনির জলপূর্ণ পাত্রে জন্মেছিলেন। চিন্তাগুলো অসংলগ্ন। দানা বাঁধছে না।

ভাবতে ভাবতে এগোলেন প্রাণেশাচার্য। হঠাৎ শুনলেন পদ্মাবতী বলছে।
—তোমরা আসছ তো? আমি কিন্তু অপেক্ষা করবো!

ভগবান মারুতি যেন সত্যিই তাঁর স্খলন ঘটিয়েছেন। তাই বন্ধু হয়েও মহাবল তাঁকে ঠকালো। নারাণাপ্পা মরেও শত্রুতা করে চলেছে। সোনার লোভে ব্রাহ্মণরা আত্মহারা। আর তিনি? অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল চন্দ্রী। কামনা চরিতার্থ করে, তাঁকে স্খলিত করে চলে গেল

স্বৈরিণী। অবহেলা করেছেন ভগীরথীকে। শরীরের কষ্ট সইতে না পেরে একবারই চিৎকার করেছিল বেচারি। তারপরই সব শেষ।

আত্মমগ্ন হয়ে হাঁটছেন প্রাণেশাচার্য। হঠাৎ কাঁধের ওপর পুট্টার হাতখানা এসে পড়ায় চমকে উঠলেন। মাঠের ধারে দাঁড়ালো পুট্টা। তিনিও দাঁড়ালেন।

—কেমন দেখলেন পদ্মাকে? যা ভাবছেন তা নয়। সাধারণ বাজারে বেশ্যা ও নয়। কোনো বাজে লোক ওর কাছে ঘেঁষতে পারে না। এমন কি সাধারণ বামুনদেরও পাত্তা দেয় না। আর দেবেই বা কেন! টাকা পয়সার পরোয়া তো নেই। একটা ছোটখাট তালুক আছে ওর। আর রূপ! নিজের চোখেই তো দেখলেন! আমাদের প্রাচীন মুনিঋষিদেরও মাথা ঘুরে যেত ওই রূপ দেখলে। তা আপনার ভালো লাগে নি? নিশ্চয় লেগেছে। বুঝলেন আচার্য! এই পুট্টাকে যখন বন্ধু বলে ভেবেছেন তখন জানবেন আপনার ভালো হয় না এমন কাজ সে করবে না।

ওরা পেরিয়ে এলো মাঠটুকু। পেরিয়ে এলো আল দেওয়া জমির সীমানা। সাঁকোর ওপর দিয়ে হেঁটে গলিপথ পেরিয়ে একেবারে এসে পড়লো মেলার কোলাহলের মধ্যে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেছে জটলা। কেউ রথের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ জটলা করছে সোডা লেমনেডের দোকানের সামনে। একদল দাঁড়িয়ে পড়েছে বাঁদর-খেলা-দেখানো লোকটার চারপাশে। বাচ্চারা কেউ খেলনা ঢোল কেউ বা বেলুন নিয়ে ব্যস্ত। এত ব্যস্ততা, এত কোলাহলের মধ্যেই যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে শয়তানের চর!

শহর থেকে এসেছে লোকটা। ঢোল-শোহরৎ দিচ্ছে। ডিম ডিম ডিম। শোনো! শোনো! শিমোগাতে প্লেগ মড়ক দেখা দিয়েছে। যারা শিমোগা যেতে চাও তারা আগে তীর্থহল্লীতে নেবে টিকে নিয়ে তবে শিমোগা যেও। এ হলো সরকারী আদেশ। ডিম ডিম ডিম!

হাতে পানীয়ের বোতল নিয়ে অনেকেই শুনলো সরকারী ঘোষণা। কেউ কেউ অবশ্য বাঁদরের বাঁদরামি দেখতেই মজে আছে। এদিকে মন দিলো না। খানিক ওপাশে কান্নাড়া আর উর্দু দু'ভাষাতেই তারস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল আর একজন। একটা বড় জটলা সেখানেও দাঁড়িয়ে। লোকটা

গাছগাছড়ার ভেষজ গুণ দেখাচ্ছে লোকদের। কখনো কান্নাড়া কখনো উর্দুতে বলে যাচ্ছে—মাত্র এক আনা। পেট ব্যথা, কান কটকট, হাঁটু ঝন-ঝন, জ্বরজারি, হাঁপানি, সর্দি—সব রোগের মহৌষধ, এই একটি বড়ি। মন্ত্র-পূত এই বড়িটি সাধারণ বড়ি নয়। কেরালার পণ্ডিতরা এই বড়িটি মন্ত্র পড়ে তৈরি করেছেন। দাম মাত্র এক আনা।

সেই তামাসাওলা ঠিক তেমনিভাবেই ঘুঙুর পায়ে নাচছে। আর চিৎকার করে বলছে—দেখো! দেখো! তীরুপতিকা ঠাকুর দেখো! তিমাপ্পা দেখো! বোম্বাই কা ছুকড়ি দেখো!

হঠাৎ সড়াক করে বিদ্যুৎবেগে লম্বা দড়ি বেয়ে নেমে এলো একটা লোক। মাটিতে নেবেই লম্বা সেলাম ঠুকলো। প্রাণেশাচার্য অবাক। দেখলেন দড়ির একটা দিক মাটির সঙ্গে পেরেক দিয়ে গাঁথা। অন্য প্রান্ত গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা। বাচ্চা একটা ছেলে ককিয়ে কেঁদে উঠলো। বায়না ধরেছিল বেলুন কিনবে। বাপ দিয়েছে সজোরে চড় কষিয়ে। গ্রামোফোনে গান বাজছে কফির দোকানে। মুসলমান মিষ্টির দোকানে রঙবেরঙের মিষ্টির ডালা সাজানো। একঘেয়ে টেনে টেনে একটা বিশেষ গ্রাম্য ঢঙে কথা বলে চলেছে পুরুষ চাষী আর তার মেয়েছেলে। একটা সুখা গুঞ্জন উঠছে ওদের ঘিরে।

রথের মাথায় বসে শাস্ত্রপাঠ করছে পণ্ডিতরা। তাদের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে মিশে গেছে স্মার্ত ব্রাহ্মণদের জনান্তিক বাক্যালাপ। সব মিলেমিশে একটা সোরগোল হচ্ছে সেখানে। প্রাণেশাচার্য ভাবলেন তাঁকে আজ এই মুহূর্তেই পথ ঠিক করে ফেলতে হবে। গত পঁচিশ বছর ধরে এই নকল সংযমের জীবন যাপন করে চলেছেন। শাসন আর নিষেধের বেড়ার মধ্যে প্রাণ পিষে গেছে যেন। কিন্তু আর টানতে পারছেন না তিনি। একদিকে পৃথিবীর আলো হাসি গান—অপর্যাপ্ত সুধা সৌন্দর্য! কিন্তু পিঠ ফিরিয়ে আছেন তিনি। কি দাম এই কৃচ্ছ্র-সাধনার! অবশ্য তার আগে নারাণাপ্পার অন্ত্যে-ষ্টির ব্যবস্থাটা সেরে ফেলতে হবে। গরুড়, লক্ষ্মী হয়তো এতদিনে বিধান নিয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু? আবার যেন দোটানায় পড়ে গেলেন আচার্য। ওদের গুরুদেব যদি বিধান না দেন? তাহলে? তিনি তো এগিয়ে যাবার

পরামর্শ দিতে পারেন না ওদের ?

মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন প্রাণেশাচার্য। একজন অন্ধ একতারা বাজিয়ে গুনগুন করে গান গাইছে—। হে নাথ ! কেমনে পূজিব তোমায়, হে নাথ ! কেমনে ভজিব !

পুট্রা যেই ওর পাত্রে একটা পয়সা দিলো ওমনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দাঁড়ালো আর একজন। কাঠের হাত পা। পুট্রাকে দেখে হাউহাউ করে উঠলো খঞ্জটা।—বাবা ! আমি বড় পাপী। আমার হাত নেই পা নেই। বলতে বলতে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো লোকটা। তারপর আধখানা হাত পা দিয়ে নিজেকে মারতে লাগলো। ক্ষয়ে যাওয়া আঙুলগুলো দেখিয়ে ক্রমাগত ঘ্যানঘ্যান করতে লাগলো। প্রাণেশাচার্য স্তম্ভিত হয়ে কুটে ভিখারিটার আত্মপীড়ন দেখছিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মনে হলো নারাণাপ্পার দেহ-টাও হয়তো এতক্ষণে পচতে শুরু করেছে। পচে গলে বীভৎস হয়ে উঠেছে। পুট্রা তার দিকেও পয়সা ছুঁড়ে দিলো। দেখা গেল আরও আরও বিকৃত মানুষের দল এগিয়ে আসছে। আচার্য আতঙ্কিত হয়ে বললেন—আর নয়। আর নয়। এগিয়ে চলো !

পুট্রা বললো।

—আপনি এগোন। ভোগ বিলির সময় হয়েছে। বসে পড়ুন পঙ্‌ক্তিতে।

—আর তুমি ? বসবে না ?

অকস্মাৎ একটা ভয় চেপে বসেছে তাঁর মনে ? একা ওই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তিতে বসবেন ? যদি চিনে ফেলে কেউ ? পুট্রাকে সঙ্গে না নিয়ে এই অপরিচিত সমাহারে বসতে যেন দ্বিধা হচ্ছে তাঁর। কিন্তু পুট্রা খুব আশ্চর্য হলো।

—কি বলছেন ? জানেন না আমি ম্যালেরা—অচ্ছুৎ ?

কিন্তু পুট্রাকেও আশ্চর্য করে আচার্য বললেন।

—তাতে কি ? আমি বলছি। তুমি এসো আমার সঙ্গে।

—ঠাট্রা করছেন আপনি ? অচেনা জায়গা হলেও না হয় কথা ছিল। চেষ্টা করতে পারতাম। যেমন সেবার সোনার বেনেদের ছেলেটা পরিচয় লুকিয়ে মঠের মধ্যে কাজ পেয়েছিল। আমিও তেমনি পরিচয় লুকিয়ে বসে যেতে

পারতাম ওদের সঙ্গে। কিন্তু এখানে যে সবাই আমার চেনা! যদিও আমাদেরও পৈতে হয়—আমারও আছে। তাহলেও···

একটু থেমে পুট্টা আবার বললো।

—না আচার্য। বামুনদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে ভোজ খাবার দুঃসাহস আমার নেই। আপনি যান। আমি আপনার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি।

ভিখারিদের সমস্বর একঘেয়ে কান্না আর বিলাপ অসহ্য হয়ে উঠছিল। আর যেন সইতে পারছেন না আচার্য। পুট্টাকে দ্বিতীয়বার অনুরোধের চেষ্টা আর তিনি করলেন না। ধীরে ধীরে মন্দিরের মধ্যে অন্তর্হিত হলেন!

মন্দিরের চারপাশে উঁচু দাওয়া। দাওয়ার ওপর সারিসারি কলাপাতা পেতে আসন করা হয়েছে। পাশাপাশি বসে ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করছে ক্ষুধার্ত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরা। প্রাণেশাচার্য ওদের দিকে তাকালেন। ভয়ে ঢিপঢিপ করছে বুক। চিনতে পারবে না তো? একবার ভাবলেন ধীরে ধীরে সরে পড়বেন। কিন্তু পা দুটো যেন গেঁথে আছে মাটির সঙ্গে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো এ আমি কি করতে চলেছি? এখনো যে অশৌচকাল কাটে নি? চান করে শুদ্ধ না হওয়া অব্দি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একাসনে বসে অন্নগ্রহণ করবো? সে যে মহাপাপ? নিজের তো বটেই অন্যদেরও শুচিতা নষ্ট করবো? ব্রাহ্মণ হয়ে শূদ্রের মতন কাজ করব? নারাণাপ্পার কথা মনে পড়লো। মন্দির সংলগ্ন পুকুর থেকে চাষ করা মাছ তুলে এনেছিল সে। গর্হিত কাজ। কিন্তু তার চেয়েও মহাপাপ করতে চলেছেন তিনি। এখন যদি সবাই তাঁকে চিনে ফেলে! আঙুল দেখিয়ে বলে এই সেই লোক। এরই স্ত্রী সদ্য বিগত। এখনো অশৌচান্ত হয় নি। অথচ দেখ দিব্যি আমাদের সঙ্গে একাসনে বসে মহাপ্রসাদ খাচ্ছে! তাহলে? রথযাত্রার এতবড় উৎসব কলুষিত হয়ে যাবে না! সবাই তাঁর দিকে তখন ঘৃণার চোখে তাকাবে। বলবে—এই সেই অর্বাচীন। মনে মনে যেন কেঁপে উঠলেন প্রাণেশাচার্য। পরিবেশনকারীদের কে একজন চেঁচিয়ে ডাকলো তাঁকে।

—এই যে শুনছেন! এদিকে একটা খালি পাতা আছে। আসুন!

ইতস্তত করছেন প্রাণেশাচার্য। এখন কি করবেন? এদিক ওদিক তাকা-লেন। যে সারিতে দাঁড়িয়েছিলেন সেই সারির শেষে বসা ব্রাহ্মণটি হাত নেড়ে ডাকছে। দেখেছেন আচার্য। কিন্তু কি করবেন ভেবে না পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

--শুনতে পাচ্ছেন না?

ব্রাহ্মণের গলা আবার শোনা গেল। হাসতে হাসতে প্রাণেশাচার্যর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো লোকটা। তারপর নিজের আসনের পাশে খালি পাতটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বললো।

—দেখুন! আপনার জন্যে কেমন আটকে রেখেছি জায়গাটা। এটা না পেলে পরের পঙ্‌ক্তির জন্যে অপেক্ষা করতে হতো আপনাকে। প্রাণেশাচার্য প্রায় যন্ত্রের মতন এগিয়ে গেলেন লোকটার দিকে। তারপর বসে পড়লেন খালি পাতার সামনে। ভয়ে ঝিমঝিম করছে মাথা। অথচ কেন এই ভয়? এই মর্মপীড়া? নবজন্ম হতে চলেছে তাই কি এই মানসিক পীড়ন? পদ্মাবতীর মতন নারী-সহবাসে কি কেটে যাবে এই ভয়!—কি আমার করণীয়! অনিশ্চয়তার দুর্বলতা চিরদিনই তাঁকে ইতস্তত করিয়েছে। পঙ্‌ক্তিভোজে বসবেন, না চলে যাবেন—কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারলেন না। এখন যদি কাছে পুট্টা থাকতো! পুট্টার অভাব বোধ করলেন তিনি। উঠে যাবেন! কিন্তু পাশের লোকটা কি ভাববে?

সামনা সামনি বসা দুই সারির মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ। একজন ব্রাহ্মণ সেই সরু পথ বেয়ে চলেছেন।

দু'সারির প্রতিটি পাতা জল দিয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছেন। পুণ্যবারি। ব্রাহ্মণের প্রায় পিছু পিছু এসে পড়লো পরিবেশনকারী। প্রত্যেক পাতে একহাতা করে পায়েস ঢেলে দিয়ে গেল। তার পেছনে বলিষ্ঠ চেহারার আরও দু'জন পরি-বেশনকারী। একজন আনছে ভাত। আনতে আনতেই চেঁচাচ্ছে - সরো! পথ ছাড়! পরের পদ শশা আর মসুরের স্যালাড। একজন করে আসছে আর আচার্যর মনে আতঙ্ক হচ্ছে। এই লোকটা যদি চিনে ফেলে আমায়? কি করবো তখন?

পাশের লোকটা, যে তাঁকে ডেকে জায়গা দিয়েছে, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে

তাঁর দিকে। ভীমের মতন বিশাল চেহারা। গায়ের রঙ ঘোর কালো। কপালে মণ্ডলাকার চন্দনের তিলক। লোকটা নিশ্চয় স্মার্ত। যখনই তাকাচ্ছে তখনই আতঙ্কে কুঁকড়ে যাচ্ছেন প্রাণেশাচার্য। মনে মনে আরও দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন লোকটার কথা শুনে। নানারকম প্রশ্ন করে চলেছে লোকটা। ছোট ছোট উত্তর দিচ্ছেন আচার্য।

—কোত্থেকে আসছেন?

—এই তো এখান থেকেই।

—এখান থেকে মানে? পাহাড়ের এদিক না ওদিক?

—কুন্দপুর থেকে।

—কোন্ সম্প্রদায়?

—বৈষ্ণব।

—শ্রেণী?

—শিভাল্লী?

—আমি হলুম কোটা শ্রেণীর? গোত্র?

—ভরদ্বাজ।

—আমার অঙ্গীরা। যাক আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে উপকার হলো।

আচার্য তাকালেন। লোকটা বলে চললো।

—আমার একটি কন্যা আছে। বিয়ের বয়স না হলেও বিয়েটা দিয়ে দেবো ভাবছি। কি জানেন! বয়ঃসন্ধি অব্দি অপেক্ষা করে কন্যাকে বিবাহগত করাটা আমরা আচার-ভ্রষ্টতা ভাবি। তাই ভাবছিলুম সদ্বংশজাত সুপাত্র যদি পাই···তা আপনার গোত্রভুক্ত সুপাত্র আছে? যার হাতে মেয়েকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি; মানে বুঝতেই পারছেন—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা—দায়মুক্ত হয়ে একটু নিশ্চিন্ত হতুম আর কি।

খানিক থেমে ব্রাহ্মণ আবার বললো।

—চলুন না। খাওয়াদাওয়ার পর আমার বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসবেন। মেয়ের ঠিকুজির একটা নকল আপনাকে দেবো। তাছাড়া আজকের রাতটা না হয় আমার ওখানেই কাটাবেন!

পাতার ঠোঙায় করে সরু নিচ্ছিলেন প্রাণেশাচার্য। চোখ তুলে তাকাতেই

পরিবেশনকারীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। লোকটা বেশ মনোযোগ দিয়ে তাঁকে দেখলো তারপর পাশে সরে গেল।

গল্প করার মতন মনোভাব প্রাণেশাচার্যর নেই। তবুও একটা জবাব দিতে হয়। তাই ছোটো করে পাশের ব্রাহ্মণকে বললেন—তা বেশ তো!

মনের মধ্যে ভয়ের দানাটা বেশ কিরকির করছে। এখুনি যে লোকটা সরু পরিবেশন করে গেল সে কি তাঁকে চেনে? তা কি করে সম্ভব? আবার মনে হলো অসম্ভবই বা কেন? লোকটা, যতদূর মনে হয়, মাধ্বীশ্রেণীর। চিনতে পারাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সকলের সঙ্গে শ্রীমদ রামগোবিন্দায়—মন্ত্রোচ্চারণ করে গণ্ডূষের জল দান করে খেতে বসলেন আচার্য। তারপর গরম ভাতের সঙ্গে সরু মেখে খেতে খেতে মনে পড়লো—কতদিন, কতদিন তাঁর কপালে ভাত জোটে নি!

কিন্তু ঠাকুর! এ কোন্ বিপর্যয়ের মধ্যে আমায় ফেললে? ভয়। এই সন্দেহ—এর থেকে কি মুক্তি নেই? সর্বক্ষণই মনে হচ্ছে এই বুঝি ধরা পড়ে গেলুম। খেতে খেতে দ্রুত চিন্তা করে যাচ্ছে মন। নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারেন নি কখনো। সব কাজেই পাঁচজনকে জড়িয়েছেন। নারাণাপ্পার শেষকৃত্যের ব্যাপারটাই ধরা যাক।—আমি নিজেই তো সব দায়দায়িত্ব নিয়ে কাজকর্ম সেরে দিতে পারতুম! কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? শবদেহটা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতেও তো তিনি ছাড়া আরও তিনজন মানুষ দরকার! তাহলে কেন তিনি বিচলিত হচ্ছেন? আসলে আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকেই গড়ে উঠেছে তাঁর চরিত্রের এই ভয়, অনিশ্চয়তা। চন্দ্রীর সঙ্গে সহবাস করেছেন। একদিকে যেমন নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন তেমনি মনে হয়েছে এই অব্রাহ্মণোচিত প্রবৃত্তি কলুষিত করলো সমস্ত সমাজকে। অপরাধ বোধে নিজের কাছেই ছোটো হয়ে গেছেন।

যে লোকটা 'সরু' পরিবেশন করছিল সে আবার সামনে এসে দাঁড়ালো। একবার চিৎকার করলো—'সরু' 'সরু' বলে। কেউ 'সরু' নেবেন? তারপর আচার্যর মুখের দিকে চেয়ে বললো।

—আপনি নেবেন 'সরু'?

ভয়ে ভয়ে চোখ তুললেন আচার্য।

লোকটা হঠাৎ বললো।

—কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে ?

—অসম্ভব নয়। হয়তো দেখেছেন।

মিনমিন করে জবাব দিলেন আচার্য।

লোকটা কিন্তু এ প্রশ্ন নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করলো না। সরে গেল পাশের সারিতে। ঈশ্বরের কি অসীম করুণা! তবুও যেন আচার্যর মনে হলো লোক-টার চোখ দুটো তাঁর কথাই ভাবছে। একদণ্ডও তাঁর চিন্তা থেকে মুক্ত নয়।

মনের গভীরে ডুবুরি নামিয়ে তাঁর পরিচয় খুঁজছে লোকটা। অথচ কী তাঁর অপরাধ! চন্দ্রীকে নিয়ে ঘর করতে গেলেও পদে পদে সংস্কার এসে বাধা দেবে; অথচ এ তাঁর নিজস্ব, ব্যক্তিগত। ওৎ পেতে বসে আছে নানা আচার, নানা সংস্কার। হঠাৎ থাবা বাগিয়ে তাঁকে আক্রমণ করবে। বর্ণ, শ্রেণী, গোত্র, বংশ নিয়ে প্রশ্ন করবে।

ব্রাহ্মণত্বের সবটুকু ছাড়তে না পারলে সংস্কার মুক্ত জীবন তিনি পাবেন না! সংস্কারকে পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই। যতক্ষণ না গর্বটুকু ছাড়তে পারছেন। কিন্তু শুধু তো গর্ব নয়। ব্রাহ্মণত্ব ছাড়ার পর জীবনধারণের আর কোনো স্বাদই থাকবে না। মুরগি লড়াইয়ের নৃশংস উল্লাসের মধ্যেই জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে। পুড়তে হবে তিলে তিলে। ছটফট করে উঠলেন আচার্য। এই না ঘরকা না ঘাটকা অবস্থা থেকে কি মুক্তি নেই তাঁর ?

পাশে বসে যে খাচ্ছিল সে হঠাৎ বলে উঠলো—এটা কি 'সরু' না গঙ্গাজল! তারপরই আচার্যর দিকে চেয়ে বললো।

—আরে মশাই! আপনি তো দেখছি স্রেফ 'সরু' খেয়েই পেট ভরাবেন! আস্তে আস্তে খান। অন্য পদ আছে—মিষ্টান্ন আছে। সেই পরিবেশনকারী আবার এলো। হাতে গামলা ভর্তি গরম গরম ডালনা। প্রাণেশাচার্যর সামনে দাঁড়ালো সে।

—কোথায় দেখেছি বলুন তো আপনাকে ? কিছুতেই মনে করতে পারছি না! মঠে ? পূজোটুজোর সময় রান্নার কাজ করতে যেতে হয় মঠে। এই তো গত পরশুই গিয়েছিলুম। সেখান থেকেই তো আসছি!

কথাগুলো বলে আর দাঁড়ালো না লোকটা। তাড়া ছিল মানুষটার। ডালনা—ডালনা! বলতে বলতে সরে গেল তখুনি।

আচার্যর মনে হলো আর বসে থাকাটা বোধহয় সমীচীন হবে না। চুপিসাড়ে সরে পড়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পা দুটো যেন অসাড় হয়ে গেছে। এইসময় পাশের লোকটা হঠাৎ বলে উঠলো।

—মেয়ে আমার খুব নরম স্বভাবের। বড়দের মান্য করতে জানে। আর তেমনি রান্নার হাত মশাই! আমার খুব ইচ্ছে শ্বশুর শাশুড়ী দেখে বে দিই। তাতে মেয়ে আমার সহবত শিক্ষা পাবে।

লোকটা ব'কে যাচ্ছে বটে কিন্তু আচার্যর কানে তা ঢুকছিল না। তিনি তখন অন্য কথা ভাবছিলেন। এই অহেতুক ভয় আর আতঙ্ক থেকে রেহাই পাবার একটাই পথ। মন শক্ত করে অগ্রহারে ফিরে যাবেন। লক্ষ্মণ, গরুড়দের ডেকে পাঠাবেন। নারাণাপ্পার শেষকৃত্যর সব দায় নিজের কাঁধে নেবেন। কারণ তিনি জ্যেষ্ঠ। এর জন্যে যদি প্রয়োজন হয় ত্যাগ করবেন ব্রাহ্মণত্বের দম্ভ। সিদ্ধান্ত যা নিয়েছেন নিঃসঙ্কোচে তা বলতে হবে সকলকে। ফাঁকা আর মেকী গর্বের যে খোলসটা ছিল সেটা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। দাঁড়াতে হবে সকলের চোখের সামনে। আর তা যদি না পারেন তাহলেই পদে পদে ভয় তাঁকে পেয়ে বসবে। ক্রমাগত তাড়নায় ক্ষীণ হয়ে যাবেন তিনি।

নারাণাপ্পার কথা মনে পড়লো। মন্দিরের পুকুর থেকে মাছ তুলে মানুষটা সারা অগ্রহারের মৌল সংস্কারবোধকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল যেন। ঠিক তেমনি করেই সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোর ওই ব্রাহ্মণ্য গর্ব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবেন তিনি। কি বলবেন তাদের? যা সত্য তাই বলবেন। বলবেন চন্দ্রীর মতন বারাঙ্গনার সঙ্গে তাঁর যৌন মিলন হয়েছে। স্ত্রীকে অবহেলা করেছেন। রাস্তার দোকান থেকে কফি কিনে খেয়েছেন। অচ্ছুৎদের সঙ্গে মুরগি লড়াই দেখেছেন। পদ্মাবতীকে দেখে কামমুগ্ধ হয়েছেন। অশৌচ কালে অন্য ব্রাহ্মণদের পঙক্তিভোজে বসে মহাপ্রসাদ খেয়েছেন। এমন কি একজন অচ্ছুৎ ম্যালেরা ছোকরাকে ভোজে বসতেও ডেকেছেন, এ সবই ঘটনা, স্বীকারোক্তি নয়। অনুশোচনা নয়, জীবনের চরমতম সত্য। আর এই সত্যের পরেই

তাঁর পরমতম সিদ্ধান্ত। তাই তো বাঁধন কেটে বেরিয়ে পড়তেই হবে তাঁকে।

পাশের লোকটা খেতে খেতে ক্রমাগত বকেই চলেছে।—মেয়ে আমার কালো। দরকার পড়লে বরপণ দেবো বৈকি! নিশ্চয়ই দেবো না দিলে মেয়ে পার করবো কি ক'রে! অবিশ্যি মেয়ের আমার ঐ একটাই খুঁত। রঙটা কটা নয়। তা বাদে মুখচোখ দেখবার মতন, ভারি লক্ষ্মীমন্ত স্বভাব। যে ঘরে পা দেবে সে ঘরে বাঁধা থাকবে লক্ষ্মী। ওর কোষ্ঠী দেখেছি তো! যাকে বলে রাজযোটক সমাবেশ।

কানে শুনছিলেন আচার্য। কিন্তু মন পড়েছিল অন্যত্র। অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে নিজের ভাবনাই ভেবে চলেছিলেন তিনি। যদি সকলের কাছে স্বীকার করতে না পারেন? নারাণাপ্পার শবদেহটার যদি শাস্ত্রমতে সৎকার না হয়? হঠাৎ মনে হলো—ভয় থেকে তো আমি মুক্ত হতে পারলাম না? চন্দ্রীর সঙ্গে ঘর করি তাহলে সকলকে জানিয়েই করবো। যদি না পারি বুঝতে হবে মনে পাপ। তাই এই ভয়! মোটকথা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলা দরকার। পরোক্ষ নয় প্রত্যক্ষ ভাবে চোখের ওপর চোখ রেখে সোজাসুজি ঘটনা স্বাকার করবো। এড়িয়ে গিয়ে পাশ কাটিয়ে কতদিন আর লুকিয়ে রাখবো নিজেকে! জানাজানির আশঙ্কাতেই তখন সারাজীবন কাটাতে হবে আমাকে। কিন্তু আমার নিজের জীবনের এই ওলটপালট করা সিদ্ধান্তের কথাটা লোককে জানিয়েই বা কী লাভ! অকারণ তাদের আচ্ছন্ন করে দেওয়া। সে অধিকার কি আমার আছে! ব্রাহ্মণত্বের যে সংস্কার নিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে আছি তাকে চিরে চিরে লোককে দেখানোর কী সার্থকতা?

নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠলেন প্রাণেশাচার্য।—ঠাকুর! এমন প্রত্যক্ষভাবে কেন আমায় জড়ালে? যা ঘটবার তা ঘটবেই। অজান্তেই ঘটুক তা। যেমন ঘটেছিল সেদিন—যেদিন বনের আড়ালে আঁধার রাতে চন্দ্রীর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধটা হঠাৎই আবিষ্কার করেছিলাম আমি। তেমনি করে তো সব ঘটনাই ঘটতে পারে! তাহলে অন্তত আগ্রহ করে একটা সিদ্ধান্ত নেবার দায় থেকে মুক্ত হতে পারি আমি। চোখের পলক পড়বার

সঙ্গে সঙ্গেই সব সংস্কার কাটিয়ে অন্য একটা জীবন আমি বেছে নিতে পারি না। নারাণাপ্পা, মহাবল—তোমরাও তা করো নি। যা হবার অজান্তেই হয়েছিল। তাই আমার মতন এমন তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় নি তোমাদের।

যে লোকটা 'সরু' পরিবেশন করছে সে আবার এলো। হাতে ধামা ভর্তি শুকনো লাড্ডু, পাশের লোকটি পাতে নিলো না মিষ্টান্ন। বাঁ হাত বাড়িয়ে কটা লাড্ডু নিয়ে পাশে রাখলো। আচার্যর সামনে দাঁড়িয়ে লাড্ডুর ধামাটা মাটিতে নামিয়ে রাখলো লোকটি। আচার্যর বুকখানা কেঁপে উঠলো যেন, লোকটা চেয়ে ছিল তাঁর দিকে। হঠাৎ বললো।

—এতক্ষণে মনে পড়েছে। আশ্চর্য! কিছুতেই মনে করতে পারছিলুম না। আপনি তো প্রাণেশাচার্য? দুর্বাসাপুর থেকে আসছেন? তাই না? ছি! ছি! আপনার মতন একজন আচার্য এই সাধারণ পঙক্তিতে বসতে পারেন ভাবতেই পারি নি? সাহুকরের বাড়িতে আপনাদের জন্যে মস্ত ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে। আমি ঠিক আপনাকে চিনতে পারি নি ক্ষমা করবেন। আর চিনবোই বা কী করে! কপালে চন্দন তিলক-টিলক আঁকা নেই তো! যাক, এখন যখন চিনেছি আর ছাড়ছি না আপনাকে। সাহুকর জানতে পারলে আমার গলায় পা দেবে। আপনি একটু বসুন। আমি এই এলুম বলে।

বলতে বলতে লোকটা ছুটে এক দিকে চলে গেল। লাড্ডুর ধামাটা পড়ে রইলো সেখানেই।

হাতে জল নিয়ে আচমন করে উঠে পড়লেন প্রাণেশাচার্য। তারপর কোনো দিকে না তাকিয়ে হাঁটা শুরু করলেন। পাশের লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো—স্বামীজী! ও স্বামীজী! উঠলেন কেন? এখনও যে পায়েস পড়লো না পাতে? শুনেও শুনলেন না আচার্য। হন হন করে হেঁটে বেরিয়ে পড়লেন মন্দির ছেড়ে। এখুনি তাঁকে চলে যেতে হবে মন্দিরের চৌহদ্দি ছেড়ে। দূরে—অনেক দূরে। এঁটো হাত নিয়েই হন হন করে হাঁটতে লাগলেন। খানিকটা গেছেন শুনলেন কে যেন ডাকছে।—আচার্যজী! আচার্যজী!

পুট্টা ডাকছে। ডাকুক। শুনেও শুনলেন না প্রাণেশাচার্য। ছেলেটা ছুটছে।

এক সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়লো তাঁর সামনে।

—কি ব্যাপার ? এ্যাত ডাকছি শুনতে পাচ্ছেন না ? একটা সাড়া অব্দি দিলেন না ? এত তাড়া কিসের ? বেগ টেগ এসেছে বুঝি ? হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগলো পুট্টা।

প্রাণেশাচার্য জবাব দিলেন না চলার গতিও কমালেন না। যখন দাঁড়ালেন তখন লোকালয় থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে পড়েছেন তিনি। হাতটা এখনও এঁটো। সে দিকে চেয়ে একটু যেন বিরক্তিও এলো। পুট্টা পাশে এসে দাঁড়ালো।

—কি ? মনে হচ্ছে বেগটা খুব বেশী ? এঁটো হাতটা ধোবারও ফুরসত পান নি ! আমারও ওরকম হয়েছে। লজ্জার কিছু নেই। ওই তো সামনেই পুকুর ! ওখানেই সেরে নিন না !

পুকুরের কাছে এসে দাঁড়ালেন ওঁরা। পুট্টা হঠাৎ বলে উঠলো।—আমি মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছি।

আচার্য তাকালেন পুট্টা বলে চললো !

—আপনার সঙ্গে কুন্দপুর যাবো। একটা ব্যাপার জানাই নি আপনাকে। আমার বউ তো ছেলেপুলে নিয়ে সেই যে বাপের বাড়ি গেছে সেই থেকে আর কোনো খোঁজ নেই। একমাস হয়ে গেল। একটা চিঠি অব্দি দেয় নি আমায়। তো আমি ঠিক করেছি সামনা সামনি বউয়ের সঙ্গে একটা ফয়সালা করে ফেলবো। তারপর নিয়ে আসবো তাকে ! আপনি মান্যগণ্য লোক। লোকে ভক্তিটক্তি করে আপনাকে। আমার খুব ইচ্ছে আপনাকে নিয়ে যাই বউয়ের কাছে। তাকে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করান। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আপনার কথা বউ ঠেলতে পারবে না। অবশ্য তার জন্যে আপনাকে একটা পুরো দিন আমার সঙ্গে থাকতে হবে। আর একটা কথা।

পুট্টা থামলো। আচার্য তখনও তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে।

—বিশ্বাস করতে পারেন—আজ রাত্তিরে পদ্মাবতীর সঙ্গে আপনার থাকার ব্যাপার নিয়ে কোনো গুজব আমি ছড়াবো না। মা'র নামে দিব্যি—কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না কিছু। তখন বাঁদর নাচ দেখতে দেখতে আপনাকে

দেখলুম—হনহন করে আসছেন। মনে ভাবলুম নিশ্চয়ই পায়খানার বেগ এসেছে। হেসে ফেলেছিলাম প্রায়।

ধীরে ধীরে পুকুরে নামলেন প্রাণেশাচার্য। এঁটো হাত ধুলেন। পাড়ের ওধারে তাঁর দিকে পিছন ফিরে পুট্টা দাঁড়িয়েছিল। ধীরে ধীরে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন আচার্য। পুট্টা অবাক।

—হয়ে গেল? এর মধ্যে?

প্রাণেশাচার্য মুখ তুলে তাকালেন। গরমকালের দীর্ঘ বিকেল, পশ্চিম আকাশে লাল ছড়া। বকের পাল লাইন করে ফিরে চলেছে নীড়ে। জলের ধারে বসে একটা সারস গলায় ঘড়ঘড় শব্দ করছে। সন্ধ্যাদীপ জ্বালাবার সময় প্রায় হয়ে এলো, কতদিন আগেকার কথা সে-সব। অগ্রহারে এই সময়টাতেই ঘরে ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে উঠতো। মাঠ থেকে ফেরা গাই ধরে দুধ দোয়ানো হতো। টাটকা দুধ সবাই নিবেদন করতো ঠাকুরকে।

দূর দিগন্তে পাহাড়টা খুব সন্তর্পণে অস্পষ্ট হচ্ছে। আশ্চর্য! সুস্পষ্ট একটা আকার থেকে দেখতে দেখতে অবয়বহীন একটা কালো বস্তুতে পরিণত হবে পাহাড়টা। মনে হবে পৃথিবী যেন স্বপ্নায়ত হয়েছে। মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ বদলাবে। সারা আকাশটাই হয়ে উঠবে পরিচ্ছন্ন, উদার। ক'দিন আগেই গেছে অমাবস্যা। কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদ উঠবে পাহাড়ের মাথা থেকে। যেন রুপোয় গড়া সুধাপাত্র। একদিক কাত হয়ে সুধারস ঝরে পড়ছে আরাধ্য দেবতার মাথায়। কোনো ধর্মানুষ্ঠানে ঠিক যেমনটি হয়। ক্রমে রাত বাড়বে। নিঃশব্দ হবে পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা। মেলার আলোগুলো নিভবে একটি একটি করে। কোলাহল স্তিমিত হবে।

—আমি যদি এখুনি হাঁটা শুরু করি অগ্রহারে পৌছতে মাঝরাত হয়ে যাবে। ভাবলেন প্রাণেশাচার্য।

—অগ্রহারের ওইসব ভীত ত্রস্ত মানুষগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াবো আমি। নিজেকে ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত করবো। যে মানুষকে ওরা জানতো আর যে মানুষকে এখন দেখবে—দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। মাঝরাতে আমি বদলে যাওয়া মানুষ হয়ে ফিরেছি। নারাণাপ্পার শবদেহটা ঘিরে যখন আগুনের লকলকে শিখা নাচতে থাকবে তখন আমার বদলে যাবার কাহিনী বলবো।

কিছু গোপন করবো না। কোনো অনুতাপ কোনো দুঃখ, কোনো পাপবোধ কিছুই থাকবে না আমার। এমনভাবে না বললে মনের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাব না আমি। একবার মহাবলের সঙ্গে দেখা করবো। তাকে বলবো—মনের গভীরে যে কামনা তা-ই সত্য। তাকে জিজ্ঞেস করে জানবো—তুমি তো তাই পেয়েছ! আর কি তোমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই তাহলে?

বৈষ্ণব পদকর্তার সেই সুললিত পদটি মনে এলো তাঁর—দখিনা সমীরণ দূর চন্দন পাহাড় থেকে ব'য়ে আনছে লবঙ্গ বনের মিহি সুবাস।

পুট্টার সহৃদয় আন্তরিকতা তাঁকে রীতিমত বিচলিত করেছে। তার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে নিজের দিকে টেনে আনলেন। তারপর পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন।

—তোমায় তখন বলতে যাচ্ছিলাম বাবা···

আচার্যর ব্যবহারে পুট্টাও খুশি। বললো।

—আপনার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা তখনই বুঝেছিলুম কি শক্ত মানুষ আপনি। নিশ্চয়ই কখনও আমার ওপর সদয় হতে পারবেন না।

—শোনো বাবা! খেতে খেতে হঠাৎ তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়লাম কেন জানো? এখনই আমার দুর্বাসাপুর যাওয়া দরকার।

—সেকি? ধূপ জ্বেলে, বিছানা সাজিয়ে, নিজে সেজেগুজে বসে আছে পদ্মাবতী—অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে? এখন যদি না যান তার সামনে আমি যে মুখ দেখাতে পারবো না? যত দরকারই থাক আজকের রাত্তিরটা আপনাকে থেকে যেতেই হবে। কাল ভোরে উঠেই বরং চলে যাবেন। না। না। যেতে আপনাকে আমি দেবো না। আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়বে তাহলে।

কথা শেষে বেশ শক্ত করে প্রাণেশাচার্যর হাত দুটো ধরে রইলো পুট্টা।

প্রাণেশাচর্য ভয় পেয়ে গেলেন। একি অর্থহীন পীড়াপীড়ি! যদি মনের দৃঢ়তা শ্লথ হয়ে যায়? যদি নীতিভ্রষ্ট হয়ে ভুল করে বসেন? যেমন ভাবে হোক পালাতেই হবে তাঁকে।

—না বাবা। তা অসম্ভব। তোমাকে তাহলে সত্যি কথাটাই বলি। ভেবেছিলুম বলবো না। আমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের সঙ্গে তোমায় কেন জড়াবো!

দুর্বাসাপুর আমায় যেতেই হবে আজ রাতে। সেখানে আমার ভাই মৃত্যু-শয্যায়। খবরটা মন্দিরেই শুনেছিলাম একজনের কাছে। যে কোনো মুহূর্তেই মৃত্যু হতে পারে তার। সুতরাং যেমন ভাবে হোক তার এই শেষ সময়ে আমাকে···

ইচ্ছে করে এটুকু প্রবঞ্চনা তাঁকে করতে হলো। পুট্টা ধরতে পারলো না। শুধু সরল মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো।

—বেশ। তাই হোক।

আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না প্রাণেশাচার্য। যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বললেন।

—তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে কে জানে? যাক, পদ্মাবতীকে ব'লো কুন্দপুর ফেরার সময় আমি তার সঙ্গে দেখা করে যাবো। চলি, বাবা!

পুট্টা দাঁড়িয়ে ভাবছিল। বললো।

—কিন্তু এত রাত্তিরে অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে একলা যাবেন? আমি বরং চলি আপনার সঙ্গে।

আবার সঙ্কটে পড়লেন প্রাণেশাচার্য। কোনো ছলনা কোনো প্রবঞ্চনাতেই ছেলেটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না? দ্বিধাজড়িত স্বরে বললেন।

—কেন বাবা আমার জন্যে কষ্ট করবে?

—কষ্ট কিসের?

পুট্টার স্বর দ্বিধাহীন।

—তাছাড়া আমার নিজেরও একটু কাজ আছে দুর্বাসাপুরে। শুনুন বলি। পারিজাতপুরে আমার খুড়তুতো ভাইরা থাকে, প্রায়ই যাই সেখানে। সেবার হঠাৎই নারাণাপ্পার সঙ্গে আমার আলাপ হলো। এই যেমন আপনার সঙ্গে আলাপ, তেমনি। চেনেন বোধহয় তাকে?

নিঃশব্দে শুনছিলেন প্রাণেশাচার্য। পুট্টা বললো।

—আর কে-ই বা না চেনে ওই লম্পটটাকে। অতবড় সম্পত্তি সব খুইয়েছে মেয়েমানুষের পেছনে। শাড়ি পরা একটা কিছু দেখলেই হলো—নোলা লক-লক করে ওঠে ওর। একটা কথা শুনুন আচার্য।

প্রাণেশাচার্যর দিকে ঘনিষ্ঠ চোখে তাকালো পুট্টা।

—এ হলো আমাদের নিজেদের মধ্যে কথা। নারাণাপ্পার সঙ্গে যদি আপনার আলাপ থাকে দয়া করে পদ্মাবতীর কথাটা ওর কানে তুলবেন না। আপনি সজ্জন ধর্মভীরু মানুষ। আপনার কাছে লুকোবো না। নারাণাপ্পার সঙ্গে আলাপের পর থেকেই সে আমার পেছনে প্রায় জোঁকের মতন লেগে ছিল। যেন পদ্মাবতীর সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিই। আমি অবশ্য প্রথম প্রথম তেমন আমল দিই নি। কেনই বা দেবো? আমি তো সস্তা নই? তবে কি করি বলুন? একজন ব্রাহ্মণ সন্তান যদি শুধু একটা মেয়েমানুষের জন্যে অমন হন্যে হয় তাহলে তাকে ঠেকাই বা কি করে? তাই বিশ্বাস করে পদ্মাবতীর কাছে ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য পদ্মাবতীর পছন্দ হয় নি ওকে। কারণ মাতাল নারাণাপ্পা বিশ্বাস রাখার কাজ করে নি। পরে পদ্মাবতী আমায় বলেছিল আর যেন কখনও নারাণাপ্পাকে তার কাছে নিয়ে না যাই।

—আপনাকে বলেছিলুম, হয়তো মনে আছে। তীর্থহল্লী থেকে খানিক দূরেই আমার গ্রাম। নারাণাপ্পার একটা ফলের বাগান আছে ওখানে। আছে না বলে ছিল বলাই ভালো। বর্তমানে বাগানের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। অযত্নে অযত্নে একেবারে ভূমিস্যাৎ অবস্থা। বেশ কয়েক বছর ধরে বাগান থেকে একটা সুপুরিও জোটে না। আমার ইচ্ছে বাগানটা ইজারা নিই। এমনি চাইলে তো দেবে না! তাই ভাড়ার লোভ দেখাবো। ওকে বোঝাতে হবে যে সংস্কার করে শ্রী ফিরিয়ে আনতে পারলে কিছু লাভও উঠবে বাগান থেকে। লাভের ভাগ আমি একা নেব না। ওকেও দেবো। তাই বলছিলাম—আপনার সঙ্গে চলি আমি। তাছাড়া সঙ্গে থাকলে আপনার একজন সঙ্গী হবে। আমারও কাজ হবে।

চিত্রার্পিত হয়ে শুনলেন প্রাণেশাচার্য। শুনতে শুনতে মনে হলো তাহলে কি বলবেন ওকে যে নারাণাপ্পা আর বেঁচে নেই! মরেছে। আর সেইজন্যেই তাঁর এই মানসিক সঙ্কট। কিন্তু ছেলেটা ভারি সরল। কি হবে ওর সরল মনে এই সংশয়ের ঝড় তুলে! যদি সে মনে করেই থাকে তাহলে সঙ্গে আসবেই। ঠেকাতে পারবেন না তাকে। তাছাড়া সঙ্গী হিসেবে পুট্টা খুব অবাঞ্ছনীয় নয়। অগ্রহারের সংস্কারাবদ্ধ মানুষগুলো কি চোখে তাঁকে দেখবে

তার একটা পরীক্ষাও হয়ে যাবে। যদি পুট্রাকে সব কথা খুলে বলেন দেখা যাক না তার কী প্রতিক্রিয়া হয়—কেমন চোখে সে তাঁকে দেখে ?

আকাশ পরিষ্কার নির্মেঘ। মন্দিরের ভেতর থেকে শাঁখ আর কাঁসরের শব্দ ভেসে আসছে। দেবারাধনার সময় উপস্থিত এখুনি যেতে হবে তাঁকে।

একটা গো-শকট এগিয়ে আসছে। দুই চাকার শকট, দু'চাকার ওপর ভর দিয়ে গড়াতে গড়াতে আসছে ধীর গতিতে। গাড়িটা দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো পুট্রা।

—ও কত্তা! একটু থামাও না!

হাত তুলে থামালো শকটটাকে। উঁকি দিয়ে মুখ বাড়ালো একজন স্মার্ত। সোনার জরির কাজ করা একটা শাল মাথায় জড়ানো লোকটার।

—কি চাই ?

—গাড়ি কি আগুমবী যাচ্ছে ?

—হ্যাঁ। মাথায় শাল ঢাকা মানুষটা গাড়ির ভেতর থেকে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

—দু'জনের জায়গা হবে গাড়িতে ? আমরা দুর্বাসাপুর অব্দি যাব।

—মেরেকেটে একজনের হতে পারে।

পুট্রা হাত ধরলো প্রাণেশাচার্যর।

– আপনি যান।

—না। না। তা হয় না। তার চেয়ে দু'জনে মিলে হাঁটি, এসো। বললেন প্রাণেশাচার্য।

—ছি ছি! তাই কখনও হয়! এতটা রাস্তা খামোখা হেঁটে ক্লান্ত হবেন কেন ? আমি বরং কাল আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

লোকটা তাড়া দিচ্ছিল।

—যা করবার তাড়াতাড়ি করো। কে আসছ ? তুমি ? আমরা কিন্তু মাইল দুই ঘুরপথে দুর্বাসাপুর যাব। যে আসবার উঠে এসো! শীগগির!

পুট্রা পীড়াপীড়ি করছিল। একসময় প্রায় ঠেলেঠুলেই প্রাণেশাচার্যকে ঢুকিয়ে দিলো শকটের মধ্যে। নিরুপায় আচার্য লাফিয়ে উঠে পড়লেন ছইয়ের ভেতর। গাড়ি চলতে শুরু করলো। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে হাত নাড়লো পুট্রা।

বললো।

—কাল দেখা করছি আপনার সঙ্গে!

প্রাণেশাচার্যও হাত নাড়লেন। বললেন—আচ্ছা!

মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্টার পথ। তারপর?

আকাশভরা তারা। রুপোর মতন চাঁদ আর পরিষ্কার সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখতে দেখতে চললেন প্রাণেশাচার্য। কোন্ দূর থেকে ভেসে আসছে ঢোলের শব্দ। ডিম। ডিম। ডিম। মাঝে মাঝে কোথা থেকে আলোর শিখা অন্ধকার ফুঁড়ে জেগে উঠছে। টিলার ওপর উঠতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে বলদ দুটো। তাদের গভীর শ্বাসের শব্দ উঠছে। ডিং ডিং করে বেজে চলেছে বলদ দুটোর গলার ঘন্টি। এমনি করে চার-পাঁচ ঘণ্টা চলবে। তারপরই যাত্রা শেষ। কিন্তু তারপর?

প্রত্যাশা আর আবেগ নিয়ে প্রাণেশাচার্য অপেক্ষা করছেন সেই মুহূর্তটির জন্যে। একটু যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তিনি!…